কিশোর ক্লাসিক

তিনটি বই একত্রে

আলেকজান্দার দ্যুমা-র

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স

রূপান্তর : কাজী আনোয়ার হোসেন

মেরী ওয়েব-এর

প্রেশাস বেইন

রূপান্তর : কাজী শাহনূর হোসেন

লিউ ওয়ালেস-এর

বেন-হার

রূপান্তর : কাজী মায়মুর হোসেন

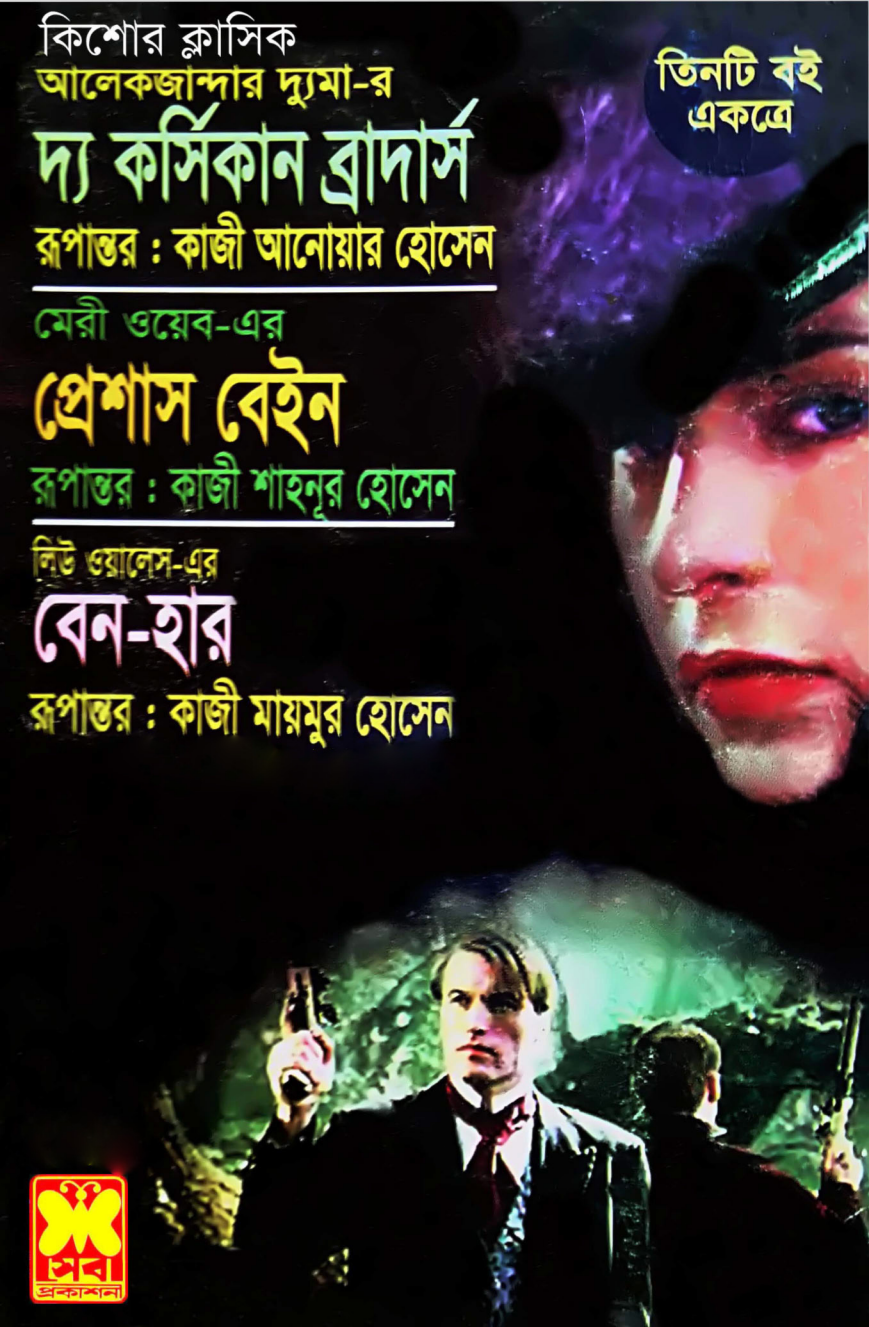

সেবা প্রকাশনী

কিশোর ক্লাসিক
তিনটি বই একত্রে

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স/ আলেকজান্দার দ্যুমা/কাজী আনোয়ার হোসেন

কর্সিকান এক বনেদী পরিবারে জন্ম যমজ দুই ভাই লুসিয়েন ও লুই দো ফ্রানশির। চেহারায় এতই মিল যে ছোটবেলায় ওদের মা পর্যন্ত কোনটা কোনজন চেনার জন্যে জামায় চিহ্ন দিয়ে রাখতে বাধ্য হতেন। বিপরীত চরিত্রের এই দুই ভাইকে নিয়েই বিশ্বখ্যাত কথা সাহিত্যিক আলেকজান্দার দ্যুমার অমর সৃষ্টি: দ্য কর্সিকান বাদার্স। অসংক্ষেপিত।

প্রেশাস বেইন/মেরীওয়েব/কাজী শাহনূর হোসেন

কাটা ঠোঁট প্রুডেন্স সার্নের জন্মগত ত্রুটি। কেউ কেউ এজন্যে ওকে ডাইনী মনে করে। বড় ভাই গিডিয়ন সার্ন কথা আদায় করে নেয়, তার খামারে সারাজীবন শ্রম দেবে প্রুডেন্স, যা বলা হবে তাই করবে। কারণ ঠোঁট কাটা মেয়েকে তো কেউ ভালবাসবে না, বিয়ে করবে না। কিন্তু সত্যিই কি তাই?

বেন-হার/লিউ ওয়ালেস/কাজী মায়মুর হোসেন

সামান্য এক দুর্ঘটনায় বেন-হারের জীবনের মোড় ঘুরে গেল। বন্দী করা হলো ওকে। রোমান সৈন্য ধরে নিয়ে গেল ওর মা-বোনকে। বাজেয়াপ্ত হয়ে গেল সমস্ত সম্পত্তি। ভাগ্যের পরিহাসে ক্রীতদাসে পরিণত হলো প্রিন্স বেন-হার। দেখা হলো যীশু খ্রিষ্টের সঙ্গে। তিনি দেখালেন নতুন আলোর পথ।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কিশোর ক্লাসিক

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স

প্রেশাস বেইন

বেন-হার

রূপান্তর ■ কাজী আনোয়ার হোসেন/
কাজী শাহনূর হোসেন/কাজী মায়মুরহোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1589-4
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
মোবাইল: ০১১-৯০৪৯০০৩০
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল. ০১৭১৮-১৯০২০৩

THE CORSICAN BROTHERS
PRECIOUS BANE
BEN-HUR
Trans By: Qazi Anwar Husain/
Qazi Shahnoor Husain/Qazi Mainur Husain

পঁয়তাল্লিশ টাকা

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স/আলেকজান্দার দ্যুমা : ৫–৭৫
প্রেশাস বেইন/মেরী ওয়েব : ৭৬–১৩২
বেন-হার/লিউ ওয়ালেস : ১৩৩–২২৪

সেবা প্রকাশনীর
ক'টি কিশোর ক্লাসিক

চার্লস নর্ডহফ ও জেমস্ নরম্যান হল/নিয়াজ মোরশেদ
বাউন্টিতে বিদ্রোহ
সারভান্তেস/নিয়াজ মোরশেদ
ডন কুইক্সোট
কানাইলাল রায়
কিশোর রামায়ণ
দশ কুমার চরিত
শেক্সপীয়ার/কাজী শাহনূর হোসেন
নাটক থেকে গল্প
ভিক্টর হুগো
লা মিজারেবল/ইফতেখার আমিন
দ্য ম্যান হু লাফস/শেখ আবদুল হাকিম
চার্লস ডিকেন্স/নিয়াজ মোরশেদ
অলিভার টুইস্ট
আ টেল অভ টু সিটিজ
গ্রেট এক্সপেকটেশানস
মার্ক টোয়েন/শেখ আবদুল হাকিম
পুডনহেড উইলসন
এমিলি ব্রনটি/নিয়াজ মোরশেদ
ওয়াদারিং হাইটস
হ্যারিয়েট বীচার স্টো/অনীশ দাস অপু
আঙ্কল টমস কেবিন
হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড
চাইল্ড অভ স্টর্ম/কাজী মায়মুর হোসেন
মর্নিং স্টার/নিয়াজ মোরশেদ
ক্লিওপেট্রা/সায়েম সোলায়মান
জেস/সায়েম সোলায়মান
মন্টেজুমার মেয়ে/কাজী আনোয়ার হোসেন
লর্ড লিটন/নিয়াজ মোরশেদ
দ্য লাস্ট ডেজ অভ পম্পেই
স্যার ওয়াল্টার স্কট/কাজী মায়মুর হোসেন
রব রয়
লরা ইঙ্গলস ওয়াইল্ডার/কাজী আনোয়ার হোসেন
ফার্মার বয়
লিটল হাউজ অন দ্য প্রেয়ারি
অন দ্য ব্যাঙ্কস অভ প্লাম ক্রীক
লিটল টাউন অন দ্য প্রেয়ারি
রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন
দ্য ব্ল্যাক সোয়ান
লাভ অ্যাট আর্মস
রূপসী বন্দিনী
টমাস হার্ডি/কাজী শাহনূর হোসেন
টেস অভ দ্য ডার্বারভিল
ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড
জুড দ্য অবসকিওর
দ্য মেয়র অভ ক্যাস্টারব্রিজ
চার্লস কিংসলে/শেখ আবদুল হাকিম
হাইপেশিয়া
এইচ. দ্য ভের স্ট্যাকপোল/মামনুন শফিক
ব্লু লেগুন
হেনরি হল কেইন/কাজী মায়মুর হোসেন
দ্য বন্ডম্যান
স্ট্যানলি ওয়েইম্যান/কাজী আনোয়ার হোসেন
আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স
আলেকযান্ডার কেলায়েড/কাজী মায়মুর হোসেন
দি অ্যামুফিবিয়ান ম্যান
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
দ্য ফিফথ কলাম/শেখ আপালা হাকিম
আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস/নিয়াজ মোরশেদ
আলেকজান্দার দ্যুমা
মার্গারেট ডি-ভ্যালয়/শেখ আপালা হাকিম
জেরাল্ড ডুরেল/অনীশ দাস অপু
মানবজন্তু
রবার্ট লুই স্টিভেন্সন
কিডন্যাপড/নিয়াজ মোরশেদ
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল/আসাদুজ্জামান
বাস্কারভিলের হাউন্ড

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, কোনভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

দ্য কর্সিকান ব্রাদার্স

আলেকজান্দার দ্যুমা/কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

SUYOM

এক

মার্চ মাস। কর্সিকায় এসেছি, গোটা দ্বীপ ঘুরে দেখব বলে। শুনেছি এ দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি অতুলনীয়, সত্যি কিনা এবার নিজ চোখে এসেছি দেখতে।

তুলোঁ থেকে জাহাজে আজাসিও পৌঁছতে লাগে বিশ ঘণ্টা, বাস্তিয়ায় নামলে চব্বিশ ঘণ্টা। আমি নেমেছি বাস্তিয়া বন্দরে। নেমেই একশো ফ্রাঁ দিয়ে কিনে নিয়েছি একটা তরতাজা ঘোড়া।

'কোত' আর 'আজাসিও' দেখা হয়ে গেছে, এখন চলেছি সাখতান প্রদেশের মধ্যে দিয়ে সুলাকাখোর দিকে।

জানি, রাহাজানির ভয় নেই। পারিবারিক শত্রুতা থাকলে আলাদা কথা, সেক্ষেত্রে দশ কদম ফেলতেও ভয়; কিন্তু পর্যটককে কেউ কিছু বলবে না, গোটা দ্বীপের যেখানে খুশি ঘুরে-ফিরে দেখতে অসুবিধে নেই। রাতের থাকা-খাওয়াও কোনও সমস্যা নয়– যে-কোনও গ্রামে গিয়ে যে-কারও বাড়ির দরজায় টোকা দিলেই হলো, বেরিয়ে আসবে গৃহকর্তা বা কর্ত্রী, সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে যাবে, সাধ্যমত থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা করবে, পরদিন সকালে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবে রাত্রিবাসের জন্যে তার বাড়িটিই পছন্দ করায়। টাকা-পয়সা কিছু দিতে চাইলে অপমান বোধ করবে। তবে হ্যাঁ, কিছু উপহার দিলে– একটা রুমাল বা একটা ছোরা– খুশি হয়ে গ্রহণ করবে, সবাইকে দেখাবে সে-উপহার গর্বের সঙ্গে। ফ্রান্সেরই একটা অঞ্চল হলেও, অবাক লাগে, কর্সিকান আচার-আচরণ ফরাসীদের থেকে একেবারেই আলাদা; এরা কথাও বলে আঞ্চলিক ইটালিয়ান ভাষায়।

সুলাকাখোর দিকে চলেছি। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে পর্বতের মেরুদণ্ড ডিঙাতে হবে। যেন হারিয়ে না যাই, সেজন্যে সঙ্গে একজন গাইড নিয়েছি। মাইল তিরিশেক একটানা চলার পর বিকেল পাঁচটার দিকে বিশ্রাম নিতে থামলাম পাহাড়ের মাথায়। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় ওলমেতো আর সুলাকাখো গ্রাম।

'কোথায় উঠবেন, ভেবেছেন কিছু?' জানতে চাইল গাইড।

গ্রামের দিকে তাকালাম। জনশূন্য রাস্তা। এক-আধজন মহিলাকে দেখলাম এদিক-ওদিক চকিত দৃষ্টি ফেলে ত্রস্তপায়ে হেঁটে যাচ্ছে। একশো-সোয়াশো বাড়ি দেখা যাচ্ছে গ্রামটায়। চারপাশে চোখ বুলিয়ে দুর্গের মত দেখতে একটা চারকোনা বাড়ি পছন্দ হলো। একটু অবাক হলাম দরজা-জানালায় বন্দুক চালানোর জন্যে ফুটো রয়েছে দেখে। তবে ইতোমধ্যে আমি জেনে গেছি এই এলাকা পারিবারিক

কলহ ও বংশানুক্রমিক খুনোখুনির জন্যে কুখ্যাত।

তর্জনী তাক করে বাড়িটা দেখালাম।

'বেশ!' বলল আমার গাইড। 'তাহলে আমরা মাদাম সাভিলি দো ফ্রানশির বাড়িতে যাচ্ছি। আপনার পছন্দের তারিফ করতেই হয়।'

'তবে,' চট করে প্রশ্ন করলাম, 'কোনও মহিলার আতিথেয়তা চাওয়ার কোনরকম অসুবিধে নেই তো?'

অবাক হলো গাইড। 'কেন, অসুবিধে কিসের?'

'না, মানে, মহিলা যদি অল্পবয়সী হন,' আমতা আমতা করে বললাম, 'তাঁর বাড়িতে রাত কাটালে আবার কোনও বদনাম টদনাম…'

'বদনাম?' আরও অবাক হলো গাইড, 'কেন? বদনাম হবে কেন?'

একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললাম, 'মহিলা তো বিধবাও হতে পারেন…'

'ঠিক ধরেছেন, মশিয়ে। মহিলা বিধবা।'

'তাহলে তিনি কি একজন যুবক মানুষকে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করবেন?'

'যুবক মানুষকে?' আমার কথা বুঝতে পারছে না গাইড। 'আপনি বৃদ্ধ না যুবক– তাতে কী এসে যায়?'

বুঝলাম, এভাবে প্রশ্ন করে হবে না। সরাসরি জানতে চাইলাম, 'মাদাম সাভিলির বয়স কত?'

'এই…চল্লিশ মত হবে।'

ও!' বললাম, 'তাহলে ঠিক আছে। ছেলেমেয়ে আছে নিশ্চয়ই?'

'ছেলে। চমৎকার দুই ছেলে।'

'এখানেই আছে?'

'একজন আছে মার সঙ্গে।'

'আরেকজন?'

প্যারিসে থাকে।'

'বয়স কত ওদের?'

'একুশ।'

'দুজনেরই?'

'হ্যাঁ। যমজ ওরা।'

'আচ্ছা! করে কি?'

'প্যারিসে যে আছে সে আইন পড়ছে।'

'আরেকজন?'

'আরেকজন সত্যিকার কর্সিকান হিসেবে গড়ে উঠছে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, বেশ। তাহলে মাদাম সাভিলি দো ফ্রানশির বাড়ির দিকেই যাওয়া যাক।'

দশ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম হত-দরিদ্র গ্রামে। লক্ষ করলাম, প্রতিটি বাড়ির জানালা-দরজায় গোলাগুলির জন্যে ফোকর রয়েছে, প্রতিটি বাড়িই যেন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত। প্রত্যেক বাড়ির দেয়ালেই অসংখ্য বুলেটের দাগ দেখা যাচ্ছে। কোন কোন ফোকরে চোখ দেখতে পেলাম ছেলে না মেয়ে বোঝা গেল না, তবে এটা

ঠিক, গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমাদের গতিবিধি লক্ষ করা হচ্ছে।

আমরা যে বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়ালাম, একবাক্যে বলা যায় সেটিই এ-গ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাড়ি। একবার টোকা দিতেই খুলে গেল দরজা, দাঁড়িয়ে আছে একজন উর্দি পরা ভৃত্য, কোমরে ঝুলছে একটা খাপে পোরা স্প্যানিশ নাইফ।

'সুলাকাখোতে কাউকে চিনি না আমি,' বললাম। 'আমি পর্যটক, এই বাড়িতে আশ্রয় প্রার্থনা করা কি অসঙ্গত হবে?'

'নিশ্চয়ই না, মশিয়ে,' বলল লোকটা। 'আপনাকে অতিথি হিসেবে পেলে এ-বাড়ির সবাই সম্মানিত বোধ করবে। মাখিয়া...' পিছনে দাঁড়ানো চাকরানীকে বলল, 'মাদাম সাভিলিকে বলো, একজন ফরাসী মুসাফির আশ্রয় চান।'

কথা শেষ করেই আট ধাপ খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে আমার ঘোড়ার লাগাম ধরল। ঘোড়া থেকে নামলাম আমি।

'জিনিসপত্র নিয়ে ভাববেন না, মশিয়ে, সব আপনার ঘরে পৌঁছে দেয়া হবে।'

খুশি হলাম এমন সহৃদয় অভ্যর্থনা পেয়ে।

দুই

উঁচু ধাপ বেয়ে ওপরে উঠে বাড়িতে ঢুকলাম। করিডরের শেষ মাথায় কালো কাপড় পরা, লম্বা, সুন্দরী এক মহিলার সামনে দাঁড়ালাম। বুঝলাম ইনিই গৃহকর্ত্রী।

'মাদাম,' মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলাম। 'এভাবে হুট করে এসে আপনাকে অসুবিধার মধ্যে...'

'মোটেও না,' বাধা দিলেন মহিলা। 'আপনি আতিথ্য গ্রহণ করায় আমি খুবই খুশি হয়েছি। আমার ছেলেও আনন্দের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাবে। এই মুহূর্ত থেকে এ-বাড়ি আপনার সেবায় প্রস্তুত, আপনি এটাকে নিজের বাড়ি মনে করলে আমরা বাধিত হব।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। শুধু আজ রাতটুকুর জন্যে আমি আশ্রয়প্রার্থী। কাল ভোরে চলে যাব।'

'আপনার যেমন খুশি, কেউ বাধা দেবে না। তবে বেশ কিছুদিন এখানে থেকে বেড়িয়ে গেলে আমরা সম্মানিত বোধ করব।'

আবারও মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করলাম।

'মাখিয়া,' বললেন মাদাম দো ফ্রানশি, 'মশিয়েকে লুই-র ঘরটা দেখিয়ে দাও। এখনি ফায়ারপ্লেসে আগুন দাও, আর গরম পানি পৌঁছে দাও ওঁর ঘরে। আপনি ওর সঙ্গে যান,' আমার দিকে ফিরলেন আবার। 'যা যা লাগে ওর কাছে চাইবেন। আর একঘণ্টা পর সাপার। আমার ছেলে ফিরে আসবে এর মধ্যেই। খুব খুশি হবে আপনাকে পেয়ে।'

'আমার এই ট্র্যাভেলিং ড্রেস…'

'আমরা কিছুই মনে করব না। আপনিও আমাদের ত্রুটিপূর্ণ গ্রাম্য রীতিনীতি ক্ষমা করে দেবেন।'

আর একবার 'বাউ' করে চাকরানীর পিছু নিয়ে দোতলায় উঠে এলাম। বেশ বড়সড় একটা ঘর। জানালা দিয়ে বাড়ির পিছনের আঙিনা দেখা যায়। চমৎকার বাগান, থোকা থোকা মার্টল আর অলিয়েনডার ফুলে ছেয়ে আছে; মাঝখান দিয়ে কোনাকুনি ভাবে বইছে ছোট্ট একটা ঝর্না।

ঘরের দেয়াল সাদা হোয়াইটওয়াশ করা। চমৎকার, সুরুচিপূর্ণ ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং ঝুলছে দেয়ালে। এক নজরেই বুঝলাম, প্যারিস প্রবাসী ছেলের ঘরটা আমাকে দেয়া হয়েছে। সন্দেহ নেই, এ-বাড়ির সবচেয়ে ভাল ঘর এটা, প্রতিটি আসবাব ঝকঝকে পালিশ করা। আরাম-আয়েশের সবরকম আয়োজন দেখে বোঝা যায় পরিবারটি শুধু সম্ভ্রান্তই নয়, সচ্ছলও। খাট, ডিভান, চেয়ার, টেবিল, আর্মচেয়ার ইত্যাদি ঘুরে আমার দৃষ্টি আটকে গেল নানারকম বইয়ে ঠাসা বুককেসের ওপর। ফ্রান্সের বড় বড় কবি রাসিন, মলিয়ে, লা ফনতাইন, রোসনা, ভিক্তর হুগো, লামাখতাইন-এর কাব্য; মনতাইন, প্যাসক্যাল, লা বুখিয়ের-এর দর্শন; ঐতিহাসিক মেজিখে, শাতোবিখইয়ান্দ, অগস্তিন থিয়েখ-এর গ্রন্থ; বৈজ্ঞানিক কুভিয়ে, বঁদো, ইলি দো বোর্ম– কার বই নেই? এরপর উপন্যাসগুলোর মধ্যে আমার নিজের লেখা 'আম্প্রেসিও দো ভোয়া' দেখে রীতিমত খুশি হয়ে উঠল মনটা।

একটা ড্রয়ার টেনে দেখলাম বেশ কিছু হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। কর্সিকার কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে লেখা কয়েকটা পাতা; কিভাবে দীর্ঘ পারিবারিক কলহ ও খুনোখুনি বন্ধ করা যায় তার ওপর একটি রচনা, গোটা কয়েক ফরাসী পদ্য, কিছু ইটালিয়ান সনেট। এসব থেকে মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি সম্পর্কে পরিষ্কার একটা ধারণা পেয়ে গেলাম।

সুশিক্ষিত, চমৎকার যুবক, সন্দেহ নেই। দেশের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই আইন পড়তে গেছে প্যারিসে। স্নান সেরে জামা-কাপড় পরতে পরতে ভাবছিলাম এসব। ভেলভেটের জ্যাকেট গায়ে দিয়ে মাথায় একটা নরম ফেল্টের হ্যাট চাপিয়েছি, এমনি সময়ে এসে দাঁড়াল সেই উর্দি পরা বাটলার; জানাল: মশিয়ে লুসিয়েন দো ফ্রানশি ফিরেছেন। তিনি অনুমতি চাইছেন, আমাকে স্বাগত জানাবার জন্যে আসতে চান।

'নিশ্চয়ই!' জবাব দিলাম। 'মশিয়ে লুসিয়েন দো ফ্রানশি যখন খুশি আসতে পারেন, তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।'

খানিক পর পায়ের শব্দ পেলাম, প্রায় ছুটে এসে ঘরে ঢুকল প্রাণবন্ত এক তরুণ।

তিন

বিশ-একুশ বছর বয়সের তরুণ, চোখ ও চুল কালো, গায়ের রঙ রোদে পুড়ে বাদামী, দেখতে চমৎকার, সুন্দর স্বাস্থ্য, তবে খুব একটা লম্বা নয়। রাইডিং ড্রেস পরেই চলে এসেছে দেখা করতে। সবুজ ওয়েইস্টকোট পরা, কোমরে গুলির বেল্ট, ধূসর রঙের ট্রাউজারের এখানে-ওখানে চামড়া বসানো, পায়ে বুট ও স্পার। কার্ট্রিজ বেল্ট থেকে একপাশে ঝুলছে একটা পানির ফ্লাস্ক, অন্যপাশে একটা পিস্তল। এক হাতে একটা ইংলিশ কারবাইন ধরা।

বয়সে তরুণ হলেও আমার আশ্রয়দাতার চেহারায় স্বাবলম্বী ভাব ও প্রবল ব্যক্তিত্বের ছাপ লক্ষ করে বিস্মিত হলাম। বোঝা যাচ্ছে, মানুষটা চৌকস, ভাব-জগৎ নয়, কর্মজগতের লোক; নির্ভয়ে বিপদের মুখে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখে– হয়তো বিপদকে ভালও বাসে। গম্ভীর যেহেতু সে একা, শান্ত যেহেতু ক্ষমতাবান।

এক নজরেই আমার সবকিছু দেখে নিল যুবক, আমার ট্র্যাভেল কেস, অস্ত্র, জামা-কাপড়– যেগুলো ছেড়েছি, যেগুলো পরেছি– কিছুই চোখ এড়াল না। বুঝলাম, নিমেষে পরিস্থিতি বুঝে নেয়ার এবং মানুষ চিনে নেয়ার ক্ষমতা অর্জন করেছে যুবক, হয়তো যে পারিপার্শ্বিকতায় এর বাস, তাতে অনেক সময় জীবন-মরণ নির্ভর করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার ওপর।

'মাফ করবেন, মশিয়ে, বোধহয় বিরক্ত করছি আপনাকে,' বলল লুসিয়েন। 'তবে বিশ্বাস করুন, আপনার কথা শুনেই অস্থির হয়ে পড়েছি। প্রথমত, আপনার কিছু প্রয়োজন আছে কি না জানার জন্যে। দ্বিতীয়ত, মেইনল্যান্ড থেকে কোনও ফরাসী অতিথি আমাদের বাড়িতে এলে আমরা, আধা-সভ্য কর্সিকানরা, ভয়ে মরে যাই, বুক কাঁপে কোথায় কি ত্রুটি হয়ে যায় তাই ভেবে।'

হাসলাম। 'মশিয়ে, আপনার ভয় অমূলক। সত্যি। একজন ক্লান্ত পর্যটকের প্রয়োজন মাদাম দো ফ্রানশি যতটা বুঝে যা ব্যবস্থা নিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি কিছু করার সাধ্য আর কারও আছে বলে আমি মনে করি না। তাছাড়া,' আবার হাসলাম, 'আধা-সভ্য কর্সিকানের কোনও চিহ্ন কিন্তু এই ঘরের কোথাও খুঁজে পাইনি– জানালার বাইরে তাকিয়ে এদেশের অপূর্ব মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য না দেখলে যে-কেউ বলবে এটা প্যারিসের সবচেয়ে অভিজাত, সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান এক ব্যক্তির কামরা।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল যুবকের চোখ-মুখ। এটা আমার ভাই লুই-এর ঘর। ও ফরাসী আচার-আচরণ-শিক্ষা-সভ্যতার অনুসারী; তবে আমার মনে হয় না প্যারিস থেকে ওখানকার রীতিনীতি রপ্ত করে এখানে ফিরে এসে ও মানিয়ে নিতে পারবে।'

'আপনার ভাই কি অনেকদিন আগে গেছেন?'

'দশ মাস, মশিয়ে।'

'ফিরবেন শীঘ্রি?'

'নাহ্, তিন-চার বছরের আগে তো নয়ই।'

'খুবই লম্বা সময়,' মাথা ঝাঁকালাম। 'দু'ভাইয়ের এর আগে তো কখনও ছাড়াছাড়ি হয়নি, তাই না?'

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, আমরা পরস্পরের অসম্ভব ভক্তও। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমরা একজন আরেকজনের জন্যে করতে পারি না।'

'লেখাপড়া শেষ হওয়ার আগে ছুটিছাটায় নিশ্চয়ই আসবেন উনি?'

'হয়তো। কথা দিয়েছে, কিন্তু পারবে কি না বলা যায় না।'

'বেশ। কিন্তু আপনি নিজে গিয়ে দেখা করে এলে কে ঠেকাবে?'

'আমি? নাহ্, অসম্ভব– আমি কর্সিকা ছেড়ে কোথাও যাই না, যাবও না।'

কথার সুরে বুঝলাম কর্সিকাকে শুধু ভালবাসে তাই নয়, অন্য দেশের প্রতি একটা বিরূপ মনোভাবও রয়েছে লুসিয়েনের মধ্যে। মৃদু হাসলাম।

'আপনার কাছে ব্যাপারটা বিদঘুটে ঠেকতে পারে,' ও-ও হাসল, 'যে এই গরীব, হতচ্ছাড়া দেশ ছেড়ে কোথাও যেতে চায় না, সে আবার কেমন লোক। কিন্তু আসলেও তাই। আমি এ-মাটির সন্তান, হোম-ওক গাছ বা ওই অলিয়েন্ডারের ঝোপ-ঝাড়ের মত। সাগর থেকে আসা বাতাস আমার চাই, চাই পাহাড়ী কুয়াশা, খরস্রোতা ঝর্না-নদী, বেয়ে ওঠার জন্যে দুর্গম পর্বত, শিকারের জন্যে গভীর, ঘন জঙ্গল। খোলামেলা জায়গা আর স্বাধীনতা চাই। আমাকে কোনও শহরে নিয়ে গেলে মরে যাব দম আটকে।'

সত্যিই অবাক লাগল। বললাম, 'দু'ভাইয়ের মধ্যে এতই তফাৎ!'

'ওকে চিনলে বলতেন, চেহারায় এমন আশ্চর্য মিল থাকা সত্ত্বেও!'

'খুব মিল বুঝি?'

মাথা ঝাঁকাল লুসিয়েন। 'এতই বেশি যে ছোট বেলায় আমাদের কোনজন কে তা চেনার জন্যে কাপড়ে চিহ্ন দিয়ে রাখতেন মা।'

'তারপর যখন বড় হয়ে উঠলেন?'

'দু'জন দুই রকম জীবন যাপন করি, তাই বড় হয়ে গায়ের রঙে সামান্য পরিবর্তন হয়েছে, তাছাড়া আর সব হুবহু এক। সব সময় ঘরের মধ্যে বই বা ছবির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থেকে আমার ভাই কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আর আমি মাঠে-ময়দানে পাহাড়ে-পর্বতে টো-টো করে হয়ে গেলাম কিছুটা বাদামী।'

'মিলটা নিজ চোখে দেখার সুযোগ পেলে খুশি হব,' বললাম। 'আপনি মশিয়ে লুই দো ফ্রানশিকে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমার হাতে কোনও মেসেজ দিলে দেখা হয়ে যাবে ওঁর সঙ্গে।'

'নিশ্চয়ই, আনন্দের সঙ্গে দেব, আপনি যদি দয়া করে নিয়ে যান। কিন্তু, মাফ করবেন, আপনি দেখছি সাপারের জন্যে প্রায় তৈরি হয়ে গেছেন, আমি পিছনে পড়ে গেছি। পনেরো মিনিটের মধ্যে সাপারে বসতে হবে।'

'আমার জন্যে কাপড় পাল্টানোর কষ্ট করবেন না, প্লীজ।'

'ধন্যবাদ; কিন্তু এগুলো ছেড়ে আমাকে পাহাড়ের উপযোগী কাপড় পরতেই হবে। সাপারের পর যেদিকে যাব, এই বুট আর স্পার পরে সেদিকে যাওয়া

যায় না।'

'খেয়েদেয়ে বেরোচ্ছেন কোথাও?'

'হ্যাঁ, একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

মৃদু হেসে মাথা ঝাঁকালাম।

'না-না! যা ভাবছেন তা নয়: কাজের অ্যাপয়েন্টমেন্ট।'

'বেশ তো! আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কৌতূহল প্রকাশ করে নিজেকে…'

'কী যে বলেন,' সরল হাসি লুসিয়েনের মুখে। 'আমার ব্যক্তিগত বা গোপন কোন কথা নেই। কখনও কোন প্রেমিকা ছিল না আমার, থাকবেও না। আমার ভাই যদি বিয়ে করে আর তাদের ছেলেমেয়ে হয়, এমনও হতে পারে আমি আর বিয়েই করব না। আর ও যদি বউ না পায় তাহলে আমাকে একটা খুঁজে নিতে হবে, যাতে বংশের ধারাটা নষ্ট না হয়। আপনাকে তো বলেইছি, আমি বুনো টাইপের লোক, এক শতাব্দী দেরি করে জন্মেছি। কিন্তু এরকম বকবক করতে থাকলে সাপারের জন্যে সময় মত তৈরি হতে পারব না।'

'আপনার সঙ্গে গল্প করতে ভাল লাগছে, বললাম। 'এক কাজ করুন না। ওপাশের ঘরটাই তো আপনার, দরজাটা খোলা রাখুন যাতে কথা চালিয়ে যেতে পারি।'

'তারচেয়ে আমার ঘরেই চলে আসুন। আমি ড্রেসিংরুমে কাপড় পাল্টাতে পারব কথা বলতে বলতে। অস্ত্রশস্ত্র আপনার ভাল লাগে আশা করি, তাই যদি হয়, আমারগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে পারবেন। ওগুলোর কয়েকটার আবার ঐতিহাসিক মূল্য আছে।'

চার

ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালাম। দু'ভাই দেখছি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির! মনে হচ্ছে যেন কোন অস্ত্রাগারে এসে ঢুকেছি।

পুরানো আমলের আসবাবপত্র। সবচেয়ে আধুনিক যেটা, সেটা তৈরি হয়েছে পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দীতে। খাট, চেয়ার, টেবিল যদিও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বয়সে অনেক প্রাচীন। স্প্যানিশ লেদারে দেয়াল ঢাকা। যেখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেছে, সেখানেই কোন না কোন প্রাচীন বা আধুনিক মারণাস্ত্র। যেন কোনও যোদ্ধার ঘর।

'তিনটে শতাব্দীকে পাবেন আপনি এ ঘরে,' বলল লুসিয়েন। 'দেখুন ঘুরে-ফিরে, আমি চট করে কাপড়টা বদলেই চলে আসছি।'

'এসব পিস্তল, বন্দুক, ছোরা তলোয়ারের কোনটা না কি বলছিলেন ঐতিহাসিক…'

হ্যাঁ, তিনটে। এক-এক করে দেখুন। প্রথমে খাটের মাথার কাছে দেখুন একটা ডাগার, হ্যান্ডেলটা বড়, শেষমাথায় একটা সীল আছে।

'পেয়েছি।'

'ওটা সাম্পিয়েতখোর ড্যাগার।'

'অ্যাঁ! বলেন কি! সেই কুখ্যাত সাম্পিয়েতখো, ভ্যানিনার খুনী!'

'খুনী? না, ওটা ছিল প্রতিশোধ।'

'একই কথা। অন্তত আমার কাছে।'

'পৃথিবীর অন্য কোথাও হয়তো এক, কর্সিকায় নয়।'

'খাঁটি জিনিস? মানে, ড্যাগারটা সত্যিই...'

'দেখুন না, সাম্পিয়েতখোর কোর্ট অভ আর্মস আঁকা রয়েছে। লক্ষ করুন, ফ্রান্সের লিলি কিন্তু নেই। তখন পর্যন্ত 'ফ্লোর দ্য লী' (লিলির চিহ্ন) ব্যবহার করবার অনুমতি পায়নি সাম্পিয়েতখো। পাখপিগনা দখলের পর অনুমতি মেলে।'

'ও, এটা আমার জানা ছিল না। তা, এই ড্যাগার আপনার কাছে এলো কি করে?'

'তিনশো বছর ধরে রয়েছে এটা আমাদের পরিবারে। স্যাম্পিয়েতখো নিজেই দিয়েছিল এটা আমাদের এক পূর্বপুরুষ নাপোলিওঁ দো ফ্রানশিকে।'

'ঘটনাটা জানা আছে আপনার?'

'আছে। সাম্পিয়েতখো আর আমার সেই পূর্বপুরুষ একবার একটা অ্যামবুশে পড়ে মরণপণ লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিল। যুদ্ধে সাম্পিয়েতখোর শিরস্ত্রাণ খুলে পড়ে গিয়েছিল। ঠিক সেই সময় শত্রুদের একজন বিশাল এক মুগুর তুলেছিল ওর মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবে বলে। তাই দেখে আমার পূর্বপুরুষ, সেই নাপোলিওঁ, তার ছোরাটা আমূল গেঁথে দিয়েছিল লোকটার শরীরে বর্মের ফাঁক দিয়ে। আহত শত্রু আঁতকে উঠে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে তীরবেগে ভাগল জান-প্রাণ নিয়ে, ছোরাটা আর উদ্ধার করা গেল না। যা মনে হয়, প্রিয় ছোরাটা হারিয়ে আমার পূর্বপুরুষ এতই হা-হুতাশ করেছিল যে সাম্পিয়েতখো নিজেরটা দান করেছিল তাকে। এত চমৎকার একটা ড্যাগার পেয়ে নিজের ছোরার দুঃখ ভুলেছিল নাপোলিওঁ। ছোরাটা স্পেনে তৈরি, দুটো পাঁচ ফ্রাঁ মুদ্রা একটার ওপর আরেকটা রেখে কোপ দিন, দেখবেন চার টুকরো হয়ে গেছে ওগুলো।'

'সত্যিই দেখব?'

'দেখুন না।'

মেঝেতে দুটো পাঁচ ফ্রাঁ মুদ্রা রেখে ধাঁই করে মারলাম। মিথ্যে বলেনি লুসিয়েন, চারটুকরো হয়ে গেছে মুদ্রা দুটো।

'হুঁ,' বললাম, 'কোনও সন্দেহ নেই এটা সাম্পিয়েতখোর ড্যাগার। ভাবছি, এত চমৎকার একটা অস্ত্র থাকতে বউটাকে খুন করল গলায় দড়ি পেঁচিয়ে!'

'তখন ওর কাছে ছিল না এটা,' বলল লুসিয়েন, 'দিয়ে দিয়েছিল নাপোলিওঁকে।'

'তা ঠিক।'

'ষাটেরও ওপরে তখন সাম্পিয়েতখোর বয়স: কনস্টান্টিনোপল থেকে এক্স-এ ছুটে এসেছিল। মেয়েমানুষের যে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে নাক গলানো উচিত নয়, সেই শিক্ষা দিয়ে দিয়েছে ও দুনিয়াকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ড্যাগারটা রেখে দিলাম।

'এই যে হুকে ঝুলিয়ে দিলাম সাম্পিয়েতখোর ড্যাগার। এর পরেরটা ধরা যাক এবার।'

কাপড় পরতে পরতেই বলল লুন্সিয়েন, 'পাশাপাশি দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছেন দেয়ালে?'

'হ্যাঁ, পাওল আর নাপোলিওঁ।'

'ঠিক। পাওলের ছবির পাশে একটা তলোয়ার দেখা যায়?'

'হ্যাঁ।'

'এটা ওঁর।'

'পাওলের তলোয়ার? ওই ড্যাগারের মতই খাঁটি?'

'ঠিক। এটাও দান, তবে কোনও পূর্বপুরুষকে নয়, তার মা-কে।'

মা-কে!'

'হ্যাঁ। আপনি হয়তো শুনেছেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এক যুবককে নিয়ে একজন মহিলা এসে হাজির হয়েছিলেন সুলাকাখো টাওয়ারে?'

'না তো, শুনিনি। বলুন না।'

'ছোট গল্প। সুলাকাখো টাওয়ারে এসে পাওলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন সেই মহিলা। পাওল তখন খুব ব্যস্ত, এই অজুহাতে তাঁকে ভাগিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল প্রহরীরা। কিন্তু মহিলা নাছোড়বান্দা। তিনি ঢুকবেনই, প্রহরীরাও ঢুকতে দেবে না। হট্টগোল শুনে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে পাওল জানতে চাইলেন ব্যাপার কি, গোলমাল কিসের।

' "আমি," বললেন মহিলা, "আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

' "বেশ তো, বলুন কি বলবেন।"

' "দুই ছেলে আমার," বললেন মহিলা, "গত কাল জানতে পারলাম বড়টি মাতৃভূমি রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধে। তাই ষাট মাইল হেঁটে ছোটটাকে নিয়ে এসেছি, আপনার হাতে তুলে দেব বলে।" '

'দারুণ তো! দারুণ কাহিনী! কে এই মহিলা?'

'আমার পিতামহী। কথাটা শোনা মাত্র কোমর থেকে তলোয়ার খুলে উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে পাওল।'

'চমৎকার! সম্মান দেখানোর চমৎকার ভঙ্গি!'

'এ-সম্মানের উপযুক্ত ছিলেন তিনি··· আপনার কি মনে হয়?'

'নিশ্চয়ই। সত্যিকার বীরাঙ্গনা।' একটা খড়্গের ওপর চোখ পড়ল আমার, 'আর এই খড়্গটা?'

'ওইটা? ব্যাটল্ অভ পিরামিডে বোনাপার্তের কোমরে ছিল ওটা।'

'কিভাবে এল এখানে?'

'আমার ঠাকুর্দা ছিলেন বোনাপার্তের সৈন্যদলে। যুদ্ধের পর তিনি আমার দাদাকে হুকুম দেন জনা পঞ্চাশেক সৈন্য নিয়ে মামলুকদের একজন আহত চীফকে ঘিরে থাকা সৈন্যদলকে আক্রমণ করে চীফকে ধরে আনার জন্যে। সিংহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মামলুকদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে চীফকে ধরে আনলেন তিনি ফার্স্ট

কনসালের কাছে। কিন্তু ওঁর "সেবার" (খড়গ) তো আর খাপে ঢোকে না। মামলুকদের দামাস্কান অস্ত্রের সঙ্গে ঠোকাঠুকিতে ওটা এতই বেঁকেচুরে গেছে যে কিছুতেই ঢোকানো গেল না খাপে। শেষে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ওটা। তাই দেখে বোনাপার্ত নিজের খড়্গটা তাঁকে দিয়ে দেন।'

'কিন্তু আমি হলে কমান্ডার-ইন-চীফের ভাল সেবারের চেয়ে আমার ঠাকুর্দার তেড়াব্যাঁকা সেবারটাই ঝুলিয়ে রাখতাম আমার ঘরের দেয়ালে।'

'উল্টোদিকের দেয়ালটা দেখুন, ওটাকেও দেখতে পাবেন। ফার্স্ট কনসাল ওটাকে তুলে নিয়ে বাঁটের গায়ে একটা হীরের টুকরো বসিয়ে ফেরত পাঠিয়েছিলেন আমাদের কাছে। ফলার গায়ের লেখাটা পড়ে দেখতে পারেন।'

দুই জানালার মাঝের দেয়ালে সত্যিই একটা বাঁকাচোরা 'সেবার' দেখতে পেলাম, খাপে ঢোকানো আছে যতটুকু যায়। কাছে গিয়ে ফলার গায়ে খোদাই করা লেখাটা পড়লাম:

ব্যাট্‌ল অভ্ দ্য পিরামিড্‌স্, ২১ জুলাই, ১৭৭৮।

এই সময় বাটলার এসে ঢুকল ঘরে। লুসিয়েনকে বলল, 'ইয়োর এক্সেলেন্সি, খাবার দেয়া হয়েছে, একথা আপনাকে জানাতে বললেন মাদাম দো ফ্রানশি।'

'ভেরি গুড, গ্রিফো,' বলল লুসিয়েন, 'মাকে বলো, এক্ষুণি নামছি আমরা।'

পাহাড়ী পোশাক পরে ড্রেসিংরুম থেকে বেরিয়ে এল লুসিয়েন। বেরিয়েই দেখল, আমি খুব মনোযোগ দিয়ে দুটো রাইফেল পরীক্ষা করছি। দুটোরই গায়ে খোদাই করা রয়েছে:

২১ সেপ্টেম্বর, ১৮১৯—সকাল এগারোটা।

'ওগুলোরও ইতিহাস আছে,' বলল লুসিয়েন। 'আমাদের পারিবারিক ইতিহাস। ওগুলোর একটা আমার বাবার।'

'আচ্ছা! আর অন্যটা?'

হাসল লুসিয়েন। 'আর অন্যটা আমার মায়ের। এখন চলুন, নামি; ওরা অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।'

পাঁচ

লুসিয়েনের শেষ কথাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। আর অন্যটা আমার মায়ের— মাদাম দো ফ্রানশিকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছি এখন। ছেলে খাবার-ঘরে ঢুকেই ভক্তিভরে চুমো খেল তাঁর হাতে, রানীর মহিমা নিয়ে তিনি এ-অনুগত্য গ্রহণ করলেন। ইঙ্গিতে চেয়ার দেখিয়ে আমাদের বসতে বললেন, বসলাম।

'কিছু মনে কোরো না, মা, তোমাকে বোধহয় বসিয়ে রেখেছি অনেকক্ষণ।'

'দেখেছি, প্রবন্ধ আমার, মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে বললাম, 'মশিয়ে লুসিয়েন আমাকে কয়েকটা আশ্চর্য চমৎকার জিনিস দেখিয়েছেন, আমি ওগুলোর

অতীত ইতিহাস জানতে চেয়ে ওঁকে দেরি করিয়ে দিয়েছি।'

'কিচ্ছু ভাববেন না,' মৃদুহেসে এক হাত তুলে আমাকে আশ্বস্ত করলেন মাদাম। 'আমি এইমাত্র এসে বসলাম। তবে...' ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'লুইয়ের খবর জানার জন্যে অস্থির হয়ে আছি।'

'আপনার ছেলে কি অসুস্থ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'লুসিয়েনের তাই ধারণা,' বললেন তিনি।

'চিঠি এসেছে?' লুসিয়েনের দিকে ফিরলাম আমি।

'না, কোনও খবর না,' মাথা নাড়ল লুসিয়েন, 'সেইজন্যেই ওর জন্যে আরও দুশ্চিন্তা হচ্ছে।'

একটু অবাক হলাম। চিঠি আসেনি, খবরও আসেনি; তাহলে কি করে জানছে এরা যে লুই অসুস্থ? যেন আমার এই নীরব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে, এমনি ভাবে লুসিয়েন বলল, 'জানতে পারলাম এই জন্যে যে, গত কয়েকটা দিন আমার নিজেরও শরীরটা ভাল ঠেকছে না।'

'কিন্তু... কিছু মনে করবেন না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না...'

'আপনি জানেন না যে আমরা যমজ?'

'জানি। গাইড বলেছে।'

'জন্মের সময় আমাদের একটা পাশ জোড়া ছিল, একথা বলেনি?'

'না। একথা বলেনি।'

'আসলে ডাক্তারকে ছুরি চালিয়ে আমাদের আলাদা করতে হয়েছিল। ফলে যেখানে যত দূরেই থাকি না কেন, একই শরীর আমাদের– আমরা একে অপরের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা টের পাই। গত কয়েকটা দিন কোনও কারণ ছাড়াই খারাপ লাগছে আমার; কেমন যেন হতাশা, বিষাদ আর পরাজিত ভাব। কেউ যেন সাঁড়াশী দিয়ে চেপে ধরেছে হৃৎপিণ্ডটা। স্পষ্ট বুঝতে পারছি প্রচণ্ড কোনও কষ্টের মধ্যে আছে আমার ভাই।'

অবাক চোখে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। বলে কি! আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, মাদাম দো ফ্রানশি ওর প্রতিটা কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করছেন, যেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। ম্লান, বিষণ্ণ হাসি তাঁর মুখে। বললেন, 'দূরের জন খোদার হাতে, তিনিই তার সহায়। সবচেয়ে বড় কথা, তুমি বুঝতে পারছ ও বেঁচে আছে।'

'ও যদি মারা যেত,' শান্ত, নিচুগলায় বলল লুসিয়েন, 'তাহলে তো ওকে দেখতেই পেতাম।'

'যদি কিছু দেখো, আমাকে জানাবে তো? লুকাবে না?'

'না, মা। সঙ্গে সঙ্গে জানাব। তুমি তো জানোই, তোমার সঙ্গে কোনদিন আমি কোনরকম ছল-চাতুরী করিনি, করবও না।'

'হ্যাঁ, সেটা আমি জানি,' বললেন মা, চোখ দুটো স্নেহের ধারা বর্ষণ করল পুত্রের ওপর, তারপর ফিরলেন আমার দিকে, 'মাফ করবেন, মশিয়ে। মায়ের উদ্বেগ লুকাতে পারিনি। ওরা দুজন শুধু আমার ছেলে নয়, এ-বংশের শেষ ছেলে আসুন, শুরু করা যাক।'

লম্বা টেবিলের এক মাথায় আমরা তিনজন, অন্য মাথায় বসেছে পরিবারের ছয়জন দূর সম্পর্কের আত্মীয়– কর্সিকার ধনী পরিবারে এরা চাকর ও মনিবের মাঝামাঝি অবস্থানে থেকে মনিবদের মত প্রায় সবরকম সুযোগ-সুবিধেই ভোগ করে।

নানারকম লোভনীয় খাবার সাজানো রয়েছে টেবিলে, পেটে খিদেও আছে, কিন্তু তেমন কিছু খেতে পারছি না। কারণ, নানান চিন্তা ঢুকে পড়েছে মাথার ভেতর। যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছি, আশেপাশে যা ঘটছে সে-সব যেন সত্য নয়। এই মহিলা কেমন মহিলা, যিনি যোদ্ধা পুরুষের মত রাইফেল চালাতে পারেন? ছেলেটাই বা কেমন, যে নয়শো মাইল দূর থেকেও ভাইয়ের কষ্ট টের পায়? কেমন মা ইনি, ছেলের কাছ থেকে কথা আদায় করেন যেন ভাইয়ের মৃত্যুর খবর সঙ্গে সঙ্গে জানায় তাঁকে?

খানিক বাদেই বুঝলাম, অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছে, কথা বন্ধ করে অমনোযোগী হয়ে পড়া ঠিক হয়নি; মাথা তুলে তাকালাম। মা ও ছেলে দুজনেই টের পেলেন কথাবার্তা চালিয়ে যেতে চাই।

'কিন্তু,' যেন এতক্ষণ কথোপকথন চলছিল, এমন ভঙ্গিতে জানতে চাইল লুসিয়েন, 'বেড়াবার জন্যে কর্সিকাকে বাছাই করলেন কেন?'

'অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, হঠাৎ করে ছুটি পাওয়ায় সুযোগ হয়ে গেল।'

'আর বেশি দেরি না করে বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। ফরাসী রীতিনীতি, রুচি-পছন্দ যে-রকম দ্রুত অনুপ্রবেশ করছে, আর কয়েক বছর পর কর্সিকাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'তবে আমার ধারণা, আপনাদের প্রাচীন ঐতিহ্য আর জাতীয় চেতনা যদি আধুনিক সভ্যতাকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে দ্বীপের কোনও একটা এলাকায় অবস্থান নেয়– সেটা হবে তাভাখো উপত্যকার এই সাখতান প্রদেশ।'

'আপনার তাই মনে হয়?' হাসিমুখে বলল যুবক।

'হ্যাঁ। এখানেই আমি প্রাচীন কর্সিকার রীতিনীতি ও মহান ঐতিহ্যের জলজ্যান্ত নমুনা দেখতে পাচ্ছি।'

'তা ঠিক। তবে আমার মা আছেন, আমি আছি, আমাদের চারশো বছরের ট্র্যাডিশন, ব্যাটলমেন্ট সহ প্রাচীন এই বাড়ি– এই সবকিছুর মধ্যে থেকেও তো আমার ভাইটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল ফরাসী সভ্যতা। প্যারিস থেকে ফিরবে সে একজন পাস করা আইনজ্ঞ হয়ে। বাপের ভিটে ছেড়ে আজাসিওতে প্র্যাকটিস করবে, মেধা দেখাতে পারলে পাবলিক প্রসিকিউটার হবে, জজ হবে, হত্যাকারীকে আপনার মত বিচার করবে খুনী হিসেবে, বহুপুরুষ থেকে চলে আসা রক্তক্ষয়ী পারিবারিক কলহ থামাবার জন্যে আইন জারি করবে, মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মনে করবে দেশের উপকার করেছে, সভ্যতার নির্মাণে আরেকটা ইঁট গাঁথতে পেরেছে। খোদা! হায়, খোদা!'

'যাই হোক, এটুকু তো মানবেন, ভারসাম্য ঠিকই রেখেছেন খোদা– তাকে যেমন নতুন মত ও পথের অনুসারী করেছেন, তেমনি পুরানো ঐতিহ্য ও ধ্যান-ধারণা রক্ষার ভার দিয়েছেন আপনার ওপর।'

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল লুসিয়েন, 'আমি পারছি না। একজন ফ্রানশি হিসেবে আমার যা করা উচিত ছিল তার বিপরীত কাজ করতে হচ্ছে আমাকে।'

'তাই বুঝি?'

'জ্বী। সাখতানে আসলে আপনি কি দেখতে এসেছেন বলব?'

'বলুন।'

'ব্যবসায়ী, শিল্পী, বা কবি– আপনি যা-ই হন না কেন, এসেছেন কৌতূহল মেটাতে। আমি জানি না আপনি কী, প্রশ্নও করতে চাই না, ইচ্ছে হলে চলে যাবার আগে বলবেন, ইচ্ছে না হলে বলবেন না···আসলে আপনি এসেছেন রক্তক্ষয়ী "ভঁদত" দেখতে, কলহ দেখতে, সত্যিকার দস্যু দেখতে– বইপত্রে যেমন দেখা যায়।'

'অস্বীকার করছি না,' বললাম। 'এ গ্রামে এসে কিছুটা দেখতেও পেয়েছি। একমাত্র এই বাড়িতেই কোনও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নেই।'

'ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। আমার বাপ-দাদার রীতিনীতি আমি ভঙ্গ করেছি। ভঁদত চলছে এ গ্রামে দশ বছর ধরে, আমার পূর্বপুরুষরা এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে যে-কোন একটা পক্ষ নিতেনই, জড়িয়ে পড়তেন পিস্তল-বন্দুক-ছোরা হাতে। আর আমি···আমি কি ভূমিকা পালন করছি জানেন? আমি আম্পায়ার!' মাথা নাড়ল লুসিয়েন। 'দস্যু দেখতে চান? তাহলে চলুন আমার সঙ্গে, সত্যিকার দস্যু দেখিয়ে আনি আপনাকে।'

'সত্যিই? আমাকে সঙ্গে নেবেন আপনি?'

'কেন নয়? আপনি আগ্রহী হলে কেন নেব না?'

'বেশ তো, আমি রাজি– আনন্দের সঙ্গে।'

'মশিয়ে ক্লান্ত হয়ে আছেন,' বললেন মাদাম দো ফ্রানশি। তারপর এমন দৃষ্টিতে তাকালেন ছেলের দিকে, স্পষ্ট বুঝলাম, লুসিয়েনের বক্তব্যের সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ একমত।

'না, মা। তুমি বাধা দিয়ো না, আসুন উনি, দেখে যান। প্যারিসে ফিরে যখন মানুষকে গল্প করতে শুনবেন: কী ভয়ঙ্কর আমাদের ভঁদত (vendetta), কী নিষ্ঠুর কোর্সিয়াঁ দস্যু; তখন আমাদের হয়ে হয়তো দু'চারটে সত্য কথা উনি বলতে পারবেন।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে একটা কলহ মিটমাট হওয়ার পথে। আসলে কী নিয়ে চলছিল ঝগড়া?'

'আমাদের এখানে ঝগড়ার কারণ মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়, ফলাফলটাই হচ্ছে গুরুত্বের,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল লুসিয়েন।

বুঝলাম, দশ বছর ধরে যে রক্তক্ষয়ী কলহে অংশ নিল সুলাকাখো গ্রামের অধিবাসীরা; কারণটা তার তুচ্ছ কিছুই হবে– বাইরের একজনকে বলতে দ্বিধা করছে লুসিয়েন, পাছে হাসির খোরাক হয়। আমারও জেদ চেপে গেল।

'যাই হোক,' বললাম আমি। 'ঝগড়ার কারণ তো নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে। ওটা কি গোপনীয় কিছু?'

'আরে, না। অখলান্দ আর কলোনা পরিবারে এর সূত্রপাত।'

'কিভাবে?'

'শুনবেনই যখন...অখলান্দের উঠান থেকে একটা মোরগ উড়ে গিয়ে পড়েছিল কলোনার উঠানে। অখলান্দের বাড়ি থেকে মোরগটা ধরে আনতে গেলে কলোনারা বলে ওটা ওদের। অখলান্দরা বলে বিচার বসাবে। শুনে যে বুড়ি মোরগটা ধরেছিল সে ঘাড় মুচড়ে ওটাকে মেরে ছুঁড়ে দিয়েছিল প্রতিবেশীর মুখে, "ঠিক আছে, তোমাদের মোরগ হলে খাও গে যাও।" তখন অখলান্দদের একজন মরা মোরগটা ঠ্যাং ধরে তুলে বুড়িকে ওটা দিয়ে পিটাতে গেল। মারার জন্যে হাত তুলেছে, এমনি সময় কলোনাদের একজন, হাতের রাইফেলটা তুলে– ও জানত না গুলি ভরা আছে রাইফেলে– টিপে দিল ট্রিগার। মারা গেল একজন। এই হলো শুরু।'

'তারপর এ-পর্যন্ত কতজন মারা পড়েছে?'

'মোট নয়জন।'

'ওই একটা মোরগের জন্যে?'

'হ্যাঁ। একটু আগেই বলেছি, কারণটা মুখ্য নয়, ধরতে হবে ফলাফলটা।'

'আর নয়জন যখন মরেইছে, দশজন হলে কতটাই বা এসে যাবে!'

'না। তা নয়,' বলল লুসিয়েন। 'আর মরবে না, আমি যখন আম্পায়ার হয়েছি।'

'কার অনুরোধে? অখলান্দ না কলোনা?'

'না-না, এদের কেউ না। আমার ভাইয়ের অনুরোধে। চ্যান্সেলর ধরেছেন আমার ভাইকে, আর সে-ও রাজি হয়েছে। আরে, বাবা, কর্সিকার এক ছোট্ট গ্রামে কি হচ্ছে তা নিয়ে তোমাদের এত মাথা ব্যথা কেন? প্রিফেক্ট ব্যাটা চ্যান্সেলরকে লিখেছে আমি যদি একটা তুড়ি বাজাই, তাহলেই ভোজবাজির মত থেমে যাবে লড়াই। ব্যস, ধরে বসেছে আমার ভাইকে, আর ভাইও কথা দিয়েছে যে আমাকে রাজি করানোর ভার তার। এই হচ্ছে ব্যাপার,' এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল লুসিয়েন। 'আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না, ফ্রানশিদের কেউ তার ভাইয়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে।'

'তার মানে একটা নিষ্পত্তি করে ফেলেছেন?'

'উপায় ছিল না।'

'অর্থাৎ, আমরা আজ সন্ধ্যায় এক পার্টির চীফের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি?'

'ঠিক। গত রাতে অপরজনের সঙ্গে দেখা করেছি।'

'কোথায় দেখা হবে? অনেক দূর?'

'শাতো দি ভিসেন্তেইলো দিস্ত্রির ধ্বংসাবশেষে।'

'তাই নাকি? আমি শুনেছি কাছে পিঠেই আছে সেই বিখ্যাত ধ্বংসস্তূপ।'

'মাইল তিনেক হবে।'

'তাহলে পৌনে একঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাব আমরা ওখানে।'

'বড়জোর পৌনে একঘণ্টা।'

'লুসিয়েন,' বললেন মাদাম দো ফ্রানশি, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, তোমার মত পাহাড়ী একজনের জন্যে পৌনে একঘণ্টার রাস্তা, কিন্তু মশিয়ে তোমার মত চলতে পারবেন না।'

'ঠিক বলেছ, মা। তাহলে ঘণ্টা দেড়েক, কমপক্ষে।'

'তাহলে হাতে আর সময় নেই।' ঘড়ির দিকে তাকালেন মাদাম দো ফ্রানশি।

'মা,' বলল লুসিয়েন, 'তাহলে বেরিয়ে পড়ি আমরা?'

মায়ের বাড়িয়ে ধরা হাতের পিঠে সসম্মানে চুমো খেয়ে আমার দিকে ফিরল লুসিয়েন, 'না কি ধীরে সুস্থে শান্তি মত সাপার শেষ করে নিজের ঘরে গিয়ে সিগার টানতে টানতে পা দুটো আগুনের ধারে গরম…'

'না, না! কিছুতেই না!' বললাম আমি। 'দস্যু দেখাবেন বলে কথা দিয়েছেন দস্যু আমার চাই।'

'বেশ, রাইফেল নিয়েই তাহলে রওনা হয়ে যাব আমরা।'

মাদাম দো ফ্রানশিকে 'বাউ' করে সম্মান দেখিয়ে আমরা যার যার ঘরে গিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। আমি একটা ট্র্যাভেলিং চেস্ট পরে নিলাম– একধারে ঝুলছে একটা হান্টিং নাইফ, অপর ধারে বারুদ আর গুলি রাখার ব্যবস্থা। লুসিয়েন ওর কার্ট্রিজ ব্যাগ নিল, আর নিল একটা ডাবল-ব্যারেল ম্যান্টন। সুন্দর এমব্রয়ডারি করা একটা টুপিও চড়াল মাথায়।

'আমি কি সঙ্গে আসব, ইয়োর এক্সেলেন্সি?' জানতে চাইল গ্রিফো।

'না, তোমার আসতে হবে না,' বলল লুসিয়েন, 'তবে দিয়ামানকে ছেড়ে দাও, চাঁদের আলোয় যদি এক-আধটা ফেয্যান্ট মারার সুযোগ পাই, কুড়িয়ে আনতে পারবে।'

একটু পরেই বিশাল একটা স্প্যানিয়েল বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে, আমাদের পায়ে পায়ে চলছে আর মুক্তির আনন্দে লাফাচ্ছে, হাঁক ছাড়ছে।

কয়েক কদম এগিয়েই পিছন ফিরে বলল লুসিয়েন, গ্রামের সবাইকে জানিয়ে দাও, পাহাড়ের দিক থেকে যদি গুলির আওয়াজ পায়, যেন মনে করে আমরা।'

'ঠিক আছে, আমি জানিয়ে দিচ্ছি, ইয়োর এক্সেলেন্সি।'

'জানিয়ে রাখছি, যাতে ওরা আবার মনে না করে যুদ্ধ বেধে গেছে।' কয়েক গজ এগিয়েই ডান দিকের সরু একটা পথ ধরে সোজা চললাম আমরা পাহাড়ের দিকে।

ছয়

চমৎকার তাজা হাওয়া আসছে সাগর থেকে। মন্ত দো কাগনার পিছন থেকে অপূর্ব সুন্দর চাঁদ উঠেছে পরিষ্কার আকাশে। ভূমধ্যসাগরকে মনে হচ্ছে যেন দিগন্ত জোড়া চকচকে এক স্টীলের আয়না। পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠে চলেছি আমরা। আশপাশের অন্ধকার থেকে নানারকম অচেনা শব্দ কানে আসছে।

এক জায়গায় এসে ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে পথটা। থামল লুসিয়েন। একটা পথ খাড়া উঠে গেছে ওপরে, অন্যটা গেছে পাহাড়ের গা ঘুরে।

'আপনার পায়ের জোর কি রকম?' জানতে চাইল লুসিয়েন। পাহাড়ীদের মত

শক্তিশালী পা, নাকি...'

'পা দুটো ঠিকই আছে,' জবাব দিলাম 'গোলমাল মাথায়।'

'অর্থাৎ, নিচে তাকালে মাথা ঘোরে?'

'হ্যাঁ, মনে হয় টানছে আমাকে।'

'তাহলে এই পথে যাই। ওদিক দিয়ে ঘুরে গেলে অনেকগুলো খাদের একেবারে কিনার ঘেঁষে যেতে হবে। এটায় আরাম নেই, বেশ কষ্টই হবে উঠতে; কিন্তু আবার পৌনে একঘণ্টা সময় বেঁচে যাবে।'

'চলুন, এ-পথ ধরেই যাই তাহলে।'

পথ দেখাল লুসিয়েন, হোলি ঝোপের মাঝখান দিয়ে এগোলাম। দিয়ামান আমাদের থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ সামনে রয়েছে; একবার বামের জঙ্গলে ঢোকে, আবার ডানের; খানিক পরপরই রাস্তায় ফিরে এসে লেজ নাড়ে– অর্থাৎ কোথাও কোনও বিপদ-আপদ নেই, আমার ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারো, চলে এসো, কুইক। বোঝা গেল, ভাল ট্রেনিং পেয়েছে দিয়ামান, দ্বিপদ বা চতুষ্পদ, অর্থাৎ দস্যু বা বুনোশুয়োর– দুরকম জন্তুই শিকার করতে শিখেছে। লুসিয়েনকে বললাম সে-কথা। কিন্তু মাথা নাড়ল ও।

'ভুল হলো। এটা ঠিক, দুরকম জন্তুই তাড়া করতে শিখেছে ও। কিন্তু দস্যুকে নয়। দুপেয়েদের মধ্যে ওর প্রিয় শিকার হচ্ছে টহলদার সৈন্য, মাউন্টেড পুলিশ আর ভলান্টিয়ার।'

'দস্যুদের নয় কেন?'

'কারণ ও একজন দস্যুর কুকুর ছিল। অখলান্দদের একজনের। মাঝে মাঝেই আমি রুটি, বারুদ, বুলেট ইত্যাদি দস্যুদের প্রয়োজনীয় নানান জিনিস পাঠাতাম ওর কাছে। একজন কলোনার হাতে মারা পড়ে লোকটা। যাবার জায়গা ছিল না– অনেকদিনের পরিচয়ে একটা বন্ধুত্ব মত গড়ে উঠেছিল আমার সঙ্গে, তাই পরদিন আমার কাছে চলে এল কুকুরটা।'

'আপনার ভাইয়ের ঘরের জানালা দিয়ে আমি অন্য একটা কুকুর দেখেছি মনে হয়।'

'হ্যাঁ, ও হচ্ছে ব্রুসকো একই ভাবে এসেছে আমার কাছে। তবে একজন অখলান্দের হাতে মারা পড়েছিল ওর প্রভু– এক কলোনা। এখন আমি যদি কোনও কলোনার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম, তাহলে ব্রুসকো থাকত সঙ্গে। ব্রুসকো আর দিয়ামান একই সঙ্গে ছাড়া পেলে কিন্তু খুনোখুনি কাণ্ড ঘটে যাবে।' তিক্ত হাসি হাসল লুসিয়েন। 'দেখুন, মানুষের সঙ্গে কত তফাৎ। মানুষ আপোস করবে, চুক্তি স্বাক্ষর করবে, হয়তো এক টেবিলে বসে খাবেও– কিন্তু ওদের কুকুররা কোনদিন একপাত্রে মুখ দেবে না।'

আমি হেসে ফেললাম। 'এদেরকে সত্যিই তাহলে খাঁটি কর্সিকান কুকুর বলা যায়। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে দিয়ামানের ভদ্রতা জ্ঞানও টনটনে; ওর প্রশংসা হচ্ছে টের পেয়ে বহুক্ষণ হলো সরে গেছে দূরে– সাড়া পাচ্ছি না।'

'চিন্তা করবেন না,' বলল লুসিয়েন, 'আমি জানি কোথায় গেছে ও।'

'কোথায়?'

'লো মশিও-তে।'

ওটা আবার কি বা কোথায় জানতে চাইব কি না ভাবছি, এমন সময় বুক ফাটা আর্তনাদ শুনে চমকে গেলাম। কুকুরের করুণ বিলাপ: এতই দুঃখের, এতই আন্তরিক যে আমার বুকটাও কেঁপে উঠল। 'কি··· কি হলো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ও কিছু না, কাঁদছে দিয়ামান।

'কেন? কার জন্যে?'

'ওর মনিব। একবার যাকে ভালবেসেছে, মানুষ তাকে ভুলতে পারে, কুকুর পারে না।'

'ও, এবার বুঝলাম,' আবার ভেসে এল বিষণ্ন কান্না, এবার আরও করুণ, আরও মর্মস্পর্শী। 'হ্যাঁ, আপনি বলেছেন মারা গেছে লোকটা: খুব সম্ভব ঘটনাটা যেখানে ঘটেছিল তার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছি।'

'হ্যাঁ। সামনেই লো মশিও।'

'ওখানেই কবর দেয়া হয়েছে?'

'হ্যাঁ। কবর এখন অবশ্য মনুমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদেশের নিয়ম হচ্ছে, যে এ-পথে যাবে, সে-ই একটা পাথর বা গাছের ডাল রাখবে নিহত লোকের কবরে। ফলে কালক্রমে কবরটা সমান হয়ে না গিয়ে বড় হতে থাকে, আরও উঁচু হতে থাকে। কবর যত বাড়ে, আত্মীয়-পরিজনের হৃদয়ে ততই বাড়ে প্রতিহিংসার আগুন।'

তৃতীয়বার ডেকে উঠল কুকুরটা, এতই কাছে, যে সব জেনেও, শিউরে উঠলাম। পথটা বাঁক নিতেই বিশ গজ দূরে চার-পাঁচ ফুট উঁচু সাদা পাথরের স্তূপ দেখতে পেলাম। এটাই লো মশিও। কবরের পায়ের কাছে গলা লম্বা করে বসে আছে দিয়ামান, চোয়াল খোলা। একটা পাথর তুলে নিল লুসিয়েন, মাথা থেকে টুপিটা খুলে এগিয়ে গেল লো মশিওর দিকে।

আমিও তাই করলাম। কাছাকাছি গিয়ে একটা ওক ডাল ভেঙে হাতে নিল লুসিয়েন, প্রথমে পাথরটা ছুঁড়ে দিল, তারপর ডালটা: তারপর খুব দ্রুত বুড়ো আঙুল দিয়ে ক্রুসচিহ্ন আঁকল বুকে, ঠিক যেভাবে সঙ্কটের মুহূর্তে আঁকতেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

ও যেভাবে যা করল, আমিও সে-সব অনুকরণ করলাম।

তারপর চুপচাপ যে-যার চিন্তায় নিমগ্ন থেকে পা বাড়ালাম সামনে। পেছনে রয়ে গেল প্রভুভক্ত দিয়ামান। মিনিট দশেক পর ওর শেষ বিলাপ কানে এল, তারপর মাথা আর লেজ নিচু রেখে পাশ কাটাল আমাদের। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে একশো গজ দূরে কোন শিকার পয়েন্ট করে এগিয়ে গেল সেদিকে।

সাত

চলতে চলতেই টের পেলাম পথটা ক্রমে আরও খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম, কারণ বুঝতে পারছি শীঘ্রি দুই হাতও ব্যবহার করতে হবে। লুসিয়েন অবশ্য নির্বিকার ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, যেন পথটার পরিবর্তন খেয়ালই করেনি। কয়েক মিনিট পাথুরে খাড়াই বেয়ে, কখনও ঝোপ-ঝাড় কখনও বড় গাছের শিকড় ধরে ওঠার পর ভাঙা দেয়াল ঘেরা একটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছলাম। বুঝলাম, শাতো দি ভিসেনতেইলো দিস্ত্রির সীমানায় ঢুকলাম।

আরও মিনিট পাঁচেক আরও খাড়া পথ বেয়ে ওঠার পর হাত বাড়িয়ে শেষ ধাপটা আমাকে টেনে তুলল লুসিয়েন।

'একজন শহুরে প্যারিসবাসীর তুলনায় রীতিমত ভাল দেখিয়েছেন আপনি,' বলল লুসিয়েন সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে।

'শেষমেশ যদিও টেনে তুলতে হয়েছে,' বললাম বিরস কণ্ঠে।

'যাই হোক, পৌঁছে গিয়েছি। চার শতাব্দী আগে এলে আমার পূর্বপুরুষরা দরজা খুলে বলত: "স্বাগতম! আসুন আমাদের শাতোয়।" আর আজ তাদের বংশধর আপনাকে ভাঙাচোরা দালান দেখিয়ে বড়জোর বলতে পারে "আসুন আমাদের ধ্বংসাবশেষে স্বাগতম!"

'তাহলে কি ভিসেনতেইলো দিস্ত্রির মৃত্যুর পর আপনাদের পরিবারের হাতে আসে এই শাতো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না। তার জন্মেরও আগে এটা ছিল আমাদের সবার পূর্বপুরুষ লুসিয়েন দো ফ্রানশির বিধবা স্ত্রী বিখ্যাত সাভিলির শাতো।'

'তারপর?'

'সে এক লম্বা গল্প। দিন হলে আপনাকে শাতো দো ভালের ধ্বংসাবশেষ দেখাতে পারতাম। ওখানে থাকত সিনর দো গীদিস্। যেমন কুৎসিত ছিল চেহারা, তেমনি কুৎসিত ছিল তার লালসা। সাভিলিকে মানুষ যে পরিমাণ ভালবাসত ঠিক সেই একই পরিমাণ ঘৃণা করত এই গীদিসকে। এই লোক প্রেমে পড়ল সুন্দরী সাভিলির। কিন্তু মহিলার তরফ থেকে কোনও রকম সাড়া পাওয়া যায় না। শেষে একদিন সময় বেঁধে দিয়ে হুমকি দিল গীদিস: যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে রাজি না হয়, তাহলে গায়ের জোরে তুলে নিয়ে যাবে সাভিলিকে। মনে হলো রাজি হয়ে যাবে সাভিলি– গীদিসকে ডিনারে দাওয়াত করল সে। খুশি মনে চলল গীদিস দাওয়াত খেতে, সঙ্গে নিয়েছে শুধু দু'একজন চাকর। ভুলেই গেছে শ্রই দাওয়াত আদায় করেছে সে হুমকির মাধ্যমে ওরা ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল শাতোর দরজা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে বন্দী হলো গীদিস, পাতাল-কারাগারে তালা মেরে রাখা হলো তাকে।'

গল্প শুনতে শুনতে চার কোনা একটা প্রাঙ্গণে পৌঁছে গেলাম। চারপাশে আলোছায়ার খেলা। জোরাল চন্দ্রালোকে ছড়ানো ছিটানো ধ্বংসস্তূপ রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

ঘড়ি বের করে দেখল লুসিয়েন।

'আসুন, বসি এখানে। বিশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেছি।'

ঘাসের ওপর আধশোয়া হয়ে বসলাম আমরা। বললাম, 'গল্পের সবটা কিন্তু বলেননি আপনি।'

'না। বলার মত বেশি কিছু নেইও আর। এরপর শুরু হলো সাভিলির নির্যাতন। পরের তিনটি মাস প্রত্যেকদিন সকাল-বিকেল পাতাল-কারাগারে যেত সে, গীদিস যে সেলে বন্দী হয়ে ছিল তার পাশের সেল-এ ঢুকে লোহার শিকের এপাশ থেকে ব্যঙ্গ করত তাকে, "গীদিস, তোমার মত এমন ভয়ঙ্কর কুৎসিত লোক কি করে ভাবতে পারলে তোমাকে বিয়ে করতে রাজি হব আমি?"

'তিনমাস এই অকথ্য নির্যাতন সহ্য করার পর একদিন এক পরিচারিকার সাহায্য নিয়ে পালিয়ে গেল গীদিস। তারপর লোক-লস্কর নিয়ে ফিরে এল, সাভিলিকে ধরে বড় একটা খাঁচায় বন্দী করে রোসা দি সিলাসির জঙ্গলে চৌরাস্তার ওপর রেখে দিল। এই অপমান সহ্য করতে না পেরে তিনদিন পর মারা গেল সাভিলি।'

'দেখা যাচ্ছে, আপনাদের পূর্বপুরুষরা জানতেন কিভাবে প্রতিশোধ নিতে হয়। এর তুলনায় আপনাদের ছুরি মারা বা গুলি করে খুন করা অনেক নিম্নমানের প্রতিশোধ।'

'কদিন পর এই নিম্নমানের প্রতিশোধও আর থাকবে না এখানে। কেউ কাউকে খুন করবে না, কেউ বদলা নেবে না খুনের,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লুসিয়েন। 'যাই হোক, গল্পের যে পর্যায়ে আছি, তখনও ওরা আমাদের মত ভাল হয়ে যায়নি। আজাসিওতে চাচার কাছে সত্যিকার কর্সিকান হিসেবে মানুষ হচ্ছিল সাভিলির দুই ছেলে। বড় হয়েই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল গীদিসের ছেলেদের ওপর। শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়। চার শতাব্দী চলল এক তুমুল পারিবারিক যুদ্ধ, শেষ হলো আঠারোশো উনিশ সালের একুশে সেপ্টেম্বর, বেলা এগারোটায়– আমার বাবা-মার রাইফেলের গায়ে তারিখটা দেখেছেন আপনি।

'হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে আছে। সাপারের জন্যে তাড়াহুড়ো থাকায় কারণ জানা হয়নি তখন।'

'ঘটনাটা হচ্ছে: ১৮১৯ সালে গীদিস পরিবারে জীবিত ছিল কেবল দুই ভাই; আর ফ্রানশি পরিবারে একা আমার বাবা। বাবা বিয়ে করলেন তাঁর এক চাচাতো বোনকে। বিয়ের তিন মাসের মধ্যে গীদিসরা স্থির করল সর্বাত্মক একটা আক্রমণ চালিয়ে খতম করতে হবে এই পরিবারটাকে। ঠিক হলো এক ভাই ওলমেতো রোডে লুকিয়ে থাকবে, খবর পেয়েছে বাবা আসছেন সাখতান থেকে; আর অপর ভাই বাবার অনুপস্থিতিতে বাড়ি আক্রমণ করবে। প্ল্যানে কোনও ত্রুটি ছিল না, আক্রমণও এল যথাসময়ে: কিন্তু ঘটনা ঘটল সম্পূর্ণ বিপরীত। বাবা সাবধান ছিলেন, কারণ আগেই টের পেয়ে গেছেন কি ঘটতে চলেছে: আর মা কাজের

লোকজন জড়ো করে প্রস্তুতি নিলেন প্রতি-আক্রমণের। দুজনেই তৈরি: বাবা পাহাড়ে; মা আমার ঘরে। পাঁচ মিনিটের যুদ্ধেই পতন ঘটল দুভাইয়ের, বাবার হাতে মরল একজন, মার হাতে অপরজন। শত্রুর মৃত্যুর মুহূর্তে ঘড়ি দেখলেন বাবা: বেলা এগারোটা বাজে। মা যখন দেখলেন গুলি ঠিক জায়গামত বিঁধেছে, তিনিও ঘড়ি দেখলেন: বেলা এগারোটা।

'ঠিক বেলা এগারোটায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল গীদিস পরিবার। চার শতাব্দী ধরে সম্মানের লড়াই শেষে বিজয়ী হলো ফ্রানশি পরিবার– শান্তি এল এলাকায়। ঘটনাটা স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে রাইফেল দুটোর বাঁটে ওই লেখা খোদাই করে ঘড়ির দুপাশে দুটোকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখনও ঝুলছে ওখানেই। সাত মাস পর যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন থশস্প একজন এই আপনার সামনে– কর্সিকান লুসিয়েন; আর অন্যজন হচ্ছে দার্শনিক লুই।'

চাঁদের আলোয় একটা লোকের ছায়া দেখতে পেলাম। এসে গেছে দস্যু, তার পাশে রয়েছে দিয়ামান। এমনি সময় দূর থেকে ভেসে এল সুলাকাখোর ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি– ঠিক নয়টা বাজে।

বোঝা গেল, সময়ানুবর্তিতাকে মর্যাদা দেয় ওই পাহাড়ী দস্যু।

আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

আট

'আপনি তো একা নন, মশিয়ে লুসিয়েন?' একটু তফাতে থেমে দাঁড়িয়ে বলল দস্যু।

'এ নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না অখলান্দ; উনি আমার অতিথি। তোমার কাছে আসছি শুনে উনিও সঙ্গে আসতে চাইলেন। তোমাকে জানার সুযোগ থেকে ওঁকে বঞ্চিত করা ঠিক হবে না মনে করে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'আমাদের এই পাহাড়ী দেশে আপনাকে স্বাগতম, মশিয়ে,' মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল দস্যু, তারপর এগিয়ে এল। লোকটা লম্বা, বুক ঢেকে আছে কুচকুচে কালো ঘন দাড়িতে।

অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে আমিও তাকে সালাম জানালাম।

'আপনারা বেশ আগেই পৌঁছে গেছেন মনে হচ্ছে?' বলল অখলান্দ।

'হ্যাঁ; বিশ মিনিট।'

'তাই হবে। দিয়ামানের কান্না শুনলাম, তারপর এই মিনিট পনেরো হবে আমাকে খুঁজে বের করেছে। দারুণ একটা বিশ্বস্ত, ভাল কুকুর, তাই না, মশিয়ে লুসিয়েন?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, অখলান্দ– ভাল এবং বিশ্বস্ত।' কথাটা বলে দিয়ামানকে আদর করে দিল লুসিয়েন।

'আপনি নিজেও পৌঁছে গেছেন আগে,' বললাম আমি, 'জানেন, মশিয়ে

লুসিয়েনও হাজির। তাহলে আরও আগেই এলেন না কেন?'

'কারণ সাক্ষাতের সময় ছিল নয়টা,' জবাব দিল দস্যু। 'পনেরো মিনিট আগে বা পরে আসা অনুচিত কাজ।'

'আমাকে খোঁচানো হচ্ছে বুঝি?' হাসিমুখে বলল লুসিয়েন।

'না, মশিয়ে; আপনার আজকের ব্যাপারটায় যুক্তি আছে। সঙ্গে আরেকজন আছেন, তাঁর সুবিধা-অসুবিধা দেখতে হয়েছে। সম্ভবত সেজন্যেই এই প্রথমবারের মত সময়ের কিছুটা হেরফের হলো আপনার। আমি তো জানি, ঠিক সময়ে পৌঁছতে গিয়ে আপনি আমার জন্যে কত বার কত কষ্ট স্বীকার করেছেন।'

'সেজন্যে আমাকে ধন্যবাদ দেয়ার দরকার নেই, অখলান্দ। এবারই তো শেষ।'

'এ-ব্যাপারে কিছু কথা ছিল না আমাদের, মশিয়ে লুসিয়েন?' জানতে চাইল দস্যু।

'হ্যাঁ, এসো আমার সঙ্গে।' আমার দিকে ফিরল লুসিয়েন, 'অল্পক্ষণের জন্যে আমাদের ক্ষমা করতে হবে, মশিয়ে।'

'নিশ্চয়ই। আপনারা কাজ সারুন।'

কিছুদূর সরে গেল ওরা, চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে কথা শুরু করল।

দূর থেকে ছায়ার মত দেখাচ্ছে দুজনকে। একজন বিশ-একুশ বছর বয়সী তরুণ, অপরজন চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বছরের পরিপক্ব লোক। একই ধরনের কাপড় পরে আছে দুজন; তবে জঙ্গলে জঙ্গলে কঠোর জীবন যাপন করায় অখলান্দের কাপড় কিছুটা মলিন। কি বলছে ওরা বোঝা যাচ্ছে না; প্রথমত দূরত্ব আর দ্বিতীয়ত ভাষার কারণে। কর্সিকার আঞ্চলিক ভাষা আর বিশগজ দূরত্ব সত্ত্বেও হাবভাব ও কণ্ঠস্বরের ওঠানামা শুনে এটুকু বুঝতে পারছিলাম লুসিয়েনের কথা মানতে পারছে না দস্যু, চটে উঠছে মাঝে মাঝে; কিন্তু শান্তকণ্ঠে একের পর এক যুক্তি তুলে ধরছে লুসিয়েন।

ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল অখলান্দ, ওর হাবভাব ও গলার স্বরে উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষণ। শেষপর্যন্ত কিছু একটা মন্তব্য করে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে মাথা নিচু করে রাখল অখলান্দ, তারপর ঝট করে মাথা তুলে বাড়িয়ে দিল ডান হাত। হ্যান্ডশেকের পর দুজন এগিয়ে এল আমার দিকে।

'প্রিয় অতিথি,' আমার নাম এখনও জানে না লুসিয়েন; ও-ও জিজ্ঞেস করেনি, আমিও বলিনি, 'ইনি হচ্ছেন অখলান্দ– আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাত মেলাতে চান।'

'ধন্যবাদ কিসের জন্যে?' প্রশ্ন করলাম।

'ওঁর জামিনদার হতে রাজি হওয়ায়। আমি কথা দিয়েছি যে আপনি রাজি হবেন।'

'আপনি যদি কথা দিয়ে থাকেন, তার একমাত্র অর্থ হচ্ছে আপনি মনে করেন কাজটা করা আমার উচিত। আমার কোনও আপত্তি নেই, যদিও জানি না ব্যাপারটা কি নিয়ে।'

দস্যুর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলাম, সে শুধু আমার তালুতে আঙুলের ডগা

ছুঁইয়ে সম্মান দেখাল।

'এইবার,' বলল লুসিয়েন, প্যারিসে ফিরে আমার ভাইকে বলতে পারবেন যে, সবকিছুই নিষ্পত্তি করা হয়েছে তার ইচ্ছে মত, এবং চুক্তিপত্রে আপনি নিজে স্বাক্ষর করেছেন।'

'মিটমাট হয়ে গেল তাহলে?'

'না, না, এখনও হয়নি; তবে সম্ভবত হতে যাচ্ছে।'

ক্রূর হাসি দেখা গেল দস্যুর মুখে। 'শান্তি,' বলল সে, 'আপনি যখন এত করে চাইছেন। কিন্তু, মশিয়ে লুসিয়েন, মৈত্রী নয়– চুক্তিতে এই শব্দটা থাকতে পারবে না।'

'থাকবে না,' বলল লুসিয়েন, 'ওটা ভবিষ্যতের এক্তিয়ারে। যাই হোক, একবার প্রসঙ্গ পাল্টানো যাক। আপনি কিছু শোনেননি, আমি যখন অখলান্দের সঙ্গে কথা বলছিলাম?'

'আপনারা কী বলছেন, সেটা শুনেছি কি না?'

'না! কাছে পিঠেই একটা ফেয়্যান্ট কি যেন বলছিল।'

'সত্যি বলতে কি, একবার মনে হয়েছিল কর্-অর্ক্ করে উঠল কিছু, তারপর মনে হলো ভুল শুনেছি।'

'না, ভুল শোনেননি; ওই বাদাম গাছে রয়েছে পাখিটা,' বলল লুসিয়েন 'ভালই হলো, কাল খাওয়া যাবে ওটাকে।'

'আমি অনেক আগেই ফেলে দিতাম ওকে,' বলল অখলান্দ। 'গ্রামের ওরা যদি আবার মনে করে গুলিটা অন্য কিছুকে করছি, সেই ভয়ে সামলে রেখেছি নিজেকে।'

'আমার সে ভয় নেই,' হাসিমুখে বলল লুসিয়েন। 'গ্রামের ওদেরকে জানিয়েই এসেছি আমি। তবে…' লোড করা বন্দুকটা কাঁধে ঝুলাল সে, 'প্রথম সুযোগ আপনার।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান!' আঁৎকে উঠলাম। 'আমার হাত তত ভাল না। আমি বরং পাখিটা খাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করব। গুলি আপনিই করুন।'

বেশ,' বলল লুসিয়েন। 'রাতের শিকারে আপনি অভ্যস্ত নন গুলি ঠিক নিচ দিয়ে যাবে। যাই হোক, কাল দিনে যদি আপনার তেমন কোন কাজ না থাকে আজকের শোধ তুলে নিতে পারবেন।'

নয়

সংক্ষেপে যেদিক দিয়ে ঢুকেছিলাম তার বিপরীত দিক দিয়ে বেরিয়ে এলাম লুসিয়েন আগে আগে। আমরা ঝোপ-ঝাড়ে ঢুকতেই আবার 'কর-অর্ক্, কর-অর্ক' শুরু করল ফেয়্যান্ট।

আশি গজ মত দূরে মস্ত এক বাদাম গাছে রয়েছে পাখিটা। গাছের চারপাশে

এতই ঘন জঙ্গল যে এগোনো মুশকিল।

'কাছে যাবেন কি করে?' জিজ্ঞেস করলাম। 'আপনি কয়েক গজ এগোলেই টের পেয়ে সতর্ক হয়ে যাবে। সহজ হবে না।'

'না,' মাথা নাড়ল লুসিয়েন, খালি যদি ওটাকে দেখতে পেতাম, তাহলে এখান থেকেই গুলি করতাম।'

'এখান থেকে? বলেন কি! আশি গজ দূরের ফেয়্যান্ট ফেলতে চান শট-গান দিয়ে?'

'শট দিয়ে হলে, না; বুলেট দিয়ে হলে, হ্যাঁ।'

'তা ঠিক, বুলেট হলে সম্ভাবনা আছে লাগার।'

'পাখিটা দেখতে চান?' জিজ্ঞেস করল অখলান্দ।

'হ্যাঁ। দেখতে পেলে সুবিধে হতো।'

'দাঁড়ান, দুই মিনিটেই দেখতে পাবেন।' বলেই মেয়ে ফেয়্যান্টের অনুকরণে ডাকতে শুরু করল অখলান্দ।

সঙ্গে সঙ্গেই নড়াচড়া দেখতে পেলাম বাদাম গাছের পাতায়। ফেয়্যান্টটাকে যদিও দেখা যাচ্ছে না, বোঝা গেল লাফিয়ে এক শাখা থেকে আরেক শাখায় যাচ্ছে ওটা, ডাকছে অখলান্দের জবাবে। ক্রমে উঠছে ওপর দিকে।

শেষে বাদাম গাছের আগায় উঠে এল পাখিটা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ডাক বন্ধ করে দিয়েছে অখলান্দ। পাখিটা ঘাড় বাঁকিয়ে খুঁজছে ওকে। ঠিক এমনি সময়ে বন্দুক তুলে এক মুহূর্ত লক্ষ্য স্থির করেই গুলি করল লুসিয়েন। পাথরের মত পড়ল নিচে ফেয়্যান্ট।

'যাও, নিয়ে এসো,' দিয়ামানকে নির্দেশ দিল লুসিয়েন।

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে ছুটল কুকুরটা, কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিয়ে এল ওটাকে মুখে করে। দেখা গেল, ঠিক মোক্ষম জায়গায় লেগেছে বুলেট।

'দারুণ দেখিয়েছেন,' বললাম আমি। 'বুলেট হোক আর যাই হোক, দোনলা বন্দুক দিয়ে এত নিখুঁত গুলি করা সহজ কথা নয়।'

'যতটা ভাবছেন ততটা কঠিনও নয়,' বলল লুসিয়েন। 'এ বন্দুকের একটা ব্যারেল রাইফ্লিং করা বলে একেবারে কারবাইনের মত গুলি হয়।'

'তবু আমি বলব, চমৎকার মেরেছেন।'

'ওঁর তুলনায় এটা ছিল সহজ টার্গেট,' বলল অখলান্দ। 'একটা রাইফেল দিয়ে তিনশো গজ দূরে রাখা পাঁচ ফ্রাঁর একটা মুদ্রা ফুটো করতে দেখেছি আমি মশিয়ে লুসিয়েনকে।'

'রিভলভারেও কি একই রকম দক্ষতা...'

আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই উত্তর দিল অখলান্দ। বরং বেশি। পঁচিশ গজ দূর থেকে একটা ছোরার ফলায় সাজানো বারোটা বুলেট থেকে যে-কোন ছয়টা গুলি করে ফেলে দিতে পারেন উনি; বাকি ছয়টা যেমন ছিল তেমনি থাকবে।'

মাথার হ্যাট উঁচু করে প্রশংসা জানালাম লুসিয়েনকে।

'আপনার ভাইও কি আপনার মত... অখলান্দ হেসে ওঠায় থেমে গেলাম।

'না।' আমার প্রশ্নের জবাব দিল লুসিয়েন, 'আমার ভাই জীবনে কোনদিন বন্দুক-পিস্তল ছুঁয়ে দেখেনি। কোনওদিন না। সেজন্যেই তো ভয়ে ভয়ে আছি, কখন কার সঙ্গে কী গোলমালে জড়িয়ে যাবে প্যারিসে। কেউ চ্যালেঞ্জ করে বসলে কর্সিকার সম্মানে ডুয়েল সে লড়বেন, ভয় পাওয়ার বা পিছিয়ে আসার পাত্র সে নয়– এবং মারা পড়বে বেঘোরে।'

ফেয়্যান্টটাকে ভেলভেট কোটের বড়সড় পকেটে ভরে নিয়ে দস্যুর দিকে ফিরল লুসিয়েন, 'তাহলে চলি, অখলান্দ। কাল সকালে দেখা হবে।'

'কাল সকালে মশিয়ে লুসিয়েন।'

'তোমার সময়-জ্ঞান আছে, জানি। কাল সকাল ঠিক দশটায়, তুমি, তোমার বন্ধু-বান্ধব আর আত্মীয়স্বজন রাস্তার শেষ মাথায় থাকবে, ঠিক আছে? আর নদীর দিক থেকে রাস্তার ওই মাথায় থাকবে কলোনা, তার আত্মীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধব। আমরা থাকব গির্জার সিঁড়ির ধাপে।'

'ঠিক আছে, মশিয়ে লুসিয়েন; অনেক কষ্ট করলেন, ধন্যবাদ। আর আপনি, মশিয়ে,' আমার দিকে ফিরে বাউ করল অখলান্দ, 'আমার জামিনদার হয়ে আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছেন, সেজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

জঙ্গলের দিকে চলে গেল অখলান্দ, আমরা রওনা হলাম গ্রামের দিকে। কয়েক মুহূর্ত অনিশ্চয়তায় ভুগল দিয়ামান, একবার অখলান্দের দিকে চাইল, একবার আমাদের দিকে; শেষে মনোস্থির করল, আমাদের সঙ্গেই যাবে।

আমি কিছুটা ভয়ে ভয়ে ছিলাম। জানি, যে-পথে এসেছি সে-রকম খাড়াই বেয়ে নামতে হলে কপালে খারাবি আছে, কারণ ওঠার চেয়ে নামা কঠিন, আছাড় খাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু, আমার মনের অবস্থা টের পেয়েই সম্ভবত, গ্রামে ফেরার জন্যে ভিন্নপথ ধরল লুসিয়েন।

কিছুক্ষণের পরিচয়েই আমার হৃদয়ে সম্মানের আসন দখল করে নিয়েছে ছেলেটা। এর প্রতি গভীর ভালবাসা অনুভব করছি। এত অল্পসময়ে এমন অনায়াসে কেউ আমার মন জয় করে নিতে পারবে কোনদিন ভাবিনি। সহজ সরল কথাবার্তা, চালচলন; ব্যবহারে অহঙ্কার বা আত্মম্ভরিতার সামান্য ছিটেফোঁটাও নেই; সৌজন্য-বিনয়-ভদ্রতা-শালীনতা কিছুরই অভাব নেই এই গ্রাম্য যুবকের মধ্যে। সত্যি বলতে কি, এর অর্ধেকও আমি আশা করিনি।

চলতে চলতে বললাম, 'তাহলে শান্তি এল শেষ পর্যন্ত!'

'আপনি তো দেখলেনই, খুব সহজ হয়নি ওকে রাজি করানো। যখন বললাম যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটা কলোনাই দিয়েছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তখন কিছুটা নরম হয়েছে। কলোনারা মারা গেছে পাঁচজন লোক, আর অখলান্দদের গেছে চারজন– এটা একটা পয়েন্ট; গতকালই কলোনা শান্তি প্রস্তাব মেনে নিয়েছে আর এ মেনেছে আজ– এটা দ্বিতীয় পয়েন্ট; তবে তৃতীয় পয়েন্টটাই ওকে প্রভাবিত করেছে সবচেয়ে বেশি– কলোনা আগামী কাল সবার সামনে অখলান্দের হাতে একটা জীবন্ত মোরগ দিতে রাজি হয়েছে; অর্থাৎ পরোক্ষভাবে নিজের দোষ মেনে নিল কলোনা। কাজেই আপোসে রাজি ওকে হতেই হলো।'

আগামীকালই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হচ্ছে?'

'আগামীকাল সকাল দশটায়। কাজেই দেখুন, কপালটা আপনার নেহায়েত খারাপ নয়– ভঁদত দেখ্‌তে এসেছিলেন শুধু ভঁদত নয়, তার শেষও দেখে যেতে পারছেন।' তিক্ত হাসি হাসল লুসিয়েন। 'কলহ-বিবাদ-রক্তক্ষয়-প্রতিশোধ– এসবের কিন্তু দরকার আছে। গত চারশো বছর এছাড়া আর কোনও আলোচ্য বিষয় ছিল না কর্সিকাবাসীদের। আপোস একটা দুর্লভ ঘটনা।'

হা-হা করে হেসে উঠলাম।

'এই দেখুন, হাসি এসে যাচ্ছে আপনার,' ম্লানকণ্ঠে বলল যুবক। 'আমাদের কারবার দেখে হাসি পাচ্ছে আপনার, ঠিকই আছে, আমরা তো হাসির পাত্রই।'

'না,' হাসি সংবরণ করলাম। 'কর্সিকানদের মত এত চমৎকার মানুষ আর কোথাও দেখিনি আমি। হাসছি অন্য কারণে। নিজের ওপরই রেগে গেছেন আপনি নিজের সাফল্যের জন্যে।'

হাসি ফুটল যুবকের মুখে। 'সত্যি, ঠিক ধরেছেন। ভাষাটা জানা থাকলে আপনি আমার বাক-চাতুরীর প্রশংসা না করে পারতেন না। কিন্তু দশটা বছর পর আবার আসুন, দেখবেন, এলাকার সবাই ফ্রেঞ্চ বলছে– দুঃখটা এখানেই।'

এজন্যেই একে সত্যিকার কর্সিকান হিসেবে মেনে নিয়েছে সবাই।

দশ

আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল গ্রিফো।

কেউ কিছু বলার আগেই প্রভুর পকেট হাতড়ে ফেয়্যান্টটা বের করে নিল সে। গুলির আওয়াজ পেয়েছে। মাদাম দো ফ্রানশি নিজের ঘরে গেছেন, কিন্তু শুয়ে পড়েননি এখনও; গ্রিফো বলল, শুতে যাওয়ার আগে লুসিয়েন যেন তাঁর সাথে দেখা করে যায়।

আমার কিছু লাগবে কি না জানতে চাইল লুসিয়েন, আমি 'না' বলায় চলে গেল মার সঙ্গে দেখা করতে।

ঘরে ফিরে ধীরে-সুস্থে জামা-কাপড় ছাড়লাম, তারপর ভবিষ্যৎ আইনজ্ঞের বুকশেল্‌ফ থেকে ভিকতর হুগোর 'ওরিয়েন্টাল্‌স্' নিয়ে শততম বারের মত পড়তে শুরু করলাম। প্রথম পরিচ্ছেদটা মাত্র শেষ করেছি, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমার ঘরের দরজায় এসে থামল আওয়াজটা। বুঝলাম, শুভরাত্রি জানাতে এসেছে লুসিয়েন, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছি মনে করে দ্বিধা করছে ঘরে ঢুকতে।

'আসুন, চলে আসুন,' ডাকলাম।

'মাফ করবেন,' বলল লুসিয়েন, 'আপনার সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় কিছুটা কর্কশ ব্যবহার করে ফেলেছি– তাই ক্ষমা চাইতে এলাম। তাছাড়া, মনে হচ্ছে, কিছু প্রশ্ন এখনও রয়েছে আপনার মনে, যার সদুত্তর আমি দিইনি...'

'না, না। আপনি অযথা নিজেকে অপরাধী ভাবছেন। আমিই বরং ভাবছিলাম

আপনাকে যথেষ্ট জোরাল ভাবে ধন্যবাদ জানানো হয়নি। এক সন্ধ্যাতেই আপনি আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমার এই কর্সিকা-ভ্রমণকে সার্থক করে দিয়েছেন। শুধু একটা ব্যাপারে আমার মনে কিছু প্রশ্ন ছিল, কিন্তু আমি স্থির করেছি, ওসব নিয়ে আর আপনাকে বিব্রত করব না।

'কেন?'

'কারণ, সেটা হবে চরম অভদ্রতা। তাছাড়া, সব প্রশ্নেরই উত্তর জানতে হবে…'

'কেন নয়?' বাধা দিল লুসিয়েন। 'আপনি যেটাকে অভদ্র প্রশ্ন মনে করছেন, আমি হয়তো সেটাকে তা মনে করব না। কৌতূহল না মিটলে মনে নানা রকম সন্দেহ এসে দানা বাঁধে, আমার প্রতি সেটা সুবিচার হবে না। সন্দেহ পুষে না রেখে সত্য জেনে নেয়া অনেক ভাল না? তার চেয়ে বরং প্রশ্ন করে উত্তরটা জেনেই নিন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনি জাদু জানেন– এটা ছাড়া আর কোনও সন্দেহ আমার মনে দানা বাঁধেনি।'

প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়ল লুসিয়েন।

'এবার আপনার মত আমিও কৌতূহলী হয়ে উঠলাম,' বলল লুসিয়েন হাসি থামিয়ে। 'জাদু জানি মানে?'

'মানে, শুধু একটা বিষয়ে– তাছাড়া আমার প্রতিটি প্রশ্নের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে উত্তর দিয়েছেন আপনি। চমৎকার অস্ত্রগুলো দেখিয়ে কোন্‌টা কার কাছ থেকে কিভাবে এসেছে বুঝিয়ে বলেছেন।'

'এক নম্বর।'

'দুটো কারবাইনে একই তারিখ খোদাই করা কেন, বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।'

'দুই।'

'আপনারা দুই ভাই কেন একে অন্যের অনুভূতি টের পান বলেছেন আমাকে। জন্মের সময় যে আপনারা এক ছিলেন…'

'হ্যাঁ, এটা তৃতীয়।'

'তারপর খাবার টেবিলে মাদাম দো ফ্রানশি যখন গত কয়েকটা দিন আপনার শরীর-মন খারাপ থাকা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, জানতে চাইলেন আপনার ভাই বেঁচে আছেন এ-ব্যাপারে আপনি নিঃসন্দেহ কি না; আপনি বললেন, ও যদি মারা যেত, তাহলে তো ওকে দেখতেই পেতাম।'

'হ্যাঁ, ঠিক। এই কথাটাই বলেছি।'

'কিন্তু এর ব্যাখ্যা আমার কাছে পরিষ্কার নয়।'

লুসিয়েনের মুখটা এতই গম্ভীর হয়ে উঠল যে থমকে গেলাম। চট্ করে বললাম, 'এই দেখুন, অনুচিত প্রশ্ন করে ফেলেছি। যা বলেছি ভুলে যান।'

'না।' মাথা নাড়ল লুসিয়েন। 'বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হওয়াই স্বাভাবিক। চার শতাব্দী ধরে চলে আসছে, এমন একটা প্রাচীন পারিবারিক ঐতিহ্যকে আপনি গাঁজাখুরি গল্প মনে করেছেন জেনে খারাপই

লাগছে। তবে আপনাকে দোষ দিচ্ছি না।'

'আমাকে ভুল বুঝবেন না দয়া করে,' বললাম আমি। 'প্রাচীন প্রথা বা ঐতিহ্যকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি। তাছাড়া এমন অনেক ব্যাপার আছে, অসম্ভব বা অবাস্তব ব্যাপার, যা আমি অকপটে বিশ্বাস করি।'

'ভূত-প্রেতে বিশ্বাস আছে আপনার?'

'ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। শুনবেন?'

'বলুন, তাতে আমার সুবিধে হবে।'

'আমার বাবা মারা যান ১৮০৭ সালে; আমার তখন সাড়ে তিন বছর বয়স। ডাক্তার যখন জানিয়ে দিল রোগীর মৃত্যুর আর বেশি দেরি নেই, তখন আমাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো এক আত্মীয়ার ছোট্ট বাসায়। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে পাশের খাটে শুয়ে পড়লেন মহিলা। কি ঘটছে, কেন আমাকে সরিয়ে দেয়া হলো আত্মীয়ার বাসায়, কিছুই তখন বুঝি না। অনেক রাতে হঠাৎ দরজায় তিনটে জোরাল টোকা পড়তে ঘুম ভেঙে গেল, বিছানা থেকে নেমে চললাম দরজার দিকে।

'আমার আত্মীয়াও জেগে গেছে টোকার শব্দে, আমাকে জিজ্ঞেস করল: কোথায় যাও?

'দেখলাম ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বৃদ্ধার মুখ। কারণ সে জানে, রাস্তার দিকের দরজা তালা মারা আছে, কাজেই এই ভেতরের দরজায় কারও পক্ষে টোকা দেয়া সম্ভব নয়।

'বললাম: দরজা খুলতে যাচ্ছি। আব্বু চলে যাচ্ছে, তাই বিদায় জানাতে এসেছে।

'লাফিয়ে উঠে আমাকে ধরে জোর করে টেনে এনে শুইয়ে দিল মহিলা, আমি কাঁদাকাটি করলাম, অনেক করে বললাম আব্বুকে দেখব, কিন্তু মহিলা আমার কথা শুনল না।

'আর কোনদিন আসেনি ছায়ামূর্তি?'

'নাহ্, আর কোনদিন না। অনেক ডেকেছি, কিন্তু আসেনি আর।'

'যাক, এই পরিবারের আমরা এ-ব্যাপারে আপনার তুলনায় ভাগ্যবান,' মৃদুহেসে বলল লুসিয়েন।

'আপনারা মৃত আত্মীয়ের দেখা পান?'

'যখনই বড়সড় কোনও ঘটনা ঘটে বা ঘটতে যায়।'

'কারণটা কি? আপনাদের প্রতি এই যে বিশেষ আনুকূল্য...'

'কারণ বলতে পারব না। তবে ব্যাপারটা প্রাচীনকাল থেকে ঘটে আসছে, এটুকু বলতে পারি। দুই ছেলে রেখে সাভিলি মারা যান, আপনাকে বলেছি।'

'হ্যাঁ, মনে আছে।'

'এই দু'ভাই পরস্পরকে অন্তর দিয়ে ভালবাসত। শপথ নিয়েছিল একসাথে থাকবে, কোনও কিছুই, এমন কি মৃত্যুও তাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। কী এক গোপন মন্ত্র পাঠ করে তারা নিজ নিজ রক্ত দিয়ে পার্চমেন্ট কাগজে লিখে রেখেছিল, তাদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সে পরবর্তীতে যে-কোনও সঙ্কটের মুহূর্তে অপর জনকে দেখা দেবে। এর তিনমাস পরেই একভাই খুন হয়

অ্যামবুশে। সেই একই মুহূর্তে তার কাছে চিঠি লিখছিল অপর ভাই। চিঠিটা খামে ভরে গালা দিয়ে মুখ আটকে সিগনেট রিঙ দিয়ে যেই সীল দিতে যাবে, পিছনে একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাই কিন্তু কাঁধে কোনও চাপ পড়ছে না। নিজের অজান্তেই খামটা এগিয়ে দিল সে, ভাই সেটা নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। নিজ মৃত্যুর সময় আবার তাকে দেখেছিল সে। বোঝা যায়, দুভাই যে চুক্তি করেছিল সেটা তাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাদের উত্তরপুরুষদের ওপরও বর্তেছে। কারণ, এর পর থেকে যে-কোন বড় ঘটনা ঘটতে নিলেই আসে তারা।'

'আপনি নিজে দেখেছেন এক-আধজনকে?'

'না। তবে, যেহেতু আমার বাবার মৃত্যুর আগে তাঁর বাবা এসে আগাম খবর দিয়েছিলেন আমার বিশ্বাস এ-সুবিধে আমরাও ভোগ করব; কারণ আমরা এমন কোনও অন্যায় করিনি যে এই অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হব।'

'শুধু পরিবারের পুরুষরাই দেখতে পায়?'

'হ্যাঁ।'

'আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!'

'এবং সত্য।'

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে। দৃঢ়, শান্ত কণ্ঠে ও এমন কিছু বলছে যা বিশ্বাস করা কঠিন। হ্যামলেটের সেই বিখ্যাত লাইনগুলো আবৃত্তি করলাম:

'দেয়ার আর মোর থিংস্ ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও,
দ্যান আর ড্রেম্‌ট্ অভ্ ইন ইয়োর ফিলোসফি।'

প্যারিসে বসে এসব শুনলে একে চালবাজ এক ছোকরা হিসেবে ধরে নিতাম; কিন্তু কর্সিকার মাঝখানে ছোট্ট, অখ্যাত এই গ্রামে এসব শুনে কেমন যেন দ্বিধায় পড়ে গেলাম: ছেলেটা কি এসব গাঁজাখুরি গল্প সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে নিজেকে ঠকাচ্ছে, নাকি সত্যিই অসাধারণ কোনও ক্ষমতা রয়েছে এদের মধ্যে?

'তাহলে,' অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল যুবক, 'আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আপনি পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' বললাম। 'আপনি যে বিশ্বাস করে আপনাদের পারিবারিক গোপন কথা আমাকে বলেছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। আমি কথা দিচ্ছি, এসব কথা গোপন থাকবে।'

'কিসের গোপন কথা?' হাসল লুসিয়েন। 'কোনও রাখ-ঢাক নেই, গ্রামের যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করুন, এই একই গল্প শুনবেন। এখানে সবাই সব জানে। তবে হ্যাঁ, প্যারিসে গোপনীয়তার দরকার আছে। ওখানে যদি আমার ভাই এই ক্ষমতার বড়াই করে তাহলে মেয়েরা মূর্ছা যাওয়ার ভান করবে, ছেলেরা হাসবে তাচ্ছিল্যের হাসি।'

একথা বলেই বিদায় নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল লুসিয়েন।

খুবই ক্লান্ত হয়ে আছি, কিন্তু সহজে ঘুম এল না চোখে; যাও বা এল, অস্বস্তিকর, ভাঙা-ভাঙা। সারাদিনে যত লোকের সংস্পর্শে এসেছি সবাইকে স্বপ্নে

দেখলাম, কিন্তু তাদের চালচলন উদ্ভট, অর্থহীন। সকালের দিকে একটানা কিছুক্ষণ গাঢ় ঘুম হলো, তারপর হঠাৎ জেগে গেলাম।

বেল বাজালাম। গরম পানি নিয়ে গ্রিফো এসে ঢুকল।

জানা গেল, ইতোমধ্যে দুই-দুইবার আমার খোঁজ করেছে লুসিয়েন, গ্রিফোকে জানিয়েছে, ঠিক সাড়ে নটায় আসবে এ-ঘরে। ঘড়িতে দেখলাম, নয়টা বেজে পঁচিশ: কাজেই বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না।

ধোপ দুরস্ত ফরাসী পোশাক পরে ফুলবাবু সেজে এল সে। কালো কোট, সাদা প্যান্ট, জমকালো ওয়েইস্টকোটে দারুণ মানিয়েছে ওকে।

'কেমন লাগছে?' জিজ্ঞেস করল সে, 'অসভ্য ভাব কিছুটা ঢাকা পড়েছে?'

'চমৎকার লাগছে। সত্যিই। আজাসিওতে এত ভাল দরজি আছে জানতাম না।'

'খাস প্যারিসের হুমানস্ থেকে এসেছে এগুলো। আমাদের দু'ভাইয়ের একই মাপ। কাজেই নিজের মাপের পুরো এক ওয়ারড্রোব কাপড় পাঠিয়ে দিয়েছে লুই আমাকে। বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে বের করি। এই যেমন আজকের এই মহান শান্তিচুক্তি উপলক্ষে বের করলাম এক সেট।'

আমি তৈরি হতে হতে পৌনে দশটা বেজে গেল।

'চলুন, চলুন,' বলল লুসিয়েন। 'মজা দেখতে হলে আগেভাগেই গিয়ে সীট দখল করা দরকার। নাকি নাস্তা সেরে ধীরেসুস্থে আসবেন?'

'এগারোটার আগে নাস্তা কমই খাই। অতএব দুটোর জন্যেই যথেষ্ট সময় রয়েছে হাতে। চলুন।'

টুপিটা তুলে নিয়ে অনুসরণ করলাম ওকে।

এগারো

দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়েই গ্রামের স্কোয়্যারটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

গতকালের নির্জন স্কোয়্যার আজ লোকে-লোকারণ্য হয়ে গেছে। একটু লক্ষ করতেই বোঝা গেল পুরুষ নেই একজনও– সব মেয়ে বা বারো বছরের কম বয়েসী শিশু।

গির্জার সবচেয়ে নিচের ধাপে কোমরে তিনরঙা বেল্ট পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছেন– ইনিই মেয়র।

সামনের বারান্দায় কালো পোশাক পরা একজনকে দেখা গেল, একটা টেবিল সামনে নিয়ে বসে আছেন, হাতে কয়েক শীট কাগজ। ইনি উকিল, কাগজে লেখা রয়েছে আপোস চুক্তিনামা।

অখলান্দদের মুরব্বির সঙ্গে টেবিলের একপাশে বসলাম আমি। টেবিলের অপরদিকে বসেছে কলোনার মুরব্বিরা। উকিলের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে লুসিয়েন– সে দুই পক্ষেরই লোক। পেছনে, গির্জার পুবদিকে যাজক তৈরি হচ্ছেন

'মাস' বলার জন্যে।

দশটা বাজল ঘড়িতে।

সঙ্গে সঙ্গে জনারণ্যে উত্তেজনার লক্ষণ দেখা গেল। রাস্তার শেষ দু'মাথায় সবার নজর। দেখা গেল পাহাড়ের দিক থেকে অখলান্দ, আর নদীর দিক থেকে কলোনা আসছে– দুজনের পেছনেই রয়েছে দলবল; তবে কথা অনুযায়ী, সঙ্গে অস্ত্র আনেনি কেউ।

দুই দলের প্রধানের শারীরিক গঠনে বৈপরীত্য লক্ষ করার মত। অখলান্দ সুঠাম, দীর্ঘদেহী, কর্মঠ, গায়ের রঙ কিছুটা গাঢ়। আর কলোনা হচ্ছে বেঁটে, মোটা, শক্তপোক্ত, কোঁকড়া চুল-দাড়ি লালচে।

দুজনের হাতে রয়েছে একটা করে জলপাইয়ের শাখা, শান্তির প্রতীক। মেয়র তাঁর কবি মনের ছোঁয়া রেখেছেন এ ব্যাপারে।

কলোনার অপর হাতে দেখা গেল সাদা একটা জ্যান্ত মোরগ, পা ধরে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। দশ বছর আগে যে মোরগ নিয়ে ঝগড়ার উৎপত্তি, সেটির বদলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেবে সে এটা অখলান্দকে।

এই জ্যান্ত মোরগ ফেরত দেয়ার ব্যাপারে কলোনার ঘোর আপত্তির মুখে আপোস-আলোচনা ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল প্রায়– মরা মোরগের পরিবর্তে জ্যান্ত মোরগ দিতে হলে তার মান থাকে না। তার খালা মরা মোরগ ছুঁড়ে মেরেছিল অখলান্দের চাচাত বোনের মুখে, তখনই ঝগড়ার সূত্রপাত; কাজেই সে মরা মোরগ দেবে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য লুসিয়েনের যুক্তির কাছে নতি স্বীকার করে জ্যান্ত মোরগ ফেরত দিতে রাজি হয়েছে সে।

দুজনকে দেখতে পাওয়া মাত্র চং-ঢং করে বেজে উঠল গির্জার ঘণ্টা খুশি-খুশি ছন্দে।

কিন্তু অখলান্দ আর কলোনা যখন পরস্পরকে দেখতে পেল, মুহূর্তে বিকৃত হয়ে গেল ওদের চেহারা, দুজনেরই চোখে-মুখে স্পষ্ট ঘৃণার প্রকাশ; তবে এগোনো বন্ধ করল না কেউই। গির্জার দরজার সামনে এসে থামল দুজন একে অন্যের থেকে গজ চারেক দূরে। ঠিক তিনদিন আগে এই দুজন যদি পরস্পরের একশো গজের মধ্যে আসত, দুজনের একজন এতক্ষণে শুয়ে থাকত মাটিতে।

কয়েক মিনিট কাটল চুপচাপ। কেবল এই দু'দলই নয়, চুপ হয়ে গেছে জনতাও। আপোস রফার উদ্দেশ্যে এলেও, ভেতরে ভেতরে সবাই উত্তেজিত– কারও মধ্যে শান্তির কোন ভাব দেখা যাচ্ছে না।

কথা বলে উঠলেন মেয়র।

'এসো, কলোনা,' ডাকলেন তিনি, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো, তোমাকেই প্রথমে কথা বলতে হবে।'

নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে, যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে, কর্সিকার আঞ্চলিক ভাষায় কয়েকটি বাক্য উচ্চারণ করল সে। যতটুকু বুঝলাম: কোলোনা দুঃখ প্রকাশ করল যে সামান্য কারণে সুপ্রতিবেশী অখলান্দের সঙ্গে ভঁদতে জড়িয়ে পড়া তার উচিত হয়নি। এর পরিসমাপ্তি কামনায় ক্ষতিপূরণ হিসেবে সে হাতের মোরগটা ছেড়ে দিতে চায়।

কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অখলান্দ, তারপর মোরগটা নিয়ে সে-ও আঞ্চলিক ভাষায় উত্তর দিল: আগের কিছুই মনে না রেখে এখন থেকে সে মেয়রের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত, মশিয়ে লুসিয়েনের মধ্যস্থতায় তৈরি, উকিলের লেখা এই পবিত্র আপোসনামার কথাই শুধু মনে রাখবে।

আবার কিছুক্ষণের জন্যে সবাই চুপ।

'আমি যতদূর জানি,' বললেন মেয়র, 'এবার তোমাদের দুজনের হ্যান্ডশেক করার কথা।'

মুহূর্তে দুজনের হাত চলে গেল তাদের পেছনে।

ধাপ থেকে নেমে এলেন মেয়র, পেছন থেকে টেনে সামনে আনলেন কলোনার ডানহাত; একই ভাবে টেনে আনলেন অখলান্দের ডানহাত, তারপর অনেক কষ্টে– কষ্টটা অবশ্য তিনি হাসি দিয়ে ঢাকার চেষ্টা করলেন– দুই হাত এক করলেন।

সুযোগ বুঝে এক লাফে উঠে দাঁড়ালেন উকিল। দুজনের হাত ধরা অবস্থায় জোরে জোরে পড়তে শুরু করলেন:

'সাখতান প্রদেশের সুলাকাখো গ্রামের গির্জার সামনের স্কোয়্যারে আয়োজিত সভায়, নোটারি রয়্যাল গিসেপ-আনতোনিও সাখোলা, মাননীয় মেয়র, উভয় পক্ষের মধ্যস্থতাকারী, জামিনদার এবং সমবেত জনগণের সম্মুখে,

'গাতানো-অখসো অখলান্দ, ওরফে অখলান্দ

'এবং মাখকো-ভাঁসনযি কলোনা, ওরফে শিয়োপন

'পবিত্রতা ও ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়ে অঙ্গীকার করছেন যে:

'আজ, ১৮৪১ সালের ৪ মার্চ থেকে বন্ধ হলো তাঁদের মধ্যেকার দীর্ঘ দশ বছর ধরে স্থায়ী ভঁদত

'এবং আজ থেকে তাঁরা শত্রুতা ভুলে সুপ্রতিবেশীসুলভ ও বন্ধুভাবাপন্ন পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করবেন

'এই মর্মে নিম্নবর্ণিত সাক্ষীগণ, যথা: মেয়র মশিয়ে পোলো আখবখি, মধ্যস্থতাকারী মশিয়ে লুসিয়েন দো ফ্রানশি, উভয়পক্ষের দুইজন জামিনদার ও নোটারির সম্মুখে এই চুক্তিপত্রে সহি সম্পাদন করলেন।

'সুলাকাখো, ৪ মার্চ, ১৮৪১ সাল।'

দেখলাম, বুদ্ধিমান উকিল কলোনাকে বেশি ছোট করা হয়ে যায় বলে মোরগ সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারণ করলেন না। তাতে খুশি হলো কলোনা, গম্ভীর হয়ে উঠল অখলান্দ। হাতের মোরগের দিকে তাকাল সে একবার, বোঝা গেল ওটা কোলোনার মুখে ছুঁড়ে মারার জন্যে হাতটা নিশপিশ করছে ওর: কিন্তু লুসিয়েন দো ফ্রানশি একবার ঘাড় ফিরে তাকাতেই সামলে নিল নিজেকে।

মেয়র বুঝলেন, আর সময় নষ্ট করা যায় না, কখন আবার কী নিয়ে ঝামেলা বেধে যায় ঠিক নেই– দু'হাতে দুজনকে ধরে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওপরে উঠে এলেন। কে আগে সই করবে তা নিয়ে যাতে কোনও বিতর্ক না ওঠে, তাই নিজেই কলম তুলে নিয়ে প্রথম স্বাক্ষর করলেন– যেন প্রথমে সই করাটা মস্ত সম্মানের

ব্যাপার– তারপর কলমটা ধরিয়ে দিলেন অখলান্দের হাতে। অখলান্দ সই করে দিল লুসিয়েনের হাতে, সে স্বাক্ষরের পর দিল কলোনার হাতে।

তারপর বাকি আমরা কজন স্বাক্ষর করলাম।

এবার গির্জায় প্রবেশ করল দুই মহানায়ক। একজনের থেকে বেশ অনেকটা দূরে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে আরেকজনের। খেয়াল করলাম, লুসিয়েনের চেহারা থেকে উৎকণ্ঠা দূর হয়ে একটা খুশি-খুশি ভাব ফিরে এসেছে: দায়িত্ব শেষ, শুধু মানুষ নয়, ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আপোস হয়ে গেছে।

'মাস' শেষ হতে গির্জা থেকে বেরিয়ে এল অখলান্দ ও কলোনা। দরজার কাছে আবার একবার ওদের হাত মিলিয়ে দিলেন মেয়র। তারপর যে-যার বন্ধু-বান্ধব সহ দিনের আলোয় নিজ নিজ বাড়িতে গিয়ে ঢুকল তারা– গত কয়েক বছর রাতেও যেখানে ঢুকতে পারেনি।

আমরাও বাড়ি ফিরে এলাম। আমার প্রতি লুসিয়েনের বিশেষ মনোযোগ ও খাতির-যত্ন দেখে বুঝতে পারলাম, যখন স্বাক্ষর করছিলাম, ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে আমার নামটা পড়েছে ও এবং চিনতে পেরেছে।

ওকে জানালাম, ডিনারের পর-পরই আমি রওনা হয়ে যেতে চাই। মা ও ছেলে আরও কদিন বেড়িয়ে যাবার জন্যে অনেক করে অনুরোধ করলেন। কিন্তু আমার পক্ষে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হলো না, কারণ প্যারিস থেকে ফেরার জন্যে জোরাল তাগিদ এসেছে। আমার লেখা নাটক 'এ ম্যারিজ আন্ডার লুই ফিফটীন' মঞ্চস্থ হতে চলেছে, রিহার্সেলে আমার থাকা একান্তই জরুরী।

লুসিয়েনকে বললাম, 'ইচ্ছে করলে আপনার ভাইয়ের জন্যে একটা চিঠি দিতে পারেন আমার হাতে।'

লুসিয়েন চিঠি লিখে দিল। মাদাম দো ফ্রানশি অনুরোধ করলেন, চিঠিটা যেন আমি নিজ হাতে তাঁর ছেলের কাছে পৌছাই। আনন্দের সঙ্গে রাজি হলাম। মশিয়ে লুই দো ফ্রানশির ফ্ল্যাট আমার বাড়ি থেকে খুব বেশি দূর নয়।

লুসিয়েনের ঘরে সাজানো অস্ত্রগুলো শেষবারের মত দেখতে চাইলাম। ও নিজে আমাকে নিয়ে গেল ওর ঘরে। একহাত ঘুরিয়ে সব জিনিসপত্র দেখিয়ে বলল, 'যেটা খুশি তুলে নিন, ওটা আপনার।'

একটু আঁধার মত জায়গায় হুকে ঝুলানো ছোট্ট একটা ড্যাগার তুলে নিলাম, আশা করলাম এটা নিশ্চয়ই ওর কাছে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে না। গতকাল ও আজ দুদিনই লুসিয়েনকে আমার ট্র্যাভেলিং বেল্টের দিকে কয়েকবার প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাতে দেখেছিলাম, তাই হান্টিং নাইফ সহ ওটা খুলে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। লুসিয়েনের সৌজন্যবোধ তীক্ষ্ণ, আমাকে দিয়ে সাধাসাধি না করিয়ে খুশিমনে নিল উপহারটা।

এই সময় গ্রিফো এসে হাজির হলো দরজায়। জানাল, ঘোড়ায় জিন চাপানো হয়েছে, আমার গাইড অপেক্ষা করছে নিচে। গ্রিফোর জন্যে একটা উপহার আলাদা করে রেখেছিলাম, এটাও হান্টিং নাইফই, তবে ফলার দুপাশে দুটো পিস্তল রয়েছে, পিস্তলের লক ও যন্ত্রপাতি লুকানো রয়েছে বাঁটের ভেতর। উপহার পেয়ে এত খুশি হতে আর কাউকে দেখিনি আমি।

নিচে নামতেই দেখলাম সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে মাদাম দো ফ্রানশি। বিদায় জানাতে এসেছেন আমাকে। সসম্মানে তাঁর হাতের পিঠে চুমু খেয়ে বিদায় নিলাম। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিল লুসিয়েন।

'অন্য কোনও দিন হলে,' বলল সে, 'আমার ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে অন্তত পাহাড়ের মাথা পর্যন্ত এগিয়ে দিতাম আপনাকে; কিন্তু আজ সুলাকাখো থেকে নড়তে পারছি না, পাছে নতুন-পাতানো বন্ধুদের কেউ কিছু করে বসে।'

'ঠিক বলেছেন,' বললাম, 'সতর্ক থাকার সত্যিই দরকার আছে। আপনার এই প্রায়-অসাধ্য মিলন-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কর্সিকার একটি আশ্চর্য ও বিরল ঘটনা চাক্ষুষ করে গেলাম।'

'তা ঠিক, তবে কোনও সন্দেহ নেই, চুক্তি সইয়ের মুহূর্তে আমাদের সমস্ত পূর্বপুরুষ কবরের ভেতর মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল অন্যদিকে।'

'কেন চুক্তি সইয়ের কি দরকার, মুখের কথাই তো যথেষ্ট ছিল– এই জন্যে?'

'না। এই জন্যে যে, তারা হলে কিছুতেই কোনও আপোসে যেত না।' এই বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে আমার দিকে। হ্যান্ডশেক করলাম আমরা।

'আপনার তরফ থেকে আপনার হয়ে আপনার ভাইকে আলিঙ্গন করার অধিকার আমি পেতে পারি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'নিশ্চয়ই, যদি আপনার খুব অসুবিধে না হয়।'

'বেশ, তাহলে আমাদের দুজনকে প্রথমে আলিঙ্গন করতে হবে; কারণ, যা পাইনি তা আমি পৌঁছে দেব কি করে?'

দুজন দুজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

'নিশ্চয়ই আবার কোনদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে?' বললাম আমি। ছেলেটাকে সত্যিই ভাল লেগেছে আমার।

'নিশ্চয়ই। যদি আবার কর্সিকায় আসো।'

'না, আমি বলছিলাম, তুমিও তো কখনও প্যারিসে আসতে পারো?'

'সেটা অসম্ভব। আমি কোনদিন যাব না ওখানে।'

'যাই হোক, তোমার ভাইয়ের টেবিলে আমার কার্ড রেখে এসেছি। ঠিকানাটা মনে রাখবে, কথা দাও।'

'কথা দিচ্ছি, যদি কোনও কারণে মেইনল্যান্ডে যেতে বাধ্য হই, তোমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা করব।'

'তাহলে এই কথাই থাকল।'

আরেকবার হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিলাম। যতক্ষণ আমাকে দেখা গেল, দরজায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল লুসিয়েন।

কোনও শব্দ নেই গ্রামের কোথাও, তবু অনুভব করলাম, প্রতিটি বাড়ি থেকে যেন উত্তেজনার কম্পন বেরিয়ে আসছে। চলতে চলতে প্রতিটি বাড়ির দরজার দিকে তাকালাম, প্রতিমুহূর্তে আশা করছি অখলান্দকে দেখতে পাব। কিন্তু না, সব বাড়ি ছাড়িয়ে এলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওর জামিনদার হিসেবে ভেবেছিলাম ওর কাছ থেকে একটা ধন্যবাদ আমার প্রাপ্য ছিল।

যাকগে, আজকের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের তীব্র উত্তেজনা, এবং আত্মীয়-বন্ধুদের

নানান ধরনের চাপ সামাল দিতে গিয়ে নিশ্চয়ই আমার কথা ভুলে গেছে বেচারা– এই মনে করে ওকে ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু বিশিসানো হীথ-এ পৌঁছেই দেখলাম রাস্তার পাশের ঝোপের আড়াল থেকে লম্বা এক লোক এসে দাঁড়াল রাস্তার মাঝখানে। মুহূর্তে চিনতে পারলাম অখলান্দকে, যাকে একটু আগেও অকৃতজ্ঞ বলে মনে হচ্ছিল।

লক্ষ করলাম, এরই মধ্যে কাপড় পাল্টে ভিসেনতেইলোর ধ্বংসস্তূপে গত রাতে যে-পোশাকে দেখেছিলাম সেইসব পরেছে দস্যু; কার্ট্রিজ বেল্টের সঙ্গে ঝুলছে পিস্তল, হাতে রাইফেল। আমি বিশ গজের মধ্যে পৌঁছতেই টুপি খুলে হাতে নিল সে, আমিও ওকে অপেক্ষায় না রেখে স্পার খুঁচিয়ে ঘোড়ার গতি বাড়ালাম।

'মশিয়ে,' বলল সে, 'আমার ধন্যবাদ না নিয়েই আপনি সুলাকাখো ছেড়ে যাবেন তা হতেই পারে না। আমার মত একজন অতি সাধারণ কৃষকের জামিনদার হয়ে আপনি আমাকে যে কতবড় সম্মান দিয়েছেন, ওই অনুষ্ঠানের উত্তেজনায় সেটা প্রকাশ করবার ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম– সেজন্যে এখানে এসে বসে আছি আপনার অপেক্ষায়।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে,' বললাম আমি, 'এর জন্যে আপনার নিজেকে এত কষ্ট দেয়ার কোনও দরকার ছিল না; সুযোগটা পেয়ে আমিই সম্মানিত বোধ করেছি।'

'কষ্ট? বলেন কি, মশিয়ে?' আকাশ থেকে পড়ল অখলান্দ। ওখান থেকে পালিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এতগুলো বছর খোলা জায়গায় কাটিয়ে, পাহাড়ী বাতাসে শ্বাস টেনে এখন অন্য যে-কোনও জায়গায় দম বন্ধ হয়ে আসে। গ্রামের ওই বাড়িতে ঢুকে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ছাদটা ধসে পড়ল মাথায়।'

'কিন্তু এখন তো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে হবে আপনাকে। শুনেছি বাড়িঘর, জমিজমা আর চমৎকার আঙুর খেত আছে আপনার।'

'কথা সত্যি, তবে আমার বোনই দেখেশুনে রাখে বাড়িটা, আঙুর খেত দেখাশোনার জন্যেও লোক আছে। আমরা কর্সিকানরা তো কাজ করি না।'

'কি করেন তাহলে?'

'একটু আধটু কাজের দেখাশোনা করি, বাকি সময় রাইফেল নিয়ে ঘুরে বেড়াই, শিকার করি সুযোগ পেলে।'

'বেশ, মশিয়ে অখলান্দ,' হাত বাড়িয়ে দিলাম, 'গুড বাই, অ্যান্ড গুড লাক! যত খুশি পাহাড়ী মেষ, হরিণ, বুনো শুয়োর, ফেয়্যান্ট আর পার্ট্রিজ মারুন; শুধু দয়া করে খেয়াল রাখবেন, মাখকো-ভাঁসনযি কলোনা বা তার পরিবারের কারও দিকে একটা গুলি ছুঁড়লে আপনার-আমার দুজনেরই সম্মান ধুলোয় লুটাবে।'

চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল অখলান্দের। দুষ্টামি হাসি দিয়ে বলল, 'আপনি জানেন, চামড়াসর্বস্ব একটা মোরগ ফেরত দিয়েছে ব্যাটা আমাকে?' কথাটা বলেই একলাফে ঝোপঝাড়ের আড়ালে চলে গেল সে, এবং মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল

চলতে শুরু করে ভাবলাম, কে জানে, হয়তো এই কারণেই আবার একটা

লড়াই বেধে যাবে অখলান্দ আর কলোনাদের মধ্যে। এছাড়া আর কাজ কোথায় ওদের?

সেই রাতটা ঘুমালাম আলবিত্রিসিয়ায়। পরদিন পৌঁছলাম আজাসিওতে।

আটদিন পর আমি প্যারিসে।

বারো

প্যারিসে পৌঁছে সেইদিনই মশিয়ে লুই দো ফ্রানশির সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু বাড়িতে পেলাম না।

আমার কার্ড আর সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুটে দু'চার কথা লিখে রেখে এলাম। লিখেছি: সরাসরি সুলাকাখো থেকে এসেছি আমি, তার ভাই মশিয়ে লুসিয়েনের লেখা একটা চিঠি আছে আমার কাছে চিঠিটা হাতে-হাতে পৌঁছে দেব বলে কথা দিয়েছি তার মাকে। কখন এলে তাকে বাসায় পাওয়া যাবে যেন দয়া করে আমাকে জানায়।

পরদিন বেলা এগারোটার দিকে আমি যখন পোশাক পরছি, চাকর এসে খবর দিল মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি দেখা করতে চান। ভদ্রলোককে ড্রইংরুমে বসিয়ে খবরের কাগজগুলো দিতে বললাম, আমি আসছি পাঁচমিনিটে।

মিনিট পাঁচেক পর ড্রইংরুমে ঢুকে দেখি 'দ্য প্রেস' পত্রিকায় আমার লেখা সিরিয়ালটা পড়ছে মশিয়ে লুই, সম্ভবত ভদ্রতার খাতিরেই। পায়ের আওয়াজ পেয়ে মাথা উঁচু করল। দুই ভাইয়ের চেহারার মিল দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম।

উঠে দাঁড়াল লুই, বলল, 'মশিয়ে, আপনার চিরকুট পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি। আমার এতবড় সৌভাগ্য বিশ্বাসই হতে চাইছিল না। আপনার ছবির সঙ্গে মেলে কি না দেখার জন্যে চাকরটার কাছে কম করেও বিশবার আপনার চেহারার বর্ণনা শুনেছি। আজ সকালে আগ্রহ আর দমন করতে না পেরে চলে এলাম আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে, এবং বাড়ির খবর জানতে। হয়তো একটু বেশি সকাল সকাল চলে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম।'

'মোটেও না, আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন, এবং আমার সম্পর্কে আপনার জানা আছে একথা জানতে পেরে সত্যিই গৌরবান্বিত বোধ করছি। কিন্তু বলুন তো, আমি কি সত্যিই মশিয়ে লুইয়ের সঙ্গে কথা বলছি, না কি আপনি আসলে লুসিয়েন দো ফ্রানশি?'

হাসল যুবক। 'হ্যাঁ, চেহারায় আশ্চর্য মিল আছে আমাদের। সুলাকাখোতে থাকতে আমরা দুজন ছাড়া আর কারও পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না আমরা কে কোন্‌জন। তবে পোশাকে নিশ্চয়ই দুজনকে আলাদা ভাবে চেনা যায়? আমি চলে আসার পর নিশ্চয়ই ওর খাঁটি কর্সিকান আচার-আচরণ বদলে যায়নি?'

'না, তা যায়নি,' বললাম। 'তবে চলে আসার দিন তাঁকে ঠিক আপনার এই পোশাক পরা অবস্থায় দেখেছি বলে কেমন যেন ধাঁধা লেগে গেছিল। যাক'

লুসিয়েনের চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিলাম, 'বাড়ির খবর জানার জন্যে নিশ্চয়ই আপনি উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন। গতকাল চিঠিটা রেখে আসতে পারতাম, যদি না মাদাম দো ফ্রানশিকে কথা দিতাম যে এটা নিজ হাতে আপনার কাছে পৌঁছব।'

'সবাইকে ভাল দেখে এসেছেন তো?' চিঠিটা হাতে নিয়ে জানতে চাইল মশিয়ে লুই।

'হ্যাঁ, তবে কিছুটা উদ্বিগ্ন।'

'আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ। চিঠিটা পড়ুন।'

পড়তে শুরু করল সে।

চিঠিতে দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে লুই, মাঝে মাঝেই হাসি হাসি হচ্ছে মুখ, বিড়বিড় করে দু'একটা শব্দ উচ্চারণ করছে।

চিঠি শেষ হতেই বললাম, 'বাড়ির সবাই আপনার জন্যে চিন্তিত ছিলেন। আসলে ভয়ের কোনও কারণ ছিল না দেখে আমি আনন্দিত।'

'ঠিক তা নয়,' আমতা-আমতা করে বলল লুই, 'অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, এটা সত্যি; তবে তার আসল কারণ আশাভঙ্গ, মোহভঙ্গও বলতে পারেন– কিংবা বলতে পারেন গভীর মনোকষ্ট। এটা আরও বেড়েছিল এই ভেবে যে বেচারা লুসিয়েন আমার সঙ্গে সঙ্গে কষ্ট পাচ্ছে ওখানে।'

'হ্যাঁ, উনি আমাকে বলেছেন। তখন কথাটা আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি, এখন আপনার কথায় প্রমাণ হয়ে গেল যে মশিয়ে লুসিয়েনের সেই কষ্ট কাল্পনিক কিছু ছিল না। আপনার তো কোনও সন্দেহ নেই যে আপনার মানসিক যাতনার ফলেই কষ্ট পাচ্ছিলেন আপনার ভাই?'

'কোনও সন্দেহ নেই তাতে।'

'এবার সত্যিই প্রবল আগ্রহ বোধ করছি ব্যাপারটায়। আপনার সেই মর্ম-বেদনা কি দূর হয়েছে?'

'খোদা! কি করে যাবে?' মৃদু কণ্ঠে বলল লুই। 'আপনি তো জানেন, মানুষের হৃদয় জখম হলে সারতে সময় লাগে। আচ্ছা, এবার আমাকে উঠতে হবে। আপনি যদি অনুমতি দেন, মাঝে মাঝে এসে সুলাকাখো সম্পর্কে গল্প করব আপনার সঙ্গে।'

'আনন্দের সঙ্গে,' জবাব দিলাম। 'কিন্তু এখনই নয় কেন? এতক্ষণে লাঞ্চ রেডি হয়ে গেছে। চারটে খেয়ে নিয়ে সুলাকাখোর গল্প করতে পারি আমরা।'

'আমি দুঃখিত, সেটা সম্ভব হচ্ছে না আজ। গতকাল চ্যান্সেলরের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি, আজ ঠিক বারোটায় বিচার মন্ত্রণালয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। সময় হয়ে এসেছে, একজন হবু-উকিলের কি উচিত হবে তাঁর মত অত বড় একজন মানুষকে অপেক্ষায় রাখা?'

'এই ডাকটা কি অখলান্দ আর কলোনার ব্যাপারে কথা বলার জন্যে?'

'খুব সম্ভব। আমার ভাই লিখেছে, ঝগড়াটা মিটমাট...'

'নোটারির সামনে,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম। 'চুক্তিপত্রে আমিও সই করেছি অখলান্দের জামিনদার হিসেবে।'

'হ্যাঁ। আমার ভাই লিখেছে সেকথা,' ঘড়ি বের করে দেখল সে, 'বেশি সময় নেই হাতে। যাই, চ্যান্সেলরকে বলি গে যাই, আমার ভাই আমার অনুরোধ রেখেছে।'

'অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, এটুকু বলতে পারি।'

'আমি জানতাম। নিজ মতের বিরুদ্ধে হলেও ও যেভাবে পারে কাজটা করবে।'

'হ্যাঁ। ওকে ধন্যবাদ দিতেই হবে। আমি জানি, খুবই কষ্ট হয়েছে ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আপোস নিষ্পত্তির মধ্যস্থতা করতে।'

'এ নিয়ে পরে একসময় আলাপ করব আমরা; আপনার মাধ্যমে আমার দেশ, আমার মা, আমার ভাইয়ের ছোঁয়া পাচ্ছি আমি, মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি ওদেরকে– কী যে ভাল লাগছে! কবে, কোন সময়ে...'

'সেটা এখুনি বলা কঠিন। মাত্র দেশে ফিরেছি, এখন প্রথম কয়েকটা দিন কিছুটা অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটবে। আপনিই বরং বলুন কবে কোথায় আপনাকে পাওয়া যাবে।'

'আচ্ছা, মি-কাখিম উৎসব আগামী কাল, তাই না?'

'কাল?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে?'

'অপেরার "বল"-এ আপনি যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ এবং না। হ্যাঁ, যদি আপনি ওখানে আমাকে দেখা করতে বলেন; আর না, যদি যাওয়ার বিশেষ কোনও কারণ না সৃষ্টি হয়।'

'কিন্তু আমাকে যেতেই হবে। কথা দিয়েছি...'

'বাহ্!' হাসিমুখে প্রশংসা করলাম, 'সময়ে গভীর ক্ষতও সেরে যায় বলেছিলেন, লক্ষণটা টের পাওয়া যাচ্ছে।'

হাসল না লুই। 'ব্যাপারটা যা ভাবছেন তা নয়। বোধহয় নতুন কোনও ঝামেলায় জড়াতে যাচ্ছি।'

'তাহলে না গেলেই হয়।'

'নিজ ইচ্ছেমত যদি চলা যেত দুনিয়ায়! স্রোতের টানে যেন ভেসে চলেছি, ভাগ্য যেদিকে নেয়। ভাল করেই জানি, না গেলেই ভাল হয়। কিন্তু যাব।'

'বেশ। তাহলে কাল, অপেরায়?'

'হ্যাঁ।'

'কখন?'

'এই ধরুন, রাত সাড়ে বারোটায়?'

'কোনখানে?'

'ফয়ায়। ঠিক একটার সময় ঘড়ির নিচে দেখা করতে হবে আমার একজনের সঙ্গে।'

'ঠিক আছে, যাব তাহলে।'

হ্যান্ডশেক করেই তাড়াহুড়োর ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে চায় লুই। হাতে আর

সময় নেই। তবু এরই মধ্যে ওকে থামিয়ে লুসিয়েনের আলিঙ্গন উপহার দিলাম। খুশিমনে চলে গেল সে হাসতে হাসতে।

খুব ব্যস্ততায় কাটল আমার দিনটা, পরদিনও সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত টুকিটাকি অসংখ্য কাজ সারতে হলো– বহুদিন বাইরে থাকায় জমে গেছে অনেক কাজ। রাত ঠিক সাড়ে বারোটায় গিয়ে পৌঁছলাম অপেরায়। একটু দেরি করে এল লুই, বলল, চিনতে পেরেছে মনে করে এক মুখোশধারিণীর পিছুপিছু ঘুরেছে এতক্ষণ, কিন্তু মহিলা হারিয়ে গেছে লোকের ভিড়ে।

দু'একবার কথা শুরু করতে গিয়ে বুঝলাম কথাবার্তার মূডে নেই সে এখন, চোখজোড়া বার বার চলে যাচ্ছে ঘড়ির দিকে। হঠাৎ 'ওই যে আমার ভায়োলেট বাকেট' বলেই ছুট দিল একদিকে।

ঠেলাঠেলি করে ও যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে দেখলাম এক মুখোশপরা মহিলাকে। মস্ত এক ভায়োলেটের তোড়া হাতে তার।

নানান রকম ফুলের তোড়ার অভাব নেই ফয়ায়। ক্যামেলিয়ার তোড়া হাতে এক মহিলা জানাল প্যারিসে ফিরে আসা উপলক্ষে আমাকে অভিনন্দন জানাতে চায়। নাচলাম তার সঙ্গে। ক্যামেলিয়ার পর এল বুনো গোলাপ, তারপর হেলিওট্রোপের তোড়া। যেইমাত্র আমি পঞ্চম তোড়ার সঙ্গে নাচ শেষ করেছি, ঠিক তখনই দেখা হলো ডি– র সঙ্গে।

'আরে! ভালই হলো, দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে,' বলল সে, 'ঠিক সময় মত। তিনটের সময় সাপারে চলে এসো আমার বাসায়,' কারা কারা আসছে বলল সে, সবাইকেই চিনি, বন্ধু স্থানীয়। 'তোমার আশায় থাকব আমরা।'

'অনেক ধন্যবাদ,' বললাম আমি, 'তোমার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারলে খুশি হতাম। কিন্তু দুঃখিত, পারছি না, আরেকজন আছে সঙ্গে।'

'এটা কোনও কথাই হলো না। আমাদের প্রত্যেকে একটা করে তোড়া নিয়ে আসবে, ছয়টা পানির জগ রাখা হচ্ছে টেবিলে যাতে ফুলগুলো তাজা থাকে।'

'দোস্ত, ভুল বুঝছ। তোমার জগে রাখার মত কোনও ফুলের তোড়া নেই আমার। পুরুষ বন্ধু।'

'তাতেই বা অসুবিধে কিসের? তোমার বন্ধু হলে সে নিশ্চয়ই আমাদেরও বন্ধু?'

'না। অল্পবয়সী এক যুবক, তোমরা একে চেনো না।'

'বাহ! চিনিয়ে দিলেই চিনে নেব।'

'ঠিক আছে, তোমার আমন্ত্রণের কথা আমি বলব তাকে।'

'হ্যাঁ। যদি আইগুই করে, জোর করে ধরে আনবে।'

'ঠিক আছে, আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করব। ঠিক কখন শুরু করছ?'

'তিনটের সময়। তবে সাপার চলবে ভোর ছ'টা পর্যন্ত, যথেষ্ট সময় আছে, এর মধ্যে যখনই পারো চলে এসো।'

'বেশ।'

কথা শেষ হতেই অপেক্ষারতা এক মায়োসোটিসের তোড়া ডি– র বাহুলগ্না হয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

মিনিট কয়েক পর লুইকে দেখলাম ভায়োলেট তোড়াকে ছেড়ে হন-হন করে এদিকে আসছে। আমার সঙ্গের মহিলাকে এক বন্ধুর হাতে গছিয়ে দিয়ে লুইয়ের হাত ধরলাম। 'যে জন্যে এখানে এসেছেন, সে-কাজ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে। খোদা! বল-মাস্কে মানুষ এমন সব কথা বলে!'

'কিছু মনে করবেন না,' বললাম আমি, 'আপনার ভাইকে চিনি বলে আপনাকেও আমার মনে হচ্ছে যেন কতদিনের চেনা··· আপনাকে বড় বিপর্যস্ত মনে হচ্ছে, ব্যাপার কি খুলে বলবেন আমাকে?'

চুপ করে রইল লুই। আমিও চাপাচাপি করলাম না। গোপন কথা গোপনই রাখতে চায় ও।

ঘরময় কয়েক পাক ঘুরলাম আমরা। আমি কাউকে আশা করছি না, তাই নির্বিকার; কিন্তু কোনও মহিলা কাছাকাছি এলেই খুঁটিয়ে দেখছে লুই, মুখোশ পরা ডোমিনোকে চেনার চেষ্টা করছে।

'এদিকে তাকান,' বললাম, 'এখন আপনার কি করা উচিত জানেন?'

চমকে উঠল ও, যেন হঠাৎ ঘুম ভেঙেছে।

'আমি?···কই না!···কি বললেন যেন?'

'বললাম, একটু অন্য ধরনের কিছু করা উচিত এখন আপনার।'

'যেমন?'

'চলুন আমার এক বন্ধুর ওখানে সাপার খেতে যাই।'

'না, না; বিমর্ষ, দুঃখ-জর্জরিত এক অতিথি হয়ে সবার বিরক্তি···'

'কী যে বলেন, ওরা এমন মজার মজার কথা বলবে যে, দেখবেন আপনার মনটা ভাল হয়ে গেছে।'

'তাছাড়া, আমি আমন্ত্রিত নই।'

'ভুল বললেন; আপনি আমন্ত্রিত।'

'তাই নাকি? আপনার বন্ধুকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু সত্যি বলতে কি···মনটা টানছে না···'

ঠিক এই সময়ে আমাদের পাশ কাটাল ডি– । এখনও মায়োসোটিস তোড়ার খপ্পরেই আছে। হঠাৎ আমার ওপর চোখ পড়ল ওর।

'তাহলে, সেই কথাই থাকল, কি বলো?' বলল সে, 'ঠিক তিনটায়। তোমার বন্ধুকে নিয়ে আসছ।'

'দুঃখিত, দোস্ত; আমি আসতে পারছি না।'

'তাহলে মরো গে যাও!'

হাসতে হাসতে চলে গেল সে।

'লোকটা কে?' কথার কথা হিসেবে জানতে চাইল লুই।

'ওর নাম ডি– , অনেক দিনের বন্ধু; প্রাণোচ্ছল মানুষ। প্যারিসের একটা নামকরা দৈনিক পত্রিকার ম্যানেজার।'

'বলেন কি! মশিয়ে ডি→ !' যেন আঁৎকে উঠল লুই, 'মশিয়ে ডি– ! তাঁকে চেনেন আপনি?'

'খুব ভাল করেই চিনি। কেন?'

'ওঁর বাড়িতেই দাওয়াত আপনার?'
'ঠিক ধরেছেন।'
'ওঁর ওখানেই আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিলেন?'
'হ্যাঁ।'
'তাহলে রাজি আমি। নিশ্চয়ই যাব আপনার সঙ্গে।'
'বেশ। তবে আমাকে খুশি করার জন্যে রাজি হচ্ছেন না তো?'
'না,' মাথা নাড়ল লুই। বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওকে। 'না গেলেই বোধহয় ভাল করতাম। কিন্তু নিয়তির টান এড়াব কি করে? নিজের ইচ্ছেয় কি চলছি আমরা? আসলে তো সবাই আমরা বিধাতার হাতের পুতুল। পরিষ্কার বুঝতে পারছি এখন, আজ এখানে না এলেই বুদ্ধিমানের কাজ করতাম।'
ঠিক এই সময় আবার দেখা হলো ডি– র সঙ্গে।
'শোনো, দোস্ত,' বললাম, 'মত পাল্টেছি আমি।'
'আসছ তাহলে আজ?'
'হ্যাঁ।'
'বাহ্! চমৎকার! তবে একটা ব্যাপারে তোমাকে হুঁশিয়ার করা দরকার।'
'কি সেটা?'
'আজ আমাদের সঙ্গে যারা সাপার খাবে, আগামী পরশুও তাদেরকে সাপার খেতে হবে আমাদের সঙ্গে।'
'কেন?'
'কারণ শাতো-রোনোর সঙ্গে বাজি ধরেছি।'
অনুভব করলাম, আমার বাহুতে চেপে বসল লুই-র আঙুলগুলো। পাশ ফিরে তাকালাম। মুখটা একটু ফ্যাকাসে লাগছে, এছাড়া আর কোনও ভাবের প্রকাশ নেই।
'কি নিয়ে বাজি?' জিজ্ঞেস করলাম ডি– কে।
'লম্বা কাহিনী, এখানে বলা যাবে না। তাছাড়া যাকে নিয়ে এই বাজি, সেই মহিলা শুনে ফেললে হারবে শাতো-রোনো।'
'ঠিক হ্যায়, তাহলে তিনটেয়।'
হাঁটছি। ঘড়িতে দেখলাম, রাত দুটো পঁয়ত্রিশ বাজে।
'এই মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে চেনেন নাকি?' প্রশ্ন করল লুই, প্রাণপণ চেষ্টা করছে ভাবাবেগ চেপে রাখতে।
'চেহারাটা চিনি, এক-আধবার দেখেছি পার্টিতে।'
'তাহলে আপনার বন্ধু নয় লোকটা?'
'না। পরিচিতও নয়।'
'তাহলে বাঁচা গেল!' যেন হাঁপ ছাড়ল লুই।
'কেন?'
'না, এমনি বললাম কথাটা।'
'আপনি চেনেন বুঝি ওকে?'
'ওই, একরকম।'

এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল মশিয়ে দো ফ্রানশি আর মশিয়ে দো শাতো-রোনোর মধ্যে একজন মহিলাকে নিয়ে সম্পর্কের অবনতি ঘটেছে। আমার মন বলছে, এখন সবচেয়ে ভাল হয় যদি আমরা যে-যার বাসায় ফিরে যাই।

'মশিয়ে দো ফ্রানশি,' বললাম, 'আমার একটা কথা শুনবেন?'

'বলুন, কি কথা?'

'ডি- র বাড়িতে সাপারে আজ আর যাওয়ার দরকার নেই।'

'কি কারণে? উনি আশা করবেন আমাদের। তাছাড়া আপনিও তো কথা দিয়েছেন একজন বন্ধুকে নিয়ে যাবেন।'

'হ্যাঁ, কথা দিয়েছি।'

'তাহলে?'

'আমার মন বলছে, অমঙ্গল হতে পারে, ওখানে যাওয়া আজ আমাদের ঠিক হবে না।'

'কিন্তু নিশ্চয়ই মন পরিবর্তন করার পেছনে কোনও যুক্তি আপনার আছে? এই একটু আগেই তো আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রায় জোর করে নিয়ে যেতে চাইছিলেন ওখানে।'

'ওখানে গেলে মশিয়ে শাতো-রোনোর সঙ্গে দেখা হবে।'

'তাতে কি? শুনেছি চমৎকার মানুষ তিনি, আর একটু ভাল ভাবে জানতে পারব তাঁকে।'

'বেশ, তাহলে তাই হোক,' বললাম। 'মনে রাখবেন, শুধু আপনি যেতে চাইছেন বলেই আমি যাব।'

নিচে নেমে কোট পরে নিলাম। অপেরার কাছাকাছিই থাকে ডি- । রাতটা চমৎকার, মুক্ত বাতাসে লুইয়ের উপকার হবে মনে করে বললাম, হেঁটেই যাই। রাজি হলো ও।

তেরো

ড্রইংরুম আলো করে বসে আছে ওরা, সবাই আমার পরিচিত, বন্ধুবান্ধব। দো বি- , এল- , ভি- , এ- । সবাই ওরা যার যার ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। ওদের সঙ্গে দু'তিনজন মুখোশখোলা ডোমিনোও রয়েছে, হাতের তোড়াগুলো রাখছে পানি ভরা জগে।

সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম লুই দো ফ্রানশিকে। বলা বাহুল্য, আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানাল ওরা ওকে।

দশ মিনিট পর মায়োসোটিস ব্যাকেটকে নিয়ে ঢুকল ডি- । সুন্দরী মহিলা, মুখোশ খোলার সহজ ভঙ্গি দেখে বোঝা গেল, এ-ধরনের পার্টিতে যোগদানে অভ্যস্ত

ডি– র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম মশিয়ে দো ফ্রানশির।

'এইবার,' চেঁচিয়ে বলল দো বি– , 'সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছে যখন, আমার মনে হয়, খাওয়া-দাওয়া শুরু করা যেতে পারে।'

পরিচয় পর্ব শেষ হয়েছে বটে,' বলল ডি– , 'কিন্তু সবাই এসে পৌঁছেনি এখনও।'

'বাকি থাকল কে আবার?'

'শাতো-রোনো।'

'ও-হ্যাঁ, কি একটা বাজির ব্যাপার আছে শুনলাম?' জিজ্ঞেস করল ভি– ।

'হ্যাঁ। আমাদের বারোজনকে সাপার খাওয়াবে সে, যদি এক বিশেষ মহিলাকে সঙ্গে করে আনতে না পারে।'

'সেই বিশেষ মহিলাটি কে,' জানতে চাইল মায়োসোটিস তোড়া, 'যার জন্যে একেবারে বাজি ধরাধরি?'

দো ফ্রানশির দিকে চেয়ে দেখলাম, বাইরে থেকে যদিও শান্ত দেখাচ্ছে, মরার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর চেহারা।

'আমার ধারণা,' বলল ডি– , 'নামটা বলা যেতে পারে, বিশেষ করে কেউ তোমরা আগে এ-নাম শোনোনি যখন। ইনি হচ্ছেন মাদাম…'

ডি– র বাহুতে একটা হাত রাখল লুই। 'মশিয়ে,' আবেদন ফুটে উঠল ওর কণ্ঠে, 'আমাদের নতুন পরিচয়ের সম্মানে আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

'বলুন, মশিয়ে?'

'মশিয়ে শাতো-রোনোর সঙ্গে যাঁর আসার কথা, দয়া করে সে মহিলার নামটা উচ্চারণ করবেন না। আপনি জানেন, উনি বিবাহিতা।'

'তা ঠিক, কিন্তু তার স্বামী তো স্মার্না, ভারত, মেক্সিকো না আর কোথায় জানি রয়েছে। কোনও মহিলার স্বামী যদি এত দূরে থাকে, ধরে নিতে হয় যে স্বামী নেই।'

'তাঁর স্বামী অল্প কয়েকদিনেই ফিরছেন, আমি চিনি তাঁকে; সৎ ও সাহসী যোদ্ধা একজন। স্ত্রীর নির্বুদ্ধিতায় ফিরে এসে তিনি যে প্রচণ্ড আঘাত পাবেন, অপমানিত বোধ করবেন, তা থেকে তাঁকে রেহাই দেয়া হয়তো সম্ভব, যদি নামটা উচ্চারণ না করেন।'

'তাহলে, মশিয়ে, আমাকে ক্ষমা করুন,' বলল ডি– । 'আমি বোধহয় ভুলই করতে যাচ্ছিলাম। আমি জানতাম না আপনি মহিলাকে চেনেন, বিবাহিতা কি না সে ব্যাপারেও পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না। যাই হোক, আপনি যখন তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে চেনেন…'

'হ্যাঁ, দুজনকেই চিনি

'সেক্ষেত্রে সত্যিই সংযত হতে হবে আমাদের। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, শাতো-রোনো আসুক বা না আসুক, একা আসুক বা সঙ্গে কেউ থাকুক, বাজিতে জিতুক বা হারুক, আপনাদের অনুরোধ করছি, বাইরের কারও কানে যেন একটি কথাও না যায়।'

সবাই শপথ করল গোপনীয়তা রক্ষা করবে; সম্ভবত নারীর সম্মান রক্ষার্থে

নয়, পেটের জ্বালায়; কারণ খিদেয় পেট জ্বলছে সবার, খাবার টেবিলে গিয়ে বসার জন্যে উসখুস করছে।

'আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মশিয়ে,' দো ফ্রানশি বলল ডি– কে, হ্যান্ডশেক করল তার সঙ্গে, 'আপনি সত্যিকার একজন নিখুঁত ভদ্রলোকের কাজ করলেন।'

সবাই ডাইনিং রুমে গিয়ে বসলাম। দুটো সীট খালি থাকল শাতো-রোনো আর তার সঙ্গে যে মহিলা আসবার কথা, তার জন্যে। চেয়ার দুটো সরিয়ে ফেলতে যাচ্ছিল একজন ভৃত্য, বারণ করল গৃহস্বামী, 'না। ওগুলো থাক। চারটে পর্যন্ত সময় দেয়া আছে শাতো-রোনোকে। চারটে বাজলে হেরে যাবে ও বাজিতে, তখন সরিয়ে নিয়ো।'

দেখলাম বারবার ঘড়ির দিকে চাইছে মশিয়ে দো ফ্রানশি। ঘড়িতে এখন চারটা বাজতে বিশ।

'আপনার ঘড়ির সময় ঠিক আছে তো?' নরম গলায় জানতে চাইল লুই।

'ওর ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে সেট করেছি এই দেয়াল ঘড়ির সময়, যাতে পরে গলাবাজি না করতে পারে!' হাসল ডি– । 'ওর ঘড়িতেও এখন এই একই সময় বাজছে।'

'আহা,' বলল মায়োসোটিস তোড়া, 'শাতো-রোনো আর তার অজানা সেই রহস্যময়ী মহিলা সম্পর্কে যখন আমাদের চুপ করেই থাকতে হবে, তখন এসব আলাপ বাদ দিয়ে আমাদের প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা উচিত।'

'ঠিক বলেছ ই–,' বলল ভি– , 'আরও কত মহিলা আছে এই দুনিয়ায়। তাদের নিয়ে মেতে ওঠা যাক।'

'তাদের সবার স্বাস্থ্যপান দিয়ে শুরু করা যেতে পারে,' বলল ডি– ।

যে-যার পাশে রাখা ঠাণ্ডা শ্যাম্পেনের বোতল থেকে গ্লাস ভর্তি করায় মন দিল।

আমি লক্ষ করলাম, ঢালল বটে, কিন্তু ঠোঁটে শ্যাম্পেন ছোঁয়াচ্ছে না লুই।

'পান করুন,' বললাম আমি তাকে, 'দেখতেই পাচ্ছেন, ও আজ আসবে না।'

'এখনও পনেরো মিনিট সময় আছে,' বলল লুই। 'চারটে বেজে গেলে দেখবেন কারও চেয়ে পিছিয়ে পড়ে নেই আমি।'

'বেশ তো।'

নিচু গলায় এসব কথা চলছে আমাদের মধ্যে। লক্ষ করলাম সবারই গলা চড়ছে একটু একটু করে। লুই আর ডি– বারবার তাকাচ্ছে ঘড়ির দিকে। চারটে বাজতে যখন পাঁচ মিনিট বাকি, তখন অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইলাম আমি লুইয়ের দিকে।

'আপনার স্বাস্থ্য!' বললাম আমি।

মৃদু হেসে নিজের গ্লাস ঠোঁটে তুলল সে।

গ্লাসটা অর্ধেক শেষ হয়েছে, এমনি সময় জোরে বেজে উঠল ঘণ্টা। মুহূর্তে সমস্ত রক্ত সরে গেল ওর মুখ থেকে। ফিসফিস করে বলল, 'এই এলো!'

'হয়তো। তবে হয়তো ভদ্রমহিলাটি তার সঙ্গে নেই,' বললাম।

'আসুক, দেখা যাবে।'

সবাই চুপ হয়ে গেছে। দরজার কাছে তর্ক-বিতর্কের শব্দ পাওয়া গেল। উঠে গিয়ে ডাইনিং রুমের দরজা খুলে দিল ডি– ।

'লোকটার গলার আওয়াজ চিনতে পারছি আমি!' কথাটা বলে আমার কব্জি চেপে ধরল লুই শক্ত করে।

'শান্ত হন, অস্থির হবেন না,' বললাম আমি। 'মহিলা যদি অপরিচিত কারও বাসায় অপরিচিত লোকেদের সঙ্গে সাপার খেতে আসেন, বুঝতে হবে তিনি বাজে মেয়েছেলে, আর এরকম রাস্তার মেয়েছেলে কোনও সৎ লোকের প্রিয়-পাত্রী হতে পারে না। আমার ধারণা, ওঁকে ফুসলে আনার চেষ্টা হচ্ছে।'

'আসুন, মাদাম, ভেতরে চলে আসুন,' বলছে ডি– , 'দয়া করে ভেতরে আসুন, এখানে আমরা কজন বন্ধু আছি শুধু, আপনার খারাপ লাগবে না।'

'চলে এসো, এমিলি,' বলল মশিয়ে দো শাতো-রোনো। 'নাহয় মুখোশ তুমি খুলো না।'

'বদমাইশ! বদমাইশ কোথাকার!' বিড়বিড় করে বলল লুই দো ফ্রানশি।

এমনি সময় প্রায় টেনে-হিঁচড়ে এক মহিলাকে ঘরের ভেতর নিয়ে এল শাতো-রোনো, পাশে থেকে অবিরাম সাধাসাধি করছে ডি– ।

'চারটে বাজতে এখনও তিন মিনিট বাকি,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে ডি– র দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে ঘোষণা করল শাতো-রোনো।

'ঠিক, দোস্ত, তুমিই জিতলে।'

'এখনও জেতেনি, মশিয়ে,' বলল অচেনা মহিলা। সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে শাতো-রোনোর চোখে চোখ রাখল। 'এখন বুঝতে পারছি আপনি এত জোরাজুরি কেন করছিলেন…বাজি ধরেছেন, এই অপরিচিত বাড়িতে আমাকে সাপারে নিয়ে আসবেন– তাই না?'

শাতো-রোনো কোনও জবাব দিচ্ছে না দেখে ডি– র দিকে ফিরল সে।

'এই ভদ্রলোক যখন উত্তর দিচ্ছেন না, আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, মশিয়ে, মশিয়ে দো শাতো-রোনো কি আপনার সঙ্গে বাজি ধরে আমাকে এখানে টেনে এনেছেন?'

'মিথ্যে বলা উচিত হবে না, মাদাম, হ্যাঁ, এই রকমই একটা কথা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে।'

'বুঝলাম। কিন্তু যেহেতু আমি ভেবেছিলাম আমার কোনও বন্ধুর বাসায় সাপার খেতে চলেছি, জানতাম না কোথায় নিয়ে চলেছেন উনি আমাকে; বাজিতে ওঁরই হার হয়েছে। এখানে অপরিচিত একজনের বাসায় আমি স্বেচ্ছায় আসিনি। মশিয়ে দো শাতো-রোনো বাজিতে জিততে গিয়ে আমাকে অসম্মান করতে দ্বিধা করেননি। কাজেই আমি…'

'প্লীজ, এমিলি, এসেই তো পড়েছ,' বলল মশিয়ে দো শাতো-রোনো, 'থাকো না। চেয়ে দেখো, সবাই এঁরা ভদ্রলোক, সবাই ওঁরা ভদ্রমহিলা।'

'আমাকে টেনে আনা হয়েছে,' শাতো-রোনোর কথা কানেই তুলল না অচেনা মহিলা, ডি– র দিকে ফিরে বলল। 'মনে হচ্ছে আপনিই গৃহকর্তা, আপনার সহৃদয় সৌজন্যে আমি মুগ্ধ, আপনাকে ধন্যবাদ; যদিও আপনার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে

পারছি না। এক্ষুণি আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই, মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি যদি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেন, আমি কৃতজ্ঞ থাকব তাঁর কাছে।'

এক লাফে উঠে পড়ল লুই, ছুটে গিয়ে দাঁড়াল অচেনা মহিলা আর মশিয়ে দো শাতো-রোনোর মাঝখানে।

রাগে কাঁপতে শুরু করল শাতো-রোনো, নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে; চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, এমিলি, আমার সঙ্গে এসেছ এখানে, যেতে যদি হয় আমিই নিয়ে যাব তোমাকে।'

আমাদের দিকে ফিরল অচেনা মহিলা। 'মেসিয়া, আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোক আছেন এখানে। আমি আমার সম্মান আপনাদের হাতে ন্যস্ত করছি। আমার অনুরোধ, মশিয়ে দো শাতো-রোনো আমাকে অপমান করবার চেষ্টা করলে আপনারা তাঁকে ঠেকাবেন।'

শাতো-রোনো এগোতে গেল, আমরা সবাই একসাথে উঠে দাঁড়ালাম।

পরিস্থিতি যে সুবিধের নয়, বুঝতে পারল শাতো-রোনো। বলল, 'ঠিক আছে, মাদাম, তুমি যেতে পারো। আমি জানি কার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে আমাকে।'

'মশিয়ে যদি আমাকে বুঝিয়ে থাকেন,' মাথা উঁচু করে মর্যাদার সঙ্গে বলল লুই দো ফ্রানশি, 'আজ সারাদিন পাবেন আমাকে ৭ নম্বর রু দো হোলদোখ-এ।'

'বেশ। ঠিক আছে, মশিয়ে। তবে আপনার বাসায় আমার যাওয়ার সৌভাগ্য হবে না; আমার বদলে আমার দুই বন্ধু যাবেন, তৈরি থাকবেন।'

'জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছেন, মশিয়ে,' বলল লুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে, 'একজন ভদ্রমহিলার সামনে এসব হুমকি···ছি! ছি! চলুন, মাদাম,' মহিলার বাহু ধরল সে, 'বিশ্বাস করুন, আমাকে আজ আপনি যে সম্মান দিলেন, তার জন্যে অন্তরের অন্তস্তল থেকে আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

বেরিয়ে গেল দুজন। কবরের স্তব্ধতা নেমে এল ঘরে।

'যাক, মেসিয়া, যা হবার হলো,' সবার আগে সামলে নিল শাতো-রোনো। 'আমি হেরে গেছি। আগামী পরশু আমরা সবাই সাপার করব ফেখ-রোভেনস-এ।'

কথাটা বলে খালি চেয়ার দুটোর একটায় বসল সে, একটা গ্লাস তুলে বাড়িয়ে ধরল ডি– র দিকে, কানায় কানায় ভরে যেতে চুমুক দিল তাতে।

কথায় কথায় বারবার উচ্চ, কর্কশ কণ্ঠে হেসে উঠল মশিয়ে দো শাতো-রোনো, কিন্তু পার্টি আর জমল না।

চোদ্দ

সেইদিনই সকাল দশটায় গিয়ে দাঁড়ালাম লুই দো ফ্রানশির দরজায়। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার সময় দুজন লোককে নামতে দেখলাম। একজনকে দেখে বোঝা গেল কেতাদুরস্ত শহুরে লোক; অপরজন সিভিলিয়ান পোশাক পরা থাকলেও বুঝতে

অসুবিধে হলো না, সৈনিক– বুকে পদক আঁটা। বুঝলাম মশিয়ে লুই দো ফ্রানশির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল এরা। বেল বাজালাম।

চাকর এসে জানাল গৃহস্বামী তাঁর পড়ার ঘরে। একটা চিঠি লিখছিল লুই, আমি এসেছি শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল।

'বাহ্, এসে পড়েছেন,' বলে অসমাপ্ত চিঠিটা দলা পাকিয়ে চুলোয় ফেলল সে। 'আপনাকেই লিখছিলাম। ঠিক আছে, জোসেফ, তোমাকে আর বাইরে যেতে হবে না। কেউ এলে বলবে আমি বাড়ি নেই। ঠিক আছে?'

মাথা ঝুঁকিয়ে চলে গেল জোসেফ।

বসার জন্যে একটা চেয়ার দেখাল সে আমাকে। জিজ্ঞেস করল, 'দুজন লোককে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, একজন একটা পদক ঝুলিয়েছিল। ওদের কি মশিয়ে দো শাতো-রোনো পাঠিয়েছিল?'

'হ্যাঁ, ওরা তাঁর সেকেন্ড।'

'আয়-হায়! ব্যাপারটাকে সত্যিই লোকটা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে দেখছি!'

'এছাড়া তাঁর তো কোনও উপায়ও ছিল না আর,' বলল লুই দো ফ্রানশি।

'ওরা কি এসেছিল...'

'আমার দুজন বন্ধুকে ওদের সঙ্গে আলোচনার জন্যে পাঠাতে বলে গেল। তখনই আপনার কথা মনে হলো।'

'সম্মানিত বোধ করছি। কিন্তু আরেকজন?'

'আমার এক বন্ধু, বাখন জিয়োখদানো মাখতেল্লিকে, লাঞ্চে দাওয়াত করেছি। এগারোটায় আসবে ও। আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করব, তারপর দুপুরের দিকে যদি আপনারা ওদের ওখান থেকে একটু ঘুরে আসেন... তিনটে পর্যন্ত থাকবে বলেছে বাসায়। এই যে নাম-ঠিকানা লেখা ওদের কার্ড।'

দুটো কার্ড বের করে দিল সে আমার হাতে। একজনের নাম ভাসকাঁ রনে দো শাতো-গ্রঁ, অপরজন মশিয়ে আদ্রিয়েন দো বোয়াসি। প্রথমজন থাকে ১২ নম্বর রু দো লা পেই-তে, আর দ্বিতীয়জন আর্মির লেফটেন্যান্টই হবে, থাকে ২৯ নম্বর রু দো লিলি-তে।

কার্ড দুটো বারবার উল্টাচ্ছি-পাল্টাচ্ছি।

'কি নিয়ে এত চিন্তা করছেন?' জিজ্ঞেস করল লুই।

'এ-ব্যাপারে আপনি কতটা সিরিয়াস জানা দরকার। আমরা সেই ভাবেই কথাবার্তা চালাব।'

'কি বলছেন আপনি! কতটা সিরিয়াস মানে? রীতিমত সিরিয়াস। আপনি নিজের কানে শুনেছেন, মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে নিজেই আমি ঠিকানা দিয়েছি, তিনি তাঁর সেকেন্ডদের পাঠিয়েছেন আমার কাছে। এটা এখন আর আমার হাতে নেই।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক...তবে...'

'বলে যান,' মৃদু হাসি লুইয়ের মুখে।

'সেক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে দ্বন্দ্বটা কি নিয়ে। ঝগড়ার কারণ না জেনে

আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারি না দুজন লোক একে অপরের গলা কাটছে। সেকেন্ডদের দায়-দায়িত্ব দ্বন্দ্ব-যোদ্ধাদের চেয়ে বেশি, জানেন নিশ্চয়ই।'

'বেশ, সংক্ষেপে বলছি আমাদের ঝগড়ার কারণ:

'প্যারিসে আসার পর আমার এক বন্ধু, এক ফ্রিগেডের ক্যাপ্টেন, আমাকে তার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। অল্পবয়সী, অসম্ভব সুন্দরী এই মহিলা গভীর ছাপ ফেলল আমার মনে। পাছে তার প্রেমে পড়ে যাই, সেই ভয়ে বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেলে যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতাম।

'এতে অসন্তুষ্ট হত আমার বন্ধু, প্রায়ই অনুযোগ করত। শেষে একদিন তাকে সত্যি কথাটা বললাম। বললাম কিসের ভয়ে আমি ঘন ঘন তার বাসায় যাই না। হাসল, আমার সঙ্গে হাত মেলাল, এবং সেই দিনই জোর-জুলুম করে আমাকে তার বাসায় ধরে নিয়ে গেল।

'খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে বলল, "লুই, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে মেক্সিকো রওনা হচ্ছি আমি। তিনমাস বা তারও বেশি সময় থাকতে হবে দেশের বাইরে। আমরা, নৌ-বাহিনীর লোকেরা জানতে পারি কবে রওনা হতে হবে, কিন্তু কবে ফিরতে পারব সেটা আমাদের জানানো হয় না। আমার অনুপস্থিতির সময়টুকু এমিলিকে আমি তোমার দায়িত্বে রেখে যেতে চাই। এমিলি, লুই দো ফ্রানশিকে আপন ভাই বলে জানবে।"

'উত্তরে আমার হাত ঝাঁকিয়ে দিল ওর স্ত্রী।

'হঠাৎ এরকম একটা প্রস্তাব শুনে বোকা হয়ে গিয়েছিলাম, কোনও উত্তর দিতে পারিনি। ভবিষ্যৎ-বোনের কাছে নিশ্চয়ই একটা বুদ্ধু মনে হয়েছে আমাকে।

'তিন সপ্তাহ পর সত্যিই আমার বন্ধু চলে গেল।

'ওই তিন সপ্তাহে অন্তত সপ্তাহে একদিন সে আমাকে জোর করে নিয়ে গেছে বাসায়, না খেয়ে আসতে দেয়নি।

'মায়ের কাছে থাকল এমিলি। যাওয়ার আগে তার স্বামী জোর দিয়ে বলে গেছে, যেন মাঝে মাঝেই আগের মত বন্ধু-বান্ধব ডেকে খাওয়ানো হয়। কোনও অঘটন সে কল্পনাও করেনি, এমিলির ওপর তার এতই গভীর বিশ্বাস ছিল।

'কাজেই স্বামীর কথা মত মাঝেমাঝেই বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত করতে থাকল এমিলি। অল্প কয়েকজনের পার্টি, তাছাড়া তার মা উপস্থিত– কাজেই কোনও রকম দুর্নাম হওয়ার উপায় নেই। বেশ চলছিল।

'মাস তিনেক আগে মঞ্চে প্রবেশ করল মশিয়ে দো শাতো-রোনো।

'মন যে আগাম সতর্ক সংকেত দেয়, এ আপনি বিশ্বাস করেন? ওঁকে দেখেই মনটা বিরূপ হয়ে গেল আমার, কেমন একটা অস্বস্তিবোধ পেয়ে বসল। ড্রইং-রুমে অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও চালু এক লোকের আচার-ব্যবহার তাঁর, কোথাও কোনও ত্রুটি নেই; অথচ, যদিও উনি আমার সঙ্গে ভাল-মন্দ একটি কথাও কখনও বলেননি, উনি বেরিয়ে গেলে ঘৃণায় ছেয়ে যেত আমার অন্তর।

'কেন যে এমন হত বলতে পারব না।

'এমিলিকে প্রথম দেখে আমার যেমন লেগেছিল, কি করে যেন বুঝে ফেলেছি

এই ভদ্রলোকেরও ওই একই অবস্থা।

'তাছাড়া আমার মনে হলো তাঁকে আপ্যায়ন করতে গিয়ে খুবই চটুল ও চপল আচরণ করছে এমিলি। সন্দেহ নেই, এসব আমার দেখার ভুল; কিন্তু আপনার কাছে স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ওকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেছি আমি, তাই প্রচণ্ড ঈর্ষায় ভুগছিলাম।

'পরবর্তী এক সন্ধ্যায় মশিয়ে দো শাতো-রোনোর ওপর চোখ রাখলাম আমি। সেটা তাঁরও দৃষ্টি এড়াল না। নিচু গলায় এমিলিকে কিসব বললেন, আমার মনে হলো আমাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করছেন।

'আপনাকে কী বলব, ওই সন্ধ্যাতেই কোনও ছুতোয় ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে ডুয়েল লড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম আমি মনে মনে; কিন্তু সামলে নিলাম, বারবার নিজেকে বোঝালাম, এরকম কিছু একটা করে বসা উদ্ভট এক নির্বোধের কাজ হবে।

'ফলাফল? পরবর্তী প্রতিটা শুক্রবার ক্ষত-বিক্ষত হলাম আমি।

'মশিয়ে দো শাতো-রোনো দশ ঘাটের পানি খাওয়া ঘাঘু লোক; টিপটপ ফুলবাবুই শুধু নয়, খ্যাতিমানও; আমি জানি আমার চেয়ে অনেক ওপরতলার মানুষ উনি, তাঁর সঙ্গে আমার কোনও তুলনাই হয় না; তবু আমার মনে হত যতটা উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা দিচ্ছে তাঁকে এমিলি।

'কিছুদিন পর জানতে পারলাম, মশিয়ে শাতো-রোনোর সঙ্গে এমিলির এই যে বাড়াবাড়ি রকমের ঘনিষ্ঠতা এটা অন্যদের চোখেও ধরা পড়েছে। আমার মত আর একজন নিয়মিত অতিথি জিয়োখদানো একদিন কথাটা তুলল আমার কাছে। তখনই মনস্থির করে ফেললাম, সরাসরি কথা বলব এমিলির সঙ্গে। আমার ধারণা ছিল না-বুঝে করছে ও কাজটা, বুঝিয়ে বললে দুর্নাম হওয়ার আগেই সামলে নেবে।

'কিন্তু অবাক হয়ে গেলাম, প্রথমে ঠাট্টা হিসেবে উড়িয়ে দিল ও আমার কথাগুলো, তারপর বলল এসব আজগুবি ভাবনা; আমি আর জিয়োখদানো দুজনেই উদ্ভট চরিত্রের লোক।

'আমি আমার বক্তব্য থেকে নড়লাম না।

'তখন এমিলি জানিয়ে দিল, আমার সঙ্গে সে একমত হতে পারছে না, কারণ প্রেমে পড়লে মানুষের বিচার-বুদ্ধি একপেশে হয়ে যায়।

'তাজ্জব হয়ে গেলাম, সব কথা বলেছে ওকে ওর স্বামী!

'সেই মুহূর্ত থেকে, বুঝতেই পারছেন, আমি হয়ে গেলাম প্রেমে ব্যর্থ এক ঈর্ষাকাতর যুবক, যার উদ্ভট আচরণকে করুণার দৃষ্টিতে দেখা যায়। এমিলির বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম।

'বন্ধ করলাম বটে, কিন্তু সব কথাই কানে আসতে থাকল, মশিয়ে দো শাতো-রোনোর সঙ্গে এমিলির মেলামেশা লোকের মুখরোচক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াল খুব অল্পদিনেই।

'চিঠি লিখব বলে স্থির করলাম। সেই চিঠিতে তার নিজ সম্মান, তার প্রবাসী স্বামীর সম্মান ইত্যাদির দোহাই দিয়ে অনুনয় বিনয় করলাম। কাজ হলো না।

জবাবই দিল না ও।

'বুঝলাম, আর কিছুই করার নেই আমার। প্রেমে পড়েছে বেচারী, কাজেই আমারই মত অসহায়, অন্ধ– কেউ চোখে আঙুল দিয়ে কিছু দেখাতে চাইলেও দেখবে না।

'এর কিছুদিন পর লোকে খোলাখুলি বলতে শুরু করল, ও এখন মশিয়ে দো শাতো-রোনোর রক্ষিতা।

'কী যে কষ্ট পেয়েছি! কেউ টের পায়নি, শুধু আমার বেচারী ভাইটি ছাড়া। আমার জন্যে কষ্ট পেতে হয়েছে ওকেও।

'এর সপ্তাহ দুয়েক পরেই আপনি এলেন।

'আপনি যেদিন এ-ব্যসায় প্রথম এলেন, ওই দিনই একটা বেনামী চিঠি পেলাম। এক অপরিচিতা মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান অপেরা বল-এ। আমার এক বন্ধুর স্ত্রী সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাবেন।

'গতরাতে সেজন্যেই গিয়েছিলাম। বরং বলা ভাল, না গিয়ে পারিনি। যাই হোক, ভায়োলেট ফুলের তোড়া হাতে মহিলাকে সময় মতই পাওয়া গেল ঘড়ির নিচে। মহিলা আমাকে জানালেন, আমি অবশ্য আগেই জানি সেটা, মশিয়ে দো শাতো-রোনো হচ্ছেন এমিলির প্রেমিক। আমি প্রমাণ চাওয়ায় তিনি বললেন: মশিয়ে দো শাতো-রোনো মশিয়ে ডি– র সঙ্গে বাজি ধরেছেন যে তাঁর নতুন প্রণয়িনীকে ডি– র ব্যসায় সাপারে নিয়ে যেতে পারবেন।

'নিয়তির লিখন দেখুন কেমন: আপনি মশিয়ে ডি– র পরিচিত, আপনাকে তিনি সাপারে দাওয়াত করলেন, বললেন, আপনি ইচ্ছে করলে একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিতে পারবেন, আপনি আমাকে নিতে চাইলেন, আমি রাজি হলাম।

'এরপর থেকে সবই আপনার জানা।

'যা-যা ঘটেছে, এবং সেই প্রেক্ষিতে আমি যা-যা করেছি, এবং তার ফলে এখন যা-যা ঘটতে চলেছে– বলুন, কিছু আমার এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায় ছিল?'

কোনও উত্তর দিতে পারলাম না।

'কিন্তু,' হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কথা মনে পড়ে গেল আমার, 'আমার যতদূর মনে পড়ে, আপনার ভাই আমাকে বলেছিলেন, আপনি জীবনে কখনও পিস্তল-বন্দুক বা তলোয়ার স্পর্শ করেননি।'

'সত্যি কথাই বলেছে।'

'তাহলে?' বুকের ভেতর ধড়ফড় করছে আমার। 'তাহলে প্রতিপক্ষকে ঠেকাবেন কি করে?'

'চিন্তা করবেন না, খোদার যা ইচ্ছে তাই হবে।'

পনেরো

এমনি সময়ে ভৃত্য জানাল বাখন জিয়োখদানো মাখতেল্লি এসেছেন।

লুই দো ফ্রানশির মত ইনিও কর্সিকান, সাখতান প্রদেশের লোক। আর্মির ফরটীনথ রেজিমেন্টে আছেন। অস্ত্র চালনায় বিশেষ যোগ্যতার কারণে তেইশ বছর বয়সেই ক্যাপটেন হয়েছেন। সাদা পোশাক পরে এসেছেন তিনি।

'যাক, ব্যাপারটা একটা পরিণতির দিকে চলেছে শেষ পর্যন্ত,' আমার দিকে বাউ করে লুইকে বলল মশিয়ে মাখতেল্লি, 'তোমার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে মশিয়ে শাতো-রোনোর সেকেন্ডরা আজই তোমার এখানে হাজির হবে।'

'ওরা এসে চলে গেছে,' বলল লুই।

'নাম-ঠিকানা রেখে গেছে?'

'এই যে ওদের কার্ড।'

'বেশ। তোমার লোকটা বলল লাঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে; তাহলে খাওয়া সেরেই যেতে পারি দেখা করতে, কি বলো?'

আমরা মন থেকে ব্যাপারটা দূর করে ডাইনিং-রুমে গিয়ে বসলাম। লুই আমার কর্সিকা-ভ্রমণের কথা তুলল; সংক্ষেপে সবই বললাম। আগামী কাল মশিয়ে দো শাতো-রোনোর সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলার পর অন্য বিষয়ে সহজেই মন দিতে পারল লুই। প্রশ্ন করে করে ওর ভাই আর মায়ের প্রতিটি কথা বার বার শুনল। ভাইয়ের গর্বে চকচক করে উঠল ওর চোখ। অখলান্দ আর কলোনার ঝগড়া মিটাতে বেচারা ভাইটিকে কত কষ্ট করতে হয়েছে জেনে উদ্বেলিত হলো।

ঘড়িতে বারোটা বাজল।

'মেসিয়া,' বলল লুই, 'আপনাদের তাগাদা দিচ্ছি না, তবে ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করার সময় প্রায় হয়ে এল; দেরি করলে ওঁরা মনে করবেন আমরা ইচ্ছেকৃতভাবে অমার্জিত ব্যবহার করছি।'

'এ নিয়ে আপনি ভাববেন না,' বললাম আমি। 'ওঁরা এখান থেকে গেছেন ঘণ্টা দুয়েকের বেশি হবে না। আমাদেরকে খবর দিয়ে আনাতে আপনার সময় লাগবে না?'

'সে যাই হোক,' বলল বাখন জিয়োখদানো, 'কথাটা লুই ঠিকই বলেছে।'

'তাহলে,' লুইয়ের দিকে ফিরলাম, 'আমাদের জানা দরকার কোন্ অস্ত্র আপনার পছন্দ– তলোয়ার না পিস্তল?'

'হায় খোদা! পছন্দ?' হাসল লুই। 'আপনাকে তো বলেইছি, দুটোই আমার কাছে সমান, এটা বা ওটা কোনটা সম্পর্কেই কিচ্ছু জানি না আমি। তবে মশিয়ে দো শাতো-রোনো সম্ভবত পছন্দ করা-করি থেকে রেহাই দেবেন আমাকে। তাঁর ধারণা তাঁকে অপমান করা হয়েছে, কাজেই পছন্দের অস্ত্র বেছে

নেয়ার অধিকার তাঁরই।'

'কে কাকে অপমান বা অসন্তুষ্ট করল সেটা বিচারসাপেক্ষ বিষয়। একজন ভদ্রমহিলার অনুরোধে আপনি শুধু তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন।'

'শুনুন,' লুই বলল, 'আমার মনে হয়, এসব নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে গেলে মনে হতে পারে আমি ব্যাপারটা মিটমাট করার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন, আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, অন্তত যুদ্ধবাজ নই। জীবনে এই প্রথম কোনও ঝগড়ায় জড়ালাম। সেইজন্যেই যেটা সঠিক সেটাই করতে চাই।'

'আপনার পক্ষে কথাটা বলা সহজ; আপনি শুধু নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিচ্ছেন, কিন্তু আপনার পরিবারকে বুঝ দেয়ার দায়িত্ব বর্তাবে আমাদের ওপর– ফলাফল যা-ই হোক না কেন।'

'এই ব্যাপারে একটুও দুশ্চিন্তা করবেন না। আমি আমার মাকে, আমার ভাইকে চিনি। ওরা আপনাকে জিজ্ঞেস করবে: "লুই কি ভদ্রলোকের মত আচরণ করেছিল?" আপনি যদি বলেন: "হ্যাঁ।" ওরা বলবে: "তাহলে ঠিক আছে।" '

'বেশ তো, ভাল কথা। কিন্তু তারপরেও আমাদের জানা দরকার আপনার পছন্দের অস্ত্র কোন্‌টা।'

'তাহলে···ওরা যদি পিস্তলের কথা বলে, চট্ করে রাজি হয়ে যাবেন।'

'আমারও তাই মত,' বলল বাখন।

'তাহলে পিস্তলই সই,' বললাম। 'আপনারা দুজনেই যখন এ ব্যাপারে একমত। তবে পিস্তলটা বড় জঘন্য অস্ত্র।'

'হাতে সময় আছে? এখন থেকে আগামীকাল সকাল– এর মধ্যে কি আমার পক্ষে তলোয়ার চালানো শিখে নেয়া সম্ভব?'

'না। তবে গ্রিসিয়ের কাছে একটা লেস্‌ন্ নিতে পারলে হয়তো আত্মরক্ষার কায়দাটা শিখে ফেলতে পারতেন।'

হাসল লুই।

'বিশ্বাস করুন,' বলল সে, 'কাল আমার কি হবে সেটা লেখা হয়ে গেছে আগেই। যত যাই করি না কেন, লিখন পাল্টাবে না।'

এরপর হাত মিলিয়ে আমরা নিচে নেমে এলাম। প্রতিপক্ষের যে সাহায্যকারী সবচেয়ে কাছে থাকে তার বাসার দিকে রওনা হলাম। বেশিদূর যেতে হলো না। ভাসকাঁ রেনে দো শাতোগ্রঁ-র বাড়িতে পৌঁছে শুনলাম মশিয়ে লুই দো ফ্রানশির লোক ছাড়া আর কারও সঙ্গে এখন তিনি দেখা করবেন না। উদ্দেশ্য জানালাম ভৃত্যকে, কার্ড দিলাম; সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে নিয়ে বসানো হলো আমাদের।

অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ ও ধুরন্ধর লোক ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁ। উনি বললেন, আরেক সেকেন্ড মশিয়ে দো বোয়াসির বাড়িতে আমাদের আর যাওয়ার দরকার নেই; তাঁরা দুজন আলাপ করে ঠিক করেছেন আমরা প্রথমে যাঁর বাসায় যাব তিনিই অপরজনকে খবর পাঠিয়ে ডেকে নেবেন। খবর নিয়ে বেরিয়ে গেল ভৃত্য।

অপেক্ষার সময়টুকু আমরা অপেরা, রেস, শিকার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে খুচরো আলাপ করলাম, যে কাজে এসেছি সে বিষয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করলাম না। মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে পড়লেন মশিয়ে আদ্রিয়েন দো বোয়াসি। এঁরা

জানালেন, কোনও বিশেষ অস্ত্রের প্রতি পক্ষপাত নেই তাঁদের, কারণ মশিয়ে দো শাতো-রোনো তলোয়ার-পিস্তল দুটোতেই সমান সিদ্ধহস্ত। মশিয়ে দো ফ্রানশি যে অস্ত্র পছন্দ করবেন তাতেই তাঁদের সম্মতি থাকবে। ইচ্ছে করলে টস্ করেও স্থির করা যায়। আমরা টস্ করলাম, স্থির হলো: দ্বন্দ্বযুদ্ধের অস্ত্র হবে পিস্তল।

তারপর স্থান ও কাল স্থির করা হলো। আগামী কাল সকাল নয়টায় বোয়া দো ভানসাঁ-এ দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবে, বিশ কদম দূরে থাকবে দুই প্রতিপক্ষ, তিনবার তালি বাজানো হবে– তৃতীয় তালির সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়বে দুজন দুজনের দিকে।

ফ্রানশিকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাতে ফিরে গেলাম।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরে মশিয়ে দো শাতো-রোনোর সেকেন্ড দুজনের কার্ড পেলাম।

ষোলো

সেদিনই রাত আটটায় লুই দো ফ্রানশির বাসায় গেলাম। জানতে চাইলাম, আমার প্রতি তার কোনও বিশেষ নির্দেশ আছে কিনা। কেমন যেন রহস্যময় ভঙ্গিতে সে বলল আগামীকাল সকালে জানাবে। বলল, 'রাতেই আসে পরামর্শ, উপদেশ।'

কাজেই পরদিন নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগেই পৌঁছে গেলাম লুই দো ফ্রানশির বাসায়। সকাল সাড়ে সাতটায়।

পড়ার ঘরে কি যেন লিখছে ও ব্যস্ত-সমস্ত ভঙ্গিতে। দরজা খোলার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। অদ্ভুত ফ্যাকাসে চেহারা।

'কিছু মনে করবেন না,' বলল লুই, 'মাকে চিঠি লিখছি, শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। বসুন, খবরের কাগজ এসে থাকলে…দাঁড়ান, লা প্রেস-এ চমৎকার একটা সিরিয়াল আছে, এই যে।'

কাগজটা নিলাম, অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম; চেহারাটা যে রকম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, তার সঙ্গে ওর শান্ত ব্যবহার আর নরম গলার স্বর একেবারেই মানাচ্ছে না।

পড়ায় মন দেয়ার চেষ্টা করলাম; কিন্তু চোখ এগিয়ে যায়, মনে কোনও ছাপ পড়ে না।

'শেষ,' পাঁচ মিনিট পর সিধে হলো লুই। বেল বাজিয়ে ভৃত্যকে ডাকল। ও আসতে বলল, 'জোসেফ, আগামী দশ মিনিট কারও সঙ্গে দেখা করব না, জিয়োখদানোর সঙ্গেও না– বুঝতে পেরেছ? এই ভদ্রলোকের সঙ্গে জরুরী কথা আছে, যেন বাধা না পড়ে– কেমন?'

মাথা ঝুঁকিয়ে 'বাউ' করে দরজা বন্ধ করে দিল জোসেফ।

'আলেকজান্দ্রে, তোমার ওপর একটা দায়িত্ব দিতে চাই,' বলল লুই। 'জিয়োখদানো একজন কর্সিকান, ওর ধ্যান-ধারণাও কর্সিকান; তাই ওর ওপর ভরসা রাখতে পারছি না– ওকে স্রেফ চুপ করে থাকতে বলব, ব্যস; কিন্তু

তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই, তার আগে তোমার কথা দিতে হবে– যা বলব অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে তুমি।'

'নিশ্চয়ই! সেটাই তো "সেকেন্ড"-এর কর্তব্য, তাই না?'

'গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য, কারণ দ্বিতীয় বিপর্যয়ের হাত থেকে হয়তো তুমি রক্ষা করতে পারবে আমাদের পরিবারকে।'

'দ্বিতীয় বিপর্যয়?'

'পড়ে দেখো,' চিঠিটা এগিয়ে দিল ও আমার দিকে, 'মাকে লেখা এ-চিঠি পড়লেই বুঝতে পারবে পরিষ্কার।'

ওর হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পড়তে শুরু করলাম।

'প্রিয় মা আমার,

'তুমি কতখানি সাহসী, কতটা ধর্ম-বিশ্বাসী যদি না জানতাম, তাহলে দুঃসংবাদটা দেয়ার আগে তোমাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমি জানি, তার দরকার নেই, তাই সরাসরিই বলছি: এ-চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে তখন তোমার থাকবে শুধু এক ছেলে।

'লুসিয়েন, প্রিয় ভাই, মাকে আমাদের দুজনের সমান ভালবেসো।

'গত পরশু "ব্রেন ফিভারে" আক্রান্ত হয়েছি। শুরুতে টের পাইনি; ডাক্তার যখন এলো তখন দেরি হয়ে গেছে। মা, আমি মারা যাচ্ছি।

'আমার মৃত্যুর পনেরো মিনিটের মধ্যেই এ-চিঠি রওনা হয়ে যাবে। আমি তোমাদের জানাতে চাই, কোনও দুঃখ নিয়ে মারা যাইনি আমি; একমাত্র দুঃখ আমার প্রিয় মায়ের আদর আর প্রিয় ভাইয়ের ভালবাসা হারাতে চলেছি।

'বিদায়, মা।

'কেঁদো না। আমার আত্মাটাকেই তো ভালবাসো তুমি, এই দেহটা নয়। তুমি স্থির জেনো, মা, যেখানেই থাকি, চিরকাল এই আত্মা তোমাকে ভালবেসে যাবে।

'বিদায়, লুসিয়েন।

'তোমার মত ভাই হয় না। প্রিয় ভাই, আমাদের মাকে ফেলে কোথাও যেয়ো না; মনে রেখো, তুমি ছাড়া আর কেউ থাকল না মায়ের।

'তোমার ছেলে,
'তোমার ভাই,
'লুই দো ফ্রানশি।'

চিঠি শেষ করে ওর দিকে চাইলাম।

'এর অর্থ কি, লুই?'

'বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'ঠিক ন'টা দশে খুন হতে চলেছি আমি আজ।'

'খুন হতে চলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'মাথা খারাপ তোমার! এ চিন্তা ঢুকল কেন তোমার মাথায়?'

'আমি পাগলও হইনি, ভয়ও পাইনি, বন্ধু। আমাকে আগাম জানানো

হয়েছে।'

'আগাম? কে আগাম জানাল?'

'আমার ভাই তোমাকে বলেনি.' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল লুই, 'যে আমাদের পরিবারের পুরুষরা একটা বিশেষ সুবিধে ভোগ করে?'

'বলেছে,' উত্তর দিলাম। নিজের অজান্তে শিউরে উঠলাম একবার। 'বলেছে ভৌতিক ছায়ামূর্তি দেখা দেয়।'

'ঠিক। কাল রাতে আমার বাবা এসেছিলেন; সেজন্যেই আজ এত ফর্সা দেখাচ্ছে আমাকে। মৃত কাউকে দেখলে সাদা হয়ে যায় জীবিতরা।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম ওর দিকে, ছম ছম করছে গা।

'গত রাতে তুমি তোমার বাবাকে দেখেছ, বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'হ্যাঁ। আমার মৃত্যুসংবাদ দিয়েছেন।'

'নিশ্চয়ই ভয়ানক কোনও দুঃস্বপ্ন দেখে...'

'ভয়ানক ঠিকই, তবে স্বপ্ন নয়– সত্যি।'

'ঘুমিয়ে ছিলে?'

'না, জেগে...তুমি বিশ্বাস করো না বাবা তার ছেলের কাছে আসতে পারে?'

মাথা ঝাঁকালাম; কারণ জানি, এটা সম্ভব– আমার নিজের জীবনেও ঘটেছে।

'ঠিক কিভাবে কি ঘটল খুলে বলো তো?'

'সহজ, স্বাভাবিক ভাবেন। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলাম, অপেক্ষা করছিলাম বাবার জন্যে, কারণ আমি জানি, আমার বিপদ দেখলে উনি দেখা দেবেন। মাঝরাতে দেখলাম বাতির আলো কমে গেল, আস্তে খুলে গেল দরজা, বাবা এসে ঢুকলেন ঘরে।'

'কোন আকারে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'বেঁচে থাকতে যে-পোশাক পরতেন, সেই সাধারণ পোশাকই ছিল পরনে, তবে খুবই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল তাঁকে, আর চোখের দৃষ্টিতে কোনও অভিব্যক্তি ছিল না।'

'হায়, খোদা!'

'ধীর পায়ে আমার খাটের পাশে এসে দাঁড়ালেন। আমি কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলাম। ডাকলাম, "এসো, বাবা!" আরও কাছে এসে আমার দিকে তাকালেন। আমার মনে হলো নিষ্প্রভ দুই চোখে ভালবাসার জ্যোতি দেখতে পেলাম।'

'বাপরে! ভয়ই লাগছে...তারপর?'

'তারপর ঠোঁট নড়ে উঠল। কিন্তু কী আশ্চর্য, আওয়াজ হলো না, অথচ নিজের ভেতর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেলাম। অনেকটা প্রতিধ্বনির মত, পরিষ্কার, কিন্তু কেমন যেন ফাঁপা।'

'কি বললেন তিনি?'

'আমাকে বললেন: "ঈশ্বরের কথা ভাবো, লুই।"

'জিজ্ঞেস করলাম, "এই ডুয়েলে কি আমি মারা যাব, বাবা?"

'দেখলাম, ফ্যাকাসে গাল বেয়ে দু'ফোঁটা অশ্রু নেমে এল।

' "কখন?" জানতে চাইলাম।

'দেয়াল ঘড়ির দিকে আঙুল তুললেন তিনি। তাকিয়ে দেখি: নটা বেজে দশ মিনিট।

' "বুঝতে পারলাম, বাবা," আমি বললাম, "খোদার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। মাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে সত্যি, কিন্তু তোমাকে তো পাচ্ছি।"

'আবছা হাসির রেখা ফুটল মুখে, হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে চলে গেলেন। আপনা-আপনিই খুলে গেল দরজা, বাবা বেরিয়ে যেতে বন্ধ হয়ে গেল নিজে থেকে।'

এতই সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে গল্পটা শোনাল ও যে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, হয় ও যা বলছে সত্যিই তাই ঘটেছে; নয়তো প্রচণ্ড মানসিক চাপের মুখে মতিভ্রম বা দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল, আর ও সেটাকেই সত্য বলে ধরে নিয়েছে।

কপালের ঘাম মুছলাম।

'আমার ভাইকে তো চেনো তুমি। তাই না?' বলল লুই।

'হ্যাঁ।'

'ডুয়েল লড়তে গিয়ে আমি মারা পড়েছি জানতে পারলে ও কি করবে বলে তোমার ধারণা?'

'সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে এখানে তোমার হত্যাকারীর খোঁজে।'

'ঠিক। যদি ও-ও মারা পড়ে তাহলে? তাহলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে আমার মা।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, এ দুঃখের কোনও তুলনা নেই।'

'কাজেই, সেটা এড়াবার জন্যেই আমার এই চিঠি। মস্তিষ্ক-প্রদাহে মারা গেছি জানলে প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসবে না আমার ভাই, মাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে থাকবে ও তার পাশে: খোদার ইচ্ছের ওপর কারও হাত নেই, মা-ও একসময় দুঃখ ভুলবে, জানবে না মানুষের চক্রান্তে মরতে হয়েছে আমাকে। অবশ্যই যদি না...'

'যদি না কী?'

'যদি না...' একটু থামল লুই, 'না, না। আশাকরি তা হবে না।'

বুঝলাম, কোনও ব্যক্তিগত বিষয়ে নিজের মনে কথা বলছে ও, তাই আর চাপ দিলাম না। তাছাড়া, ঠিক সেই মুহূর্তেই খুলে গেল দরজা।

'এই যে, দো ফ্রানশি,' বলল বাখন দো জিয়োখদানো, 'আর তোমার বারণ মানা সম্ভব হলো না। আটটা বাজে...নটায় আমাদের পৌঁছবার কথা। সাড়ে চার মাইল যেতে হবে আমাদের, সময় মত পৌঁছতে হলে এখনই রওনা হওয়া দরকার।'

'এই তো, আমি তৈরি,' বলল লুই। 'ভেতরে এসো, মশিয়ের সঙ্গে যা কথা ছিল, হয়ে গেছে।'

ঠোঁটে তর্জনী রেখে আমার দিকে তাকাল লুই। টেবিল থেকে একটা মুখবন্ধ খাম তুলে এগিয়ে দিল বাখনের দিকে, 'ধরো, এটা তোমার জন্যে। আমার যদি

ভাল-মন্দ কিছু হয় চিঠিটা খুলে পড়বে, এবং আমার অনুরোধ, ওতে যা বলা হয়েছে তুমি ঠিক তাই করবে।'

'কথা দিচ্ছি।'

'তোমার তো অস্ত্র জোগাড় করবার কথা ছিল, তাই না?' আমার দিকে ফিরল লুই।

'হ্যাঁ। কিন্তু দেখলাম, একটা পিস্তল ঠিক মত কাজ করছে না। যাওয়ার পথে ডেভিসিন থেকে একটা পিস্তলের কেস তুলে নেব।'

মৃদু হেসে আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল লুই। বুঝতে পেরেছে, আমি চাই না আমার পিস্তল দিয়ে কেউ ওর দিকে গুলিবর্ষণ করুক।

'গাড়ির কি ব্যবস্থা?' জানতে চাইল লুই। 'জোসেফকে ডেকে আনতে পাঠাব?'

'আমার কুপে আছে,' বলল বাখন, 'তিনজন ধরবে ওতে। দেরি করে ফেলেছি আমরা, আমারটায় গেলে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যাবে, ঘোড়াগুলো তাজা।'

'তাহলে রওনা হওয়া যাক,' বলল লুই।

নিচে নামলাম আমরা। দরজার কাছে অপেক্ষা করছে জোসেফ।

'আমি কি সঙ্গে আসব, মশিয়ে?' জানতে চাইল সে।

'না, জোসেফ,' বলল লুই। 'কোনও দরকার নেই, তুমি থাকো।' কথাটা বলে আমাদের থেকে একটু পিছিয়ে গেল। 'এই যে, ধরো,' জোসেফের হাতে ছোট একটা টাকার থলে গুঁজে দিল সে, 'আর, যদি কোনও কারণে কখনও তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে থাকি, মাফ করে দিয়ো।'

'মশিয়ে!' ফুঁপিয়ে উঠল জোসেফ, পানি বেরিয়ে এসেছে চোখ থেকে, 'এর মানে কি!'

'চুপ!' বলেই এক লাফে গাড়িতে উঠে দুজনের মাঝখানে বসে পড়ল সে।

'মানুষটা খুব ভাল ছিল,' জোসেফের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে বলল লুই। 'তোমরা যদি ওর কোনও উপকারে আসো, আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

'ওকে কি বিদায় করে দিয়েছ?' জানতে চাইল বাখন।

'না,' মৃদু হেসে বলল লুই, 'আমিই বিদায় নিচ্ছি।'

ডেভিসিনে থেমে একজোড়া পিস্তল, কিছু বারুদ আর বুলেট নিয়ে নিলাম, তারপর দ্রুতবেগে ছুটলাম আবার।

সতেরো

নয়টা বাজতে পাঁচ মিনিট থাকতে পৌঁছলাম আমরা ভানসাঁ-এ। একই সময়ে আরেকটা গাড়িতে চড়ে পৌঁছল মশিয়ে দো শাতো-রোনো ও তার সেকেন্ড দুজন। ভিন্ন ভিন্ন পথে দু'দল জঙ্গলে ঢুকলাম। আমাদের কোচম্যানরা গ্রঁ অ্যাভিনিউ পর্যন্ত

পৌঁছে দেবে আমাদেরকে। কয়েক মিনিটেই পৌঁছে গেলাম নির্ধারিত জায়গায়।

'একটা কথা, মেসিয়া,' গাড়ি থেকে নেমেই বলে উঠল লুই, 'খেয়াল রেখো, ওর সঙ্গে কোনও আপসে আমি রাজি নই।'

'কিন্তু যদি...' আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলাম, থামিয়ে দিল ও আমাকে।

'প্রিয় বন্ধু, তোমাকে যে গল্প শুনিয়েছি; তারপরেও তুমি নিশ্চয়ই এরকম কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করবে না, কিংবা কারও প্রস্তাবে রাজিও হবে না।'

অগত্যা ওর কথা মেনে নিতেই হলো। ওকে গাড়ির পাশে রেখে আমরা এগোলাম মেসিয়া দো বোয়াসি আর ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁর সঙ্গে কথা বলতে। বাখন দো জিয়োখদানো পিস্তলের কেসটা নিল একহাতে। আমরা পরস্পরকে 'বাউ' করলাম।

'মেসিয়া,' বাখন জিয়োখদানো শুরু করল, 'সংক্ষেপে সারতে হবে কাজটা। আনুষ্ঠানিকতায় দেরি করলে যে-কোনও সময় কাজে বাধা পড়তে পারে। কথা ছিল, আমরা অস্ত্র আনব, এই দেখুন, দয়া করে পরীক্ষা করুন। বন্দুকের দোকান থেকে এইমাত্র কিনে আনা হয়েছে। নিশ্চয়তা দিয়ে এটুকু বলতে পারি, মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি এখন পর্যন্ত এগুলো চোখেও দেখেননি।'

'নিশ্চয়তার কোনও প্রয়োজন নেই, মশিয়ে। আমরা আপনাদের সম্পর্কে জানি।' বলে একটা পিস্তল হাতে তুলে নিল মশিয়ে শাতোগ্রঁ, মশিয়ে দো বোয়াসি নিল অপরটা। ককিংস্প্রিং আর বোর পরীক্ষা করে দেখল সেকেন্ড দুজন।

'সাধারণ পিস্তল এগুলো, এর আগে গুলি ছোঁড়া হয়নি কোনদিন,' বলল বাখন। 'প্রশ্ন হচ্ছে, ডাবল-অ্যাকটিং ট্রিগার ব্যবহার করা যাবে কি যাবে না।'

'আমার মনে হয়,' বলল মশিয়ে দো বোয়াসি, 'যার যা পছন্দ, বা যে যাতে অভ্যস্ত সে তাই ব্যবহার করতে পারে।'

'ঠিক আছে,' বাখন জিয়োখদানো রাজি হলো, 'উভয়েই সমান সুযোগ পেলে আমাদের আপত্তি নেই।'

'তাহলে এই কথাই রইল, আপনারা মশিয়ে দো ফ্রানশিকে জানিয়ে দিন, আমরা জানাচ্ছি মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে।'

'বেশ তো,' বলল বাখন, 'এবার আরেকটা বিষয়। যেহেতু অস্ত্র দুটো আমরা এনেছি, আপনারা গুলি ভরবেন এতে।'

বুলেট আর বারুদ নিয়ে মেতে গেল ওরা তিনজন। আমার এসবে অংশ নেয়ার ইচ্ছে নেই, আমি লুইয়ের কাছে ফিরে গেলাম। আমাকে আসতে দেখে মৃদু হাসল সে।

'তোমাকে যা-যা করতে বলেছি সব মনে আছে তো?' জানতে চাইল লুই। 'তাছাড়া জিয়োখদানোর কাছ থেকেও কথা আদায় করবে, যেন আজকের ঘটনা কোন অবস্থাতেই আমার মা কিংবা ভাইয়ের কানে না যায়। বিশেষ করে তুমি একটু দেখবে, যেন খবরের কাগজে এই ঘটনার বিবরণ না ওঠে, অথবা, যদি ওঠেই, নাম-ধাম যেন ছাপা না হয়।'

'এখনও তোমার ধারণা মৃত্যু তোমার হবেই?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার শান্ত ভাব দেখে ভাবতে ইচ্ছে করছে যে হয়তো তোমার কিছু ভুল হয়েছে, হয়তো আগাম খবর অবশ্যম্ভাবী কিছু নয়।'

'সন্দেহ রেখো না মনে,' বলল লুই। ঘড়িটা বের করল পকেট থেকে। 'একজন সত্যিকার কর্সিকান হিসেবে মরতে চাই বলেই কোন ভয়ডর দেখতে পাচ্ছ না আমার মধ্যে। আর সাত মিনিট বাঁচব আমি। ঘড়িটা রাখো, এটা আমার স্মৃতিচিহ্ন : খুব ভাল ঘড়ি, ব্রিগুয়ে কোম্পানীর।'

ঘড়িটা নিয়ে ওর হাত চেপে ধরলাম।

'ঠিক আট মিনিটের মাথায় এটা তোমাকে ফেরত দিতে চাই আমি।'

'এ নিয়ে আর কোনও কথা নয়, প্লীজ,' বলল লুই, 'এই যে, এসে পড়ল সবাই।'

'মেসিয়া,' বলল ভাসকাঁ দো শাতেগ্রঁ, 'আমার ধারণা, কাছেই, হাতের ডানধারে ছোট্ট একটা মাঠ মত জায়গা আছে। গতবছর ওটা আমি এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে ব্যবহার করেছিলাম। আসুন না, ওটা খুঁজে বের করি? এই অ্যাভিনিউয়ে গোলাগুলির ব্যাপারে লোকে আপত্তি করতে পারে।'

'বেশ তো, রাস্তা দেখান, মশিয়ে,' বলল বাখন, 'আমরা আসছি পিছন পিছন।'

ভাসকাঁ পথ দেখাল, আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে ওর পিছু পিছু এগোলাম। গজ ত্রিশেক যাওয়ার পর ছোট্ট একটা মাঠ মত জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম। বোঝা গেল এটা একটা পুকুর ছিল এক সময়, এখন শুকনো। চারধারের পাড় সামান্য উঁচু। মনে হলো, যে-কাজে এসেছি তার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আর হতে পারে না। যেন নাটকের সাজানো স্টেজ।

'মশিয়ে মাখতেল্লি,' বলল ভাসকাঁ, 'আমার সঙ্গে এসে দূরত্বটা মেপে দেখবেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বাখন, পাশাপাশি হেঁটে বিশ কদম দূরত্ব নির্ধারণ করল দুজনে।

আমি দাঁড়িয়ে আছি ফ্রানশির পাশে। হঠাৎ ও বলে উঠল, 'ভাল কথা, আমার লেখার টেবিলের ওপর আমার উইলটা পাবে।'

'ঠিক আছে, বললাম, 'দেখব সেটা।'

'মেসিয়া, আপনারা যদি তৈরি হয়ে যান,' বলল ভাসকাঁ দো শাতেগ্রঁ।

'আমি তৈরি,' বলল লুই। 'বিদায়, বন্ধু! আমার জন্যে যা কষ্ট করেছ, সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ,' একটু হাসল, 'আরও যেটুকু কষ্ট রয়েছে তোমাদের কপালে, তার কথা আর নাই বললাম।'

ওর হাতটা নিজের হাতে নিলাম। ঠাণ্ডা, কিন্তু দৃঢ় নিষ্কম্প।

'কাল রাতের সব ঘটনা ভুলে যাও, লুই,' বললাম, 'যতটা ভালভাবে পারো, লক্ষ্য স্থির করে গুলি করবে।'

'ফেন্সইংটা মনে আছে তোমার?'

'আছে।'

'তাহলে তো জানোই, প্রতিটা বুলেটের নিজ-নিজ ঠিকানা আছে···গুড-বাই।'

কয়েক পা এগিয়ে বাখন জিয়োখদানোর কাছ থেকে পিস্তল নিল লুই, কক করল, তারপর দাঁড়াল গিয়ে রুমাল রেখে চিহ্ন দেয়া জায়গাটায়।

মশিয়ে দো শাতো-রোনো আগেই দাঁড়িয়ে গেছে নিজের জায়গায়।

নিশ্চুপ, গম্ভীর কয়েকটা মুহূর্ত কাটল। এই ফাঁকে প্রতিপক্ষ দুজন যে-যার সেকেন্ডদের, প্রতিপক্ষের সেকেন্ডদের এবং সবশেষে একে অপরকে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন করল।

মশিয়ে দো শাতো-রোনোর চাল-চলন ও স্মিত হাসি দেখে বোঝা গেল এসবে সে রীতিমত অভ্যস্ত, আত্মবিশ্বাসেও কোনও ঘাটতি নেই। আমার মনে হলো, খুব সম্ভব এটাও তার অজানা নেই যে জীবনে এই প্রথম পিস্তল ধরছে লুই।

লুই দাঁড়িয়ে আছে শান্ত, সমাহিত; আত্মমর্যাদায় উঁচু মাথা; মনে হচ্ছে মার্বেলের মূর্তি।

'কি হলো, মেসিয়া?' বলল শাতো-রোনো। 'দেখতেই পাচ্ছেন, আমরা অপেক্ষা করছি।'

শেষবারের মত আমার দিকে তাকাল লুই, একটু হেসে, দৃষ্টিটা ওপর দিকে তুলল।

'তাহলে, মেসিয়া,' ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল শাতোগ্রঁ, 'তৈরি হয়ে যান।'

হাত তালি শুরু করল:

'এক...দুই... তিন...'

প্রায় একই সঙ্গে দুটো গুলির আওয়াজ হলো।

তাকিয়ে দেখলাম, দুইবার পাক খেল লুই দো ফ্রানশির শরীরটা, তারপর বসে পড়ল হাঁটুতে ভর দিয়ে। মশিয়ে দো শাতো-রোনো দাঁড়িয়ে রয়েছে, বগলের কাছে ফুটো হয়ে গেছে কোট।

দৌড়ে গেলাম লুইয়ের পাশে।

'জখম হয়েছ, লুই?' জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তর দিতে চেষ্টা করল ও, কিন্তু পারল না; রক্ত-লাল ফেনা দেখা দিল ওর ঠোঁটের ফাঁকে। পিস্তলটা ছেড়ে দিয়ে বুকের ডানদিকটা চেপে ধরল ও। দেখলাম ওখানে কোটের গায়ে ছোট্ট একটা ফুটো।

'বাখন,' চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ছুটে গিয়ে ব্যারাক থেকে একজন আর্মি সার্জেনকে নিয়ে আসুন!'

কিন্তু দো ফ্রানশি মাথা নেড়ে বারণ করল জিয়োখদানোকে। বোঝাতে চাইছে, অর্থহীন হবে এই ছোটাছুটি। আরেক হাঁটু ঠেকল মাটিতে।

মশিয়ে দো শাতো-রোনো ঘুরেই হাঁটা ধরল গাড়ির দিকে। কিন্তু তার সেকেন্ড দুজন এসে দাঁড়াল লুইয়ের পাশে। ইতোমধ্যে ওর কোট খুলে ওয়েইস্টকোট ও শার্ট ছিঁড়ে ফেলেছি আমরা। বুকের ডানপাশ দিয়ে ঢুকেছে বুলেট, পাঁজরের ষষ্ঠ হাড়ের ঠিক নিচ দিয়ে; বেরিয়ে গেছে বাম নিতম্বের একটু ওপর দিয়ে। মৃত্যুপথযাত্রীর প্রত্যেক শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দু'দিকের ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। জখম যে মারাত্মক, সন্দেহ নেই।

'মশিয়ে দো ফ্রানশি,' বলল ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁ, 'বিশ্বাস করুন, বিরোধের

এই পরিণতিতে আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত, আর আমরা এ-ও জানি, অন্তিম মুহূর্তে মশিয়ে শাতো-রোনোর বিরুদ্ধে আপনি মনে কোনও বিদ্বেষ পুষে রাখবেন না।'

'না, না,' বিড় বিড় করে বলল আহত লুই, 'আমি···আমি ওকে ক্ষমা করে দিলাম···তবে, ওকে কোথাও···সরে যেতে···পালিয়ে যেতে বলবেন।' অনেক কষ্টে আমার দিকে ফিরে দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'তোমার প্রতিজ্ঞা মনে রেখো, আলেক···'

'কসম খেয়ে বলছি, লুই, তুমি যা বলেছ তাই করা হবে।'

'এবার,' হাসি-হাসি হলো মুখটা। 'আমার ঘড়ির দিকে তাকাও।'

কথাটা বলেই জোরে শ্বাস টানল একবার, তারপর পড়ে গেল পিছন দিকে।

মারা গেল মশিয়ে লুই দো ফ্রানশি।

ওর দেয়া ঘড়িটার দিকে চাইলাম: ন'টা বেজে দশ মিনিট।

আমরা ওর বাসায় বয়ে আনলাম দেহটা। বাখন দো জিয়োখদানো গেল পুলিশের জেলাপ্রধানের কাছে ঘটনার বিবরণ দিয়ে ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে। আমি আর জোসেফ মৃতদেহ নিয়ে এলাম দোতলায়, ওর ঘরে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জোসেফ।

দেয়াল ঘড়িটার দিকে চোখ গেল, দেখলাম, চাবি না দেয়ায় থেমে গেছে ওটা কাঁটায় কাঁটায় ন'টা বেজে দশে।

বাখন জিয়োখদানো ফিরে এল পুলিশ নিয়ে। জিনিসপত্র সব সীল করার জন্যে এসেছেন অফিসার।

লুইয়ের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের খবর জানিয়ে চিঠি পাঠানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল বাখন, আমি তাকে অনুরোধ করলাম কিছু করার আগে যেন লুই দো ফ্রানশির দেয়া চিঠিটা একবার পড়ে। এতে লুই ওকে সর্নিবন্ধ অনুরোধ করেছে, যেন লুসিয়েন ও অন্যান্যদের কাছে ওর মৃত্যুর কারণটা গোপন রাখে, দেশের কারও কানে যেন কথাটা না যায়, যেন কোন জাঁকজমক ছাড়াই খুব সাদামাঠা ভাবে তাকে কবর দেয়া হয়।

বন্ধুর শেষ অনুরোধ রক্ষা করবে বাখন– কথাটা জেনে নিয়ে আমি মশিয়ে দো বোয়াসি ও মশিয়ে দো শাতোগ্রঁর সঙ্গে দেখা করতে চললাম: তাদের অনুরোধ করব যেন এই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে নীরব থাকে, এবং যেন মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে কিছুদিনের জন্যে হলেও প্যারিসের বাইরে কোথাও সরে থাকতে রাজি করায়।

আমার কথায় রাজি হলো দুজনেই; রওনা হয়ে গেল মশিয়ে দো শাতো-রোনোর সঙ্গে কথা বলতে। মাদাম দো ফ্রানশিকে মস্তিষ্ক-প্রদাহে ওর মৃত্যুর খবর জানিয়ে লেখা লুইয়ের চিঠিটা পোস্ট করব বলে চললাম। তাছাড়া যতটা পারা যায় সামাল দিতে হবে সংবাদপত্রে খবর ছাপার ব্যাপারটাও।

আঠারো

এ ধরনের নারীঘটিত ডুয়েল নিয়ে সাধারণত সমাজে, বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোতে, যে তুলকালাম কাণ্ড হয়, সেই তুলনায় বলতে গেলে প্রায় কিছুই হলো না।

উল্টোপাল্টা প্রচারণার শিঙা ফুঁকতে ওস্তাদ সাময়িকীগুলোও নীরব থাকল।

অল্প কয়েকজন বন্ধু গোরস্তানে গেলাম। ওর ইচ্ছে অনুযায়ী ওকে অনাড়ম্বর ভাবেই মাটি দেয়া হলো।

মশিয়ে দো শাভো-রোনোকে তার সেকেন্ডরা প্যারিস ছেড়ে যেতে রাজি করাতে পারেনি– উদ্ধত ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে সে এই প্রস্তাব।

একবার মনে হয়েছিল, সুলাকাখোয় আমিও একটা চিঠি লিখব কি না। কারণ, লুইয়ের এই মিথ্যা বলার পেছনে যুক্তি যাই থাকুক, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক; মা ও ভাইয়ের কাছে মৃত্যুর মিথ্যা খবর জানানোর ব্যাপারটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। সিদ্ধান্তটা লুই নিজে নিয়েছে, ওর যুক্তিগুলোও অত্যন্ত জোরাল– তবু আমার মন মানছে না।

তবে শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম, লুইয়ের অনুরোধই রাখব, চুপ করে থাকব। ওরা হয়তো আমাকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বা অকৃতজ্ঞ মনে করবে, তবু মিথ্যে বলার চেয়ে চুপ থাকাই ভাল। মনে হলো বাখন জিয়োখদানোও তাই করবে।

লুইকে কবর দেয়ার ঠিক পাঁচদিন পর। রাত সোয়া এগারোটা। আগুনের ধারে টেবিলে বসে লিখছি। চারদিক চুপচাপ। এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল আমার চাকরটা, তড়িঘড়ি দরজা বন্ধ করল, তারপর কাঁপা গলায় বলল, 'মশিয়ে লু-লু-লুই দো ফ্রানশি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান!'

হতভম্ব হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে: একেবারে ছাইবর্ণ দেখাচ্ছে মুখটা।

'কি বললে, ভিক্তর?' জিজ্ঞেস করলাম।

'মশিয়ে, কী যে বলছি, সত্যি বলতে গেলে, আমি নিজেও জানি না।'

'কে এসেছে বললে?'

'মশিয়ের বন্ধু!' প্রায় ফিসফিস করে বলল ভিক্তর। 'যে মশিয়ে ফ্রানশি ক-য়েকবার এসেছেন আমাদের বাড়িতে।'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে! তোমার জানা নেই, পাঁচদিন আগে ডুয়েল লড়তে গিয়ে...'

'জানা আছে, মশিয়ে। উনি মারা গেছেন!' থরথর করে কাঁপছে ভিক্তর, দুচোখ যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

শিরশির করে ভয়ের একটা স্রোত নেমে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে।

'জ্বি, মশিয়ে। বেল বাজতেই দরজা খুলে দেখি উনি দাঁড়িয়ে। এক লাফে পিছিয়ে গেলাম। উনি ঢুকে পড়লেন ভেতরে, জানতে চাইলেন আপনি আছেন কি না। আমি হ্যাঁ বলতেই বললেন, "যাও, ওকে বলো মশিয়ে দো ফ্রানশি কথা বলতে চান।" আমি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'প্রলাপ বকছ, ভিক্তর। হলঘরে আলো কম, ঠিক মত দেখতে পাওনি; হয়তো ঘুমের ঘোরে ছিলে, ঠিক মত শুনতেও পাওনি। যাও, নামটা ভাল করে জেনে এসো।'

নড়ল না ও। 'আ-আমি কসম খেয়ে বলছি, মশিয়ে, আমার দেখা বা শোনায় কোনও ভুল হয়নি।'

'ঠিক আছে, তাহলে ওঁকে ভেতরে আসতে বলো।'

কাঁপতে কাঁপতে দরজার কাছে গেল ভিক্তর, দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ঘরের ভেতরে থেকেই ডাকল, 'মশিয়ে, দয়া করে ভেতরে আসবেন?'

কার্পেট থাকা সত্ত্বেও পায়ের আওয়াজ পেলাম, এগিয়ে আসছে আমার ঘরের দিকে; পরমুহূর্তে পরিষ্কার দেখতে পেলাম দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে লুই দো ফ্রানশি!

এইবার সড়সড় করে দাঁড়িয়ে গেল আমার ঘাড়ের কাছে সব কটা চুল। উঠে দাঁড়িয়ে ছিলাম, পিছিয়ে গেলাম এক পা নিজের অজান্তেই। ভিক্তর সেটে আছে দেয়ালের গায়ে।

'এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করছি বলে মাফ করবেন,' বলল ফ্রানশি, 'মিনিট দশেক হলো পৌঁছেছি প্যারিসে। আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য হলো না, চলে এলাম।'

'আরে! মাই ডিয়ার লুসিয়েন,' ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। 'তুমি! তুমি এসেছ?' চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এল, নিজেকে সামলাতে পারলাম না।

'হ্যাঁ,' বলল ও, 'আমি।'

এই পাঁচদিনে চিঠি পৌঁছানো একেবারেই অসম্ভব। আমার পোস্ট করা চিঠি এতক্ষণে আজাসিওতেই পৌঁছায়নি, সুলাকাথো তো আরও বহুদূর। অর্থাৎ খবর পেয়ে আসেনি ও।

'তার মানে, এখানে কী ঘটে গেছে কিছুই জানো না তুমি।'

'সব জানি,' বলল ও।

'কি বললে? সব জানো?'

'হ্যাঁ।'

'ভিক্তর,' ঘাড় ফিরিয়ে দেখি এখনও দেয়ালে সেঁটে রয়েছে ও, পারলে দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, 'এখন যাও, পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের দুজনের জন্যে খাবার নিয়ে আসবে ট্রেতে করে। আমার সঙ্গে সাপার খাবে তুমি, লুসিয়েন: তোমার ঘুমানোর জন্যে বিছানা রেডি করতে বলি?'

'খাব,' বলল লুসিয়েন। 'খিদেও লেগেছে– অগজি থেকে এ-পর্যন্ত খাইনি কিছু। আর থাকতেও হবে এখানেই। কারণ, ভাইয়ের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলাম, কিন্তু

ওখানে কেউ তো আমাকে চেনে না, অথচ ভাবছে চেনে– তাই ঢুকতে দিল না। ওরা ভয় পেয়ে এমন চেঁচামেচি শুরু করে দিল যে পালিয়ে চলে এলাম তোমার এখানে।'

'লুইয়ের সঙ্গে তোমার চেহারার এতই মিল যে ওদের দোষ দেয়া যায় না। একটু আগে আমিও তো চমকে গিয়েছিলাম।'

'তা…ই বলুন!' এতক্ষণে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ভিকতর, 'মশিয়ে তাহলে তাঁর ভাই?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি সাপার তৈরি করতে গেলে না?'

ভিক্তর বেরিয়ে যেতেই লুসিয়েনকে হাত ধরে টেনে একটা আর্মচেয়ারে বসালাম, নিজেও পাশে বসলাম।

'তুমি তাহলে আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিলে, প্যারিসে আসার পথে ওই দুর্ঘটনার সংবাদ পাও?'

'না। আমি তখন সুলাকাখোতে।'

'তা কি করে হয়? তোমার ভাইয়ের লেখা চিঠি তো এখনও না পৌঁছারই কথা, তার আগেই তুমি কি করে…'

'বন্ধু আলেকজান্দ্রে, তুমি তো জানোই: মৃত মানুষের আত্মা দ্রুত চলে।'

'তোমার কথাটা কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না।'

'আমাদের পরিবারের একটা বিশেষত্বের কথা তোমাকে বলেছিলাম, ভুলে গেছ দেখছি। আমরা, পরিবারের পুরুষরা…'

'হ্যাঁ। মনে পড়েছে। তোমার ভাইকে দেখেছ তুমি?'

'ঠিক।'

'কখন?'

'ষোলো তারিখে, রাতে।'

'সব বলল তোমাকে?'

'সব।'

'বলল: মারা গেছে?'

'বলল, খুন করা হয়েছে ওকে। মৃত আত্মা কখনও মিথ্যে বলে না।'

'কিভাবে খুন হয়েছে, তাও বলেছে?'

'ডুয়েলে।'

'যে মেরেছে তার নামও…'

'হ্যাঁ, বলেছে। মশিয়ে দো শাতো রোনো।'

'এ কী করে হয়!' আমার দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। 'তুমি নিশ্চয়ই ওর বাসায় গিয়ে বা আর কোনভাবে খবরটা শুনেছ?'

'তোমার কি মনে হয় আমি চালিয়াতির মূডে আছি?'

'মাফ করো! তবে যা বলছ তা এতই…'

'অবিশ্বাস্য। বুঝতে পারছি কি বলতে চাও। তবে দেখো,' শার্ট খুলে বুকের ডানদিকটা দেখাল ও। দেখলাম নীল হয়ে আছে একটা জায়গা, পাঁজরের ষষ্ঠ হাড়ের ঠিক নিচে। 'কিছু বুঝলে? ওর জখমটা কোথায় জামা খুলে দেখেছিলে?'

'আশ্চর্য!' এইবার বুকটা কেঁপে গেল আমার, 'ঠিক এই জায়গাটাতেই তো লেগেছিল গুলি!'

'বেরিয়েছিল এখান দিয়ে, তাই না?' বলেই বাম কোমরে আঙুল ঠেকাল।

'অলৌকিক!' একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম।

'মৃত্যুর সময়টা জানতে চাও?'

'তাও জানো?'

'ন'টা দশ।'

'দাঁড়াও লুসিয়েন, আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে চমকে দিচ্ছ তুমি আমাকে। আর সহ্য করতে পারছি না। কিভাবে কি হলো সব খুলে বলো, প্লীজ!'

উনিশ

আর্মচেয়ারে আরাম করে বসল লুসিয়েন। সহজ ভঙ্গিতে বলল, 'এরমধ্যে আমি তো কোনও অলৌকিকত্ব দেখতে পাচ্ছি না। যেদিন আমার ভাই খুন হলো সেদিন খুব ভোরে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়েছিলাম, যাব কাখবোনির কাছে আমাদের রাখালদের কাজ দেখাশোনা করতে। চলতে চলতে ঘড়িটা বের করে সময় দেখে যেই পকেটে রেখেছি, অমনি প্রচণ্ড আঘাত লাগল বুকের ডানধারে। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। যখন চোখ মেললাম, দেখি শুয়ে আছি মাটিতে, আমার চোখে-মুখে পানির ছিটে দিচ্ছে অখলান্দ। গজ চারেক দূরে দাঁড়িয়ে গলা লম্বা করে আমাকে দেখছে আমার ঘোড়াটা, নাক ঝাড়ছে।

' "ব্যাপার কি," জিজ্ঞেস করল উদ্বিগ্ন অখলান্দ, "কী হলো আপনার?"

' "হায় খোদা!" বললাম, "আমি কিছু জানি না। তুমি কি গুলির আওয়াজ পেয়েছ?"

' "নাহ্।"

' "মনে হলো, এই জায়গাটায় গুলি খেলাম।" এই কথা বলে ব্যথার জায়গাটা দেখালাম।

' "প্রথমত, কেউ এখানে বন্দুক বা পিস্তল ফোটায়নি; দ্বিতীয়ত, আপনার কোটে কোনও ফুটো নেই।"

' "তাহলে," বললাম, "খুব সম্ভব এই মাত্র আমার ভাই মারা গেল গুলি খেয়ে।"

' "তা হতে পারে," বলল অখলান্দ, "সেটা সম্ভব।"

'কোট খুলে দাগ দেখে নিশ্চিত হলাম। তখন অবশ্য নীলচে ছিল না দাগটা, ক্ষতচিহ্নের মত দেখাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল রক্তক্ষরণ হচ্ছে।

'শারীরিক ও মানসিক তীক্ষ্ণ ব্যথায় কিছুক্ষণের জন্যে বেদিশা হয়ে পড়লাম। মনে হলো সুলাকাখোয় ফিরে যাই। কিন্তু মা'র কথা মনে এল। সাপারের সময়

বাড়ি ফেরার কথা আমার, আগে ফিরলে কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে, অথচ কোনও ব্যাখ্যা নেই আমার। নিশ্চিত না হয়ে লুইয়ের মৃত্যুসংবাদ দিতে চাইনি আমি মা'কে। তাই সন্ধে ছ'টার আগে আর ফিরলাম না।

'কিছুই সন্দেহ করেনি মা। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে ফিরতে যাচ্ছি, করিডরে আসতেই বাতাসে নিভে গেল আমার হাতে ধরা মোম।

'নিচে গিয়ে আবার জ্বেলে আনব ভেবে ঘুরতে গিয়েই লক্ষ করলাম আমার ভাইয়ের ঘরে আলো জ্বলছে, দরজার ফাঁক-ফোকর দিয়ে কয়েক চিলতে আলো দেখা যাচ্ছে।

'মনে করলাম, কোনও কাজে ঘরে ঢুকেছিল হয়তো গ্রিফো, ভুলে আলোটা ফেলে রেখে গেছে।

'দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখলাম, লুইয়ের বিছানার পাশে মোমদানিতে ছোট্ট একটা মোমবাতি জ্বলছে, বিছানায় শুয়ে রয়েছে লুই, রক্ত ঝরছে নগ্ন বুক থেকে।

'এক মুহূর্তের জন্যে মূর্তির মত জমে গেলাম ভয়ে, তারপর কাছে গেলাম।

'ছুঁলাম ওকে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীরটা।

'আমি ঠিক যে জায়গাটাতে ব্যথা পেয়েছি, ঠিক সেখান দিয়েই শরীরে ঢুকেছে গুলি। বেগুনী হয়ে আসা জখমের ফাঁক দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত চুয়াচ্ছে।

'আমার ভাই যে খুন হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ থাকল না।

'হাঁটুতে ভর দিয়ে চোখ বুজে মাথাটা রাখলাম বিছানায়। প্রার্থনা করলাম।

'প্রার্থনা শেষে চোখ মেলে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার, মোমবাতি গায়েব। বিছানা হাতিয়ে দেখলাম, খালি।

'আমি নিজেকে যথেষ্ট সাহসী বলে মনে করি, কিন্তু সেদিন ওর ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে অনুভব করলাম, মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেছে, ঘামে ভিজে গেছে শরীর।

'আরেকটা মোমবাতি নেয়ার জন্যে নিচে গেলাম; আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল মা।

' "কী হয়েছে, লুসিয়েন," কাছে এসে জিজ্ঞেস করল মা। "এমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?"

' "কই, কিছু না তো!" বললাম।

'আরেকটা মোমবাতি নিয়ে ওপরে উঠে এলাম। এবার আর নিভল না বাতি, আমার ভাইয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম···কেউ নেই। মোমদানি গায়েব, খাটের তোশকে কোথাও কোন চাপ পড়েনি। আমার প্রথম মোমবাতিটা দেখলাম পড়ে আছে মেঝেতে। তুলে নিয়ে জ্বাললাম ওটাও।

'নতুন করে কোনও প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, আমার মনে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকল না: সকাল ন'টা বেজে দশ মিনিটের সময় খুন হয়েছে আমার ভাই।

'নিজের ঘরে ফিরে বিছানায় শুয়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকলাম। অনেক, অনেকক্ষণ পর ক্লান্তিতে ঘুম নামল আমার চোখে।

'এবার স্বপ্নে দেখতে পেলাম পুরো দৃশ্যটা, ঠিক যেভাবে যা ঘটেছে। যে-লোকটা ওকে খুন করেছে, তাকে দেখলাম; শুনলাম, ওকে মশিয়ে দো শাতো-রোনো বলে ডাকা হচ্ছে।'

'হায় হায়! সব দেখেছ ঠিকঠিক!' বলে উঠলাম। 'কিন্তু প্যারিসে এসেছ কেন?'

'আমার ভাইকে যে খুন করেছে, তাকে খুন করতে।'

'খুন করতে?'

'দুশ্চিন্তা কোরো না, কর্সিকানদের মত ঝোপের পিছন বা দেয়ালের আড়াল থেকে নয়; ফরাসীদের মত সাদা দস্তানা, ঝালর ও কুঁচি দেয়া আস্তীন লাগানো কারুকাজ করা শার্ট পরে খুন করব ওকে।'

'মাদাম দো ফ্রানশি জানেন তুমি কি করতে এখানে এসেছ?'

'জানে।'

'উনি তোমাকে অনুমতি দিলেন?'

'আমার কপালে চুমো খেয়ে বলল: যাও। আমার মা তো একজন সত্যিকার কর্সিকান।'

'এবং তুমি চলে এলে!'

'এসে গেছি। বিশ্বাস না হয় ছুঁয়ে দেখো।'

'তোমার ভাই কিন্তু চায়নি তুমি প্রতিশোধ নিতে ছুটে আসো।'

'তাই বুঝি?' তিক্ত হাসি হাসল লুসিয়েন। 'মৃত্যুর পর মত পরিবর্তন করেছে ও নিশ্চয়ই।'

এমনি সময় সাপার নিয়ে ঘরে ঢুকল ভিকতর, আমরা বসে পড়লাম টেবিলে।

নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে খেল লুসিয়েন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে ওর ঘরে পৌঁছে দিলাম ওকে। আমার হাত ধরে শুভরাত্রি কামনা করল। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি থাকলেই কেবল মানুষকে এমন একটা অটল সিদ্ধান্ত নেয়ার পরও এমন শান্ত দেখায়।

পরদিন সকালে আমি তৈরি হতেই এসে হাজির হলো লুসিয়েন।

'ভানসাঁ-এ যাব ওর মৃত্যুস্থানটা জিয়ারত করতে,' বলল ও, 'তুমি যাবে আমার সঙ্গে? তোমার সময় না থাকলে আমি একাই ঘুরে আসি।'

'একা? একা তুমি যাবে কি করে? তুমি জায়গাটা চেনো?'

'ভাল করেই চিনি। স্বপ্নে দেখেছি তো আমি ওটা।'

আন্দাজে আন্দাজে কতদূর ও যেতে পারে দেখার আগ্রহ হলো।

'আমিও সঙ্গে থাকব তোমার,' বললাম।

'বেশ তো, তুমি তাহলে তৈরি হয়ে নাও; আমি ততক্ষণে জিয়োখদানোকে একটা চিঠি লিখে ফেলি। তোমার চাকরটাকে পাঠানো যাবে তো ওর বাসায়?'

'নিশ্চয়ই। তুমি যা বলবে ও তাই করবে।'

'ধন্যবাদ।' নিজের ঘরে চলে গেল লুসিয়েন।

দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল চিঠি হাতে, ভিকতরকে ওটা দিয়ে বুঝিয়ে দিল কার কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

একটা গাড়ি ডেকে ভানসাঁ-এর উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলাম।

ক্রস রোডে পৌঁছতেই লুসিয়েন বলল 'কাছাকাছি চলে এসেছি, তাই না?'

'হ্যাঁ, জঙ্গলে ঢোকার রাস্তাটা এখান থেকে আর বড়জোর বিশগজ দূরে।'

'এই যে, এইখানে থামো!' বলে উঠল লুসিয়েন।

কোনও রকম দ্বিধা না করে জঙ্গলে প্রবেশ করল লুসিয়েন, যেন কতবার এসেছে এখানে। সোজা গিয়ে সেই ছোট্ট মাঠের ধারে দাঁড়াল ও, এদিক-ওদিক চেয়ে দিক বুঝে নিয়ে সোজা গিয়ে দাঁড়াল ঠিক যেখানে পড়েছিল লুই, সেখানে। নিচু হয়ে ঝুঁকে লাল দাগ খুঁজে পেল মাটিতে, বলল, 'এই সে-জায়গা।' ধীর ভঙ্গিতে মাথা নুইয়ে চুমো খেল সে ঘাসের চাপড়ায়।

এবার উঠে মাঠের ওপর দিয়ে সোজা হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল সে যেখানে দাঁড়িয়ে গুলি করেছিল মশিয়ে দো শাতো-রোনো। 'আর এইখানে দাঁড়িয়েছিল ও,' পা দিয়ে আঘাত করল জমিতে, 'আগামীকাল ঠিক এখানেই শুয়ে থাকতে দেখবে ওকে।'

'কী বলছ তুমি? আগামীকাল…'

'হ্যাঁ। যদি কাপুরুষ না হয়, আগামীকাল ও আমাকে সুযোগ দেবে প্রতিশোধ নেয়ার।'

'বন্ধু লুসিয়েন,' বললাম, 'ফরাসী রেওয়াজ বলে: ডুয়েলের ফলাফল ওই ডুয়েলেই সীমাবদ্ধ– লড়াই শেষ হলেই শেষ। একে আর টেনে লম্বা করা যাবে না। তোমার ভাইকে চ্যালেঞ্জ করেছিল মশিয়ে দো শাতো-রোনো, তার সঙ্গে লড়েছে; এটা তোমার কোনও ব্যাপার নয়।'

'তাই বুঝি? ফরাসী রেওয়াজ বলে: যেহেতু আমার ভাই এক ভদ্রমহিলাকে তাঁরই অনুরোধে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, যে মহিলাকে মশিয়ে দো শাতো-রোনো বেশ্যা বলে প্রমাণ করতে যাচ্ছিল বন্ধু-বান্ধবের কাছে; সেইহেতু আমার ভাইকে চ্যালেঞ্জ করে খুন করবার অধিকার ছিল মশিয়ে দো শাতো-রোনোর! যে ভাই আমার জীবনে কোনদিন পিস্তল ছুঁয়ে দেখেনি, তার তরফ থেকে কোনও রকম বিপদের আশঙ্কা নেই জেনে নিশ্চিন্তে তাকে পাখি শিকারের মত গুলি করে হত্যা করেছিল; সেই লোককে আমার চ্যালেঞ্জ করবার কোনও অধিকার নেই? ধিক তোমাদের ফরাসী রীতি! আমি এ অন্যায় মানব কেন?' একটু থেমে নরম কণ্ঠে বলল, 'দেখা যাক না, কি হয়।'

মাথা ঝাঁকালাম আমি শুধু, ওর কথার জবাব দিতে পারলাম না।

'যাই হোক,' বলল লুসিয়েন,–'এসবের সঙ্গে তোমার জড়িয়ে কাজ নেই, আলেকজান্দ্রে। তোমার বিব্রত বোধ করবারও কোনও কারণ নেই। জিয়োখদানোকে আমি জানিয়েছি কি করতে হবে; আমরা প্যারিসে ফিরতে ফিরতে আশা করি সব ব্যবস্থা করে ফেলবে ও। তোমার কি মনে হয় মশিয়ে দো শাতো-রোনো আমার চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাবে?'

'আমার মনে হয়, সাহসের কমতি নেই ওর।'

'সেটা খুব ভাল কথা,' বলল লুসিয়েন, 'চলো, এবার লাঞ্চ সেরে নিই।'

অ্যাভিনিউয়ে ফিরে গাড়িতে উঠলাম, বললাম, 'ড্রাইভার, রু দো রিভোলি।'

'না,' বলল লুসিয়েন, 'আমি লাঞ্চ খাওয়াব। ড্রাইভার, কাফে দো পাখি চলো। লুই ওখানে প্রায়ই খেতে যেত না?'

'মনে হয়।'

'তাছাড়া, ওখানেই আমি জিয়োখদানোকে আসতে বলেছি।'

'ঠিক আছে। কাফে দো পাখিই সই।'

আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম রেস্তোরাঁর সামনে।

বিশ

লুইয়ের মৃত্যুসংবাদ, বোঝা গেল, এখানে পৌঁছে গেছে আগেই– লুসিয়েনকে দেখে থতমত খেয়ে গেল রেস্তোরাঁর সবাই। আমি একটা প্রাইভেট ঘর চাইলাম। পিছন দিকে একটা কামরা দেয়া হলো আমাদের।

শান্ত, নিরাসক্ত ভঙ্গিতে খবরের কাগজে মন দিল লুসিয়েন। লাঞ্চের মাঝামাঝি সময়ে জিয়োখদানো এসে ঢুকল।

চার-পাঁচ বছর দেখা নেই দুই কর্সিকানের, অথচ কোনও উচ্ছ্বাস দেখলাম না কারও মধ্যে, হ্যান্ডশেক করেই বসে পড়ল জিয়োখদানো। বলল, 'সব ঠিক করে এলাম।'

'চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন তাহলে মশিয়ে দো শাতো-রোনো?'

'হ্যাঁ। তবে শর্ত দিয়েছেন, এরপর তোমরা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেবে।'

'এ ব্যাপারে তাঁকে ভাবতে হবে না। আমিই শেষ ফ্রানশি। সরাসরি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছ, না তাঁর সেকেন্ডদের সঙ্গে?'

'সরাসরি। তিনিই তাঁর সেকেন্ড মশিয়ে দো বোয়াসি আর মশিয়ে দো শাতোগ্রেঁকে জানিয়ে দেবেন। অস্ত্র, সময় ও স্থান যা ছিল তাই থাকবে।'

'বাহ্, চমৎকার···বসে পড়ো, লাঞ্চ খাও।'

বসল বাখন। আমরা ডুয়েল বাদ দিয়ে অন্যান্য নানান বিষয়ে আলাপ করলাম।

লাঞ্চ শেষ হতেই লুসিয়েন অনুরোধ করল, যে পুলিস অফিসার তার ভাইয়ের জিনিসপত্র সীল করেছেন তাঁর এবং ফ্ল্যাটের মালিকের সঙ্গে যেন তাকে পরিচয় করিয়ে দিই। আজকের রাতটা সে লুইয়ের ঘরে কাটাতে চায়।

প্রায় সারাটা দিনই লেগে গেল এসব ব্যবস্থা করতে। বিকেল পাঁচটায় তার ভাইয়ের ঘরে গিয়ে ঢুকল লুসিয়েন। ওকে ওখানে রেখে চলে এলাম আমরা; শোকের জন্যে একাকীত্বের প্রয়োজন আছে।

পরদিন সকাল আটটায় পৌঁছবার অনুরোধ করল লুসিয়েন, বলল, যদি সম্ভব হয় তাহলে যেন ওই একই পিস্তল সংগ্রহের চেষ্টা করি, সম্ভব হলে যেন কিনে নিই গুলো।

তখুনি ডেভিসিন-এ গিয়ে ছয়শো ফ্রাঁ দিয়ে কিনে নিলাম পিস্তল দুটো। মনের

চোখে দেখলাম পিস্তল দুটো ঝুলছে লুসিয়েনের জাদুঘরে– ইতিহাস হয়ে গেছে। একটা খুন করেছিল লুসিয়েনের ভাই লুই দো ফ্রানশিকে, অপরটা নিয়েছিল তার বদলা। অলীক কল্পনা দূর করে দিলাম মন থেকে।

পরদিন ঠিক পৌনে আটটায় পৌঁছে গেলাম লুসিয়েনের ঘরে। স্টাডিরুমে ঢুকে দেখলাম লুইয়ের মত ঠিক সেই একই ভঙ্গিতে বসে কি যেন লিখছে লুসিয়েন। আমাকে দেখে হাসল, কিন্তু চেহারাটা ছাইবর্ণ, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

'এসো, আলেকজন্দ্রে,' বলল ও, 'মা'কে লিখছি।'

'দুঃসংবাদ নয় তো?'

'না। লিখছি, লুইয়ের জন্যে নিশ্চিন্ত মনে এখন থেকে দোয়া করতে পারবে– ওর আত্মা আর অশান্তিতে নেই; খুনের বদলা নেয়া হয়েছে।'

'ডুয়েল শেষ হলে পোস্ট করবে?'

'না, এখনই; এখন পোস্ট করলে কয়েক ঘণ্টা আগে পৌঁছবে।'

'কিন্তু··· কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে কি এরকম একটা চিঠি মাকে লেখা উচিত?'

হাসল লুসিয়েঁ। 'আমি নিশ্চিত।'

'তবু। ডুয়েলের কথা কি আগে থেকে বলা যায়? মা'কে কিছু জানানোর আগে···'

'কেন, কি ঘটবে আমার ভাই আগে থেকে বলেনি তোমাকে?' উঠে দাঁড়াল লুসিয়েন, তর্জনী রাখল আমার কপালে। 'ঠিক এই জায়গায় লাগাব গুলি।' কথাটা বলেই ঘণ্টা বাজাল।

ঘরে ঢুকল জোসেফ।

'দৌড়ে গিয়ে এ-চিঠিটা পোস্ট করে এসো তো, জোসেফ।' ছুটল ভৃত্য।

একটু পরেই বাখন জিয়োখদানো এসে পড়ল। ঘড়িতে দেখলাম আটটা বাজে। লুসিয়েনের তাগাদায় দেরি না করে রওনা হয়ে গেলাম। পথে কোচম্যানকে ও এতই তাড়া দিল যে দশ মিনিট আগেই পৌঁছে গেলাম নির্দিষ্ট জায়গায়।

ঠিক নয়টায় পৌঁছল আমাদের প্রতিপক্ষ। ঘোড়ায় চড়ে এসেছে তিনজনই। অপর একটা ঘোড়ায় করে সহিস এসেছে ঘোড়ার দেখাশোনা করার জন্যে।

গজ বিশেক দূরে নামল ওরা ঘোড়া থেকে, সহিসের হাতে লাগাম ধরিয়ে দিয়ে ধীর পায়ে আসছে এদিকে। সবার পিছনে মশিয়ে দো শাতো-রোনো, ডানহাতটা ঢুকিয়ে রেখেছে কোটের ভেতর। লক্ষ করলাম লুসিয়েনের ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাঁড়াল শাতো-রোনো, মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা। চট্ করে ঘুরে চাবুক চালিয়ে খেলাচ্ছলে ঘাসফুলের মাথা কাটায় মন দিল।

'আমরা উপস্থিত, মেসিয়া,' ঘোষণার ভঙ্গিতে বলল মশিয়ে দো শাতোগ্রঁ ও মশিয়ে দো বোয়াসি। 'গতবারের মত একই নিয়মে হবে এবারের ডুয়েল। তবে শর্ত এই যে, ফলাফল এদিক বা ওদিক যাই হোক না কেন, মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে সেজন্যে কোনও অবস্থাতেই দায়ী করা যাবে না।'

'আমরা রাজি,' বললাম আমরা।

লসিয়েনও মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

'অস্ত্র এনেছেন, মেসিয়া?' ভাসকাঁ দো শাতোগ্রঁ জানতে চাইল।

'ওই আগেরগুলোই।'

'মশিয়ে লুসিয়েন দো ফ্রানশি এগুলোর কোনটা ব্যবহার করেছেন?'

'না। বরং মশিয়ে দো শাতো-রোনো এর একটা ব্যবহার করেছেন একবার; ইনি এগুলো এখন পর্যন্ত চোখেও দেখেননি।'

'ভাল কথা, মেসিয়া। এসো, শাতো-রোনো, চলো যাই।'

নীরবে এগোলাম আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। সামনের মঞ্চে সাতদিন আগেই যে নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার টুকরো টুকরো দৃশ্য ভেসে উঠছে আমাদের সবারই মনে। আজও সেই একই রকম ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটবে প্রতিপক্ষের একজনের ভাগ্যে, বুঝতে পারছি।

ছোট্ট মাঠে এসে পৌঁছলাম।

প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খাটিয়ে নিজেকে শান্ত রেখেছে মশিয়ে দো শাতো-রোনো। বাইরে থেকে শান্ত দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু আমরা যারা গত ডুয়েলে উপস্থিত ছিলাম, তফাৎটা ঠিকই টের পেলাম। ভেতর ভেতর ঘেমে নেয়ে উঠেছে লোকটা, বারবার রুমাল ঘষছে গলায়, কপালে। যতবার লুসিয়েনের দিকে তাকাচ্ছে, ততবারই ভীতির চিহ্ন ফুটে উঠছে দৃষ্টিতে। আত্মবিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে গেছে লোকটার, সন্দেহ নেই।

দু'ভাইয়ের চেহারায় অস্বাভাবিক মিল হয়তো ঘাবড়ে দিয়েছে লোকটাকে, হয়তো ভাবছে, প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছে স্বয়ং লুই দো ফ্রানশির আত্মা। কিংবা এমন কি হতে পারে, খোঁজ নিয়ে জেনেছে লুইয়ের মত আনাড়ি লোক নয় লুসিয়েন, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর দক্ষ একজন পিস্তল শূটার? সন্দেহটা অমূলক মনে হচ্ছে না এখন। গতবারের সেই সাবলীল, নিরুদ্বেগ ভঙ্গি ওর কোথায় গেল এবার?

পিস্তলগুলো যখন লোড করা হচ্ছে, তখন দেখলাম কোটের ভেতর থেকে হাত বের করল লোকটা, হাতটা স্থির রাখার জন্যে ভেজা ন্যাকড়া জড়িয়ে রেখেছিল এতক্ষণ।

লুসিয়েনের দিকে তাকালাম। শান্ত, নিশ্চিত ভঙ্গি ওর, দৃষ্টি স্থির।

কেউ কিছু বলার আগেই লুই যেখানে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল লুসিয়েন; ফলে মশিয়ে দো শাতো-রোনোকে নিজের গতবারের জায়গায় গিয়েই দাঁড়াতে হলো।

হাসিমুখে নিজের অস্ত্র নিল লুসিয়েন।

মশিয়ে দো শাতো-রোনোর মুখে হাসি তো দূরের কথা, অস্ত্র নেয়ার সময় মনে হলো ফ্যাকাসে মুখের জায়গায় জায়গায় নীলচে ছোপ পড়েছে। যেন দম আটকে আসছে, এমনি ভঙ্গিতে কলারের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে টেনে-টুনে ঢিল করার চেষ্টা করল। যেন হাঁসফাঁস করছে প্রাণটা।

লোকটার দিকে চেয়ে আমার খারাপই লাগল। স্বাস্থ্যবান, ধনী, সুবেশী, লেডি-কিলার যুবক, যে কি না গতকাল সকালেও জানত আরও বহু বছর বাচবে, আনন্দ-ফূর্তি করবে; আজ সকালে কলজে শুকিয়ে এসেছে তার, ঘাম মুছছে ভুরু থেকে, চোখে মৃত্যুভীতি।

'আপনারা তৈরি, মেসিয়া?' জানতে চাইল মশিয়ে দো শাতোগ্রঁ।

'তৈরি,' গমগমে কণ্ঠে জবাব দিল লুসিয়েন।

মশিয়ে দো শাতো-রোনো মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল।

আমি আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চট্ করে পিছনে ফিরলাম।

পরপর দু'বার হাততালির শব্দ এল কানে, তৃতীয় তালি চাপা পড়ে গেল দুই পিস্তলের শব্দের নিচে।

ঘুরলাম।

দেখি, মশিয়ে দো শাতো-রোনো পড়ে আছে মাটিতে, অনড়– একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলা বা সামান্যতম নড়াচড়ারও সুযোগ পায়নি; আগেই বেরিয়ে গেছে প্রাণ।

অপরদিকে পিছনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লুসিয়েন, দৃষ্টি আকাশের দিকে। খুব সম্ভব প্রার্থনা করছে ভাইয়ের আত্মার শান্তির জন্যে।

প্রথমে মৃতদেহের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, আমার কপালের যেখানটায় তর্জনী ঠেকিয়েছিল লুসিয়েন, লাশের কপালে ঠিক সেখান দিয়েই ঢুকেছে গুলি।

লুসিয়েনের দিকে এগোলাম।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সে শান্ত ভঙ্গিতে, পিছনে হাত বাঁধা। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পিস্তল ফেলে দিয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল আমাকে।

'ভাই রে, ও আমার ভাই রে!' বুক ফাটা আর্তনাদ করে উঠল লুসিয়েন।

তারপর ভেঙে পড়ল অদম্য কান্নায়। অঝোরে ঝরছে তার চোখের পানি।

ভাইয়ের মৃত্যুর পর এই প্রথম পানি বেরোল ওর চোখ দিয়ে।

* * *

প্রেশাস বেইন

মেরী ওয়েব/কাজী শাহনূর হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

SUYOM

সূচনা

আমি একজন বৃদ্ধা, সুখী মহিলা। ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে প্রায়ই অতীতের নানা রঙের দিনগুলোর কথা ভাবি। সবই স্পষ্ট মনে আছে আমার। মৃত্যুর আগে, যা কিছু মনে আছে সব লিখে রেখে যেতে চাই।

আমার পরিবার–সার্নদের সম্পর্কে সত্য কথা লিখতে চাই আমি। আমার পরিবার সম্বন্ধে অনেক রঙ চড়ানো কথা বলে লোকে। কিন্তু আমি সত্যটা প্রকাশ করতে চাই। লিখতে চাই বিগাইল্ডি পরিবার অর্থাৎ বাবা, মা আর তাদের মেয়ে সম্পর্কেও। আমাদের সঙ্গে কিভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল ওদের জীবন বলব আমি। অনেকে মনে করত মিস্টার বিগাইল্ডি খারাপ লোক। হয়তো তিনি তাই ছিলেন। কিন্তু আমাকে যে শিক্ষা উনি দান করেছেন তা আশীর্বাদই বলতে হবে, অভিশাপ নয়। লেখাপড়া শিখেছিলাম বলেই কেস্টারকে চেনার, জানার সৌভাগ্য হয় আমার। তবে কেস্টারের কথা বলার সময় এখনও আসেনি। যথাসময়ে ওর কথা বলব।

পর্বতমালার আশপাশে এখন বাস করি আমরা। জানালা দিয়ে, আদিগন্ত আকাশ আর ওই উঁচুতে ভেসে যাওয়া মেঘের ভেলা চোখে পড়ে আমার। যখন বয়স কম ছিল, তখনকার কথা আলাদা। 'সার্ন' নামের পারিবারিক বাড়িতে বাস করতাম তখন। বাড়িটা ঘিরে লম্বা লম্বা গাছ ছিল। সার্ন মেয়ার হ্রদের পানিতে প্রতিফলিত হলেই কেবল আকাশ দেখার সুযোগ পেতাম।

এক

আমার বড় ভাই গিডিয়ন সার্নের বয়স তখন সতেরো, আর আমি, প্রুডেন্স সার্ন, ওর চাইতে দু'বছরের ছোট। সালটা আঠারোশো এগারো।

গিডিয়ন গায়ে-গতরে তখনই প্রায় বাবার সমান হয়ে উঠেছিল। দু'জনেই দীর্ঘদেহী আর কৃষ্ণাভ। দু'জনেই গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ধরত, এবং বদমেজাজী ছিল।

আমাদের মা ছোটখাট নির্বিরোধী মানুষ, ঝগড়াঝাটি মোটেই পছন্দ করত না। মা প্রায়ই কান্নাকাটি করত। বেশি কাঁদত যখন আমার দিকে চেয়ে থাকত। কারণ আমার ছিল ঠোঁট কাটা। জন্ম থেকেই এই শারীরিক ত্রুটি, শয়তানের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছি আমি। ছেলেবেলায় এজন্যে সমস্যা হত না বড় একটা। কিন্তু যতই বড় হলাম, আবিষ্কার করলাম লোকে আমাকে নিয়ে এ-ওর সাথে ফিসফাস করছে। তখন থেকেই মনটা মরে গেছে আমার, সর্বক্ষণ লজ্জায় কাঁটা

হয়ে থাকি।

জুনের চমৎকার এক রবিবার, ঘণ্টাধ্বনি যথারীতি মানুষকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল গির্জায়। সেদিন বাবা-মা মৌমাছিদের দেখাশোনা করবে বলে গির্জায় যেতে পারবে না। গিডিয়ন আর আমাকে পাঠানো হলো গির্জায়, নিজেদের সেরা পোশাক পরেছি আমরা। গির্জা থেকে ফিরলে, বাবা সব সময়ই ধর্মোপদেশ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করত। ঠিক ঠিক জবাব দিতে না পারলে কপালে পিট্টি জুটত।

কিন্তু গিডিয়ন এ নিয়ে মোটেও ভাবিত ছিল না। আমাকে এদিন গির্জায় না যেতে প্ররোচিত করল সে। তার বদলে, জাদুকর বিগাইল্ডির মেয়ে জেনসিসের সঙ্গে, সার্ন মেয়ার হ্রদের তীরে খেলা করে সময় পার করলাম আমরা।

ফুলের মত সুন্দর এই জেনসিস বিগাইল্ডি। গায়ের রং তার ধবধবে ফর্সা, একমাথা দীঘল, সোনালী চুল, আর মুখটা সদ্য ফোটা গোলাপের মত। যদিও সে জাদুকরের মেয়ে, কিন্তু কেউ তাকে ডাইনী বলত না। আমার মত কাটা ঠোঁট তো নয় ওর।

আমরা বাসায় যখন ফিরলাম, বাবা তখন সাপারে বসেছে।

'হুঁ, তো আজকে কি সম্পর্কে উপদেশ ছিল গির্জায়?' জানতে চাইল।

'দোজখের আগুন,' জবাব তৈরিই ছিল গিডিয়নের।

'আর পাদ্রী কি বললেন?'

গিডিয়ন এবার এমন এক গপ্পোই ফাঁদল কেউ যা বিশ্বাস করবে না। বাবার মুখের চেহারা কঠোর থেকে কঠোরতর হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত গর্জে উঠল সে, 'মিথ্যুক! আজকে কোন ধর্মোপদেশ ছিল না। আমাদের বাসায় এসেছিল পাদ্রী। গ্রামের অনেক মানুষ অসুস্থ। গির্জায় আজ কেউ যায়নি।

'তোরা গির্জায় যাসনি!' গর্জাল বাবা, 'মিথ্যে কথা বলে বাপের চোখে ধুলো দিতে চাস, এত বড় সাহস!'

সটান উঠে দাঁড়াল বাবা, মুখটা থমথম করছে। সংক্ষুব্ধ। ঘোড়ার চাবুকটা তুলে নিল হাত বাড়িয়ে।

'আজকে তোদের জন্মের মত শিক্ষা দেব!'

কিন্তু বাবা রান্নাঘরের কাছাকাছি আসতেই, গিডিয়ন গেল তেড়ে। মাথা দিয়ে প্রচণ্ড এক ঢুঁ মেরে বসল তার পেটে। পাথুরে মেঝেতে ছিটকে গিয়ে পড়ল বাবা।

চিত হয়ে মেঝেতে নিথর পড়ে রইল বাবা।

শ্বাস-প্রশ্বাস তার এতটাই ভারী গোটা বাড়ি গমগম করতে লাগল। মা তার কাপড়-চোপড় ঢিল করে দিয়ে মুখে পানি ঢালল, কিন্তু কোন লাভ হলো না। শ্বাসের ভয়ানক শব্দটা হয়েই চলেছে। মা চেঁচিয়ে উঠল, 'সার্ন! সার্ন! ওহ্, সার্ন, চোখ মেলো।'

বাবাকে খানিকটা ব্র্যান্ডি খাওয়াতে চেষ্টা করল মা, কিন্তু শক্ত কাঠ হয়ে রয়েছে তার দু'ঠোঁট। এবার শব্দটা পাল্টে ঘরঘরে হয়ে গেল। তারপর একেবারেই থেমে গেল। ঘরের মধ্যে এখন ভীতিকর নীরবতা।

কামরার মাঝখানে গিডিয়ন দাঁড়িয়ে। সব শান্ত হলে পর ও বলল, 'বাবা মারা গেছে, মা। আমি যাই, মৌমাছিদের বলি গিয়ে, নইলে সব হয়তো উড়ে যাবে।'

অদ্ভুত সব ধ্যান-ধারণা ছিল সেকালে মানুষের। গৃহকর্তা মারা গেলে তার বড় ছেলে কিংবা মেয়ে মৌমাছিদের গিয়ে বলত তাকে পরিবারের নতুন মাথা হিসেবে মেনে নিতে। কথাটা বলা না হলে, বিশ্বাস করা হত, মৌমাছিরা সব উড়ে চলে যাবে।

মা আর আমি বসে বসে কাঁদছি। একটু পরে, ফিরে এল গিডিয়ন। বাবার লাশ মাদুরে রাখতে আমাদের সাহায্য করল ও।

'শুতে যাও, মা,' বলল গিডিয়ন। 'জন্তু জানোয়ার সব জায়গা মত ঢুকিয়ে রেখে এসেছি, কোন চিন্তা নেই। আর মৌমাছিদেরও বলা হয়েছে। আমাকে নতুন মনিব হিসেবে পেয়ে খুব খুশি হয়েছে ওরা।'

রাতে কবর দিলাম বাবাকে। গিডিয়ন হলো প্রধান শোক পালনকারী। উঁচু এক কালো হ্যাট আর কালো দস্তানা পরেছে সে। কালো রিবন জড়ানো একটা লাঠি ওর হাতে।

ফুলে ফুলে ছাওয়া এক ওয়াগনে রাখা হলো কফিন। সার্ন গির্জায় ষাঁড়ে টেনে নিয়ে গেল ওয়াগনটা। সার্ন মেয়ারের পানিতে আমাদের মশালের প্রতিফলন। ওয়াগনের পেছন পেছন হাঁটছি, গির্জার ঘণ্টাধ্বনি রাতের অন্ধকার চিরে পরিষ্কার কানে এল।

খুঁড়ে রাখা কবরের একপাশে রাখা হলো কফিন। ওপাশে, সাদা কাপড় বিছানো এক টেবিল। টেবিলের ওপর মায়ের নিজ হাতে তৈরি ওয়াইনের বিরাট এক মগ। একে একে সবাই এগিয়ে এল, মগ থেকে খানিকটা করে ওয়াইন পান করে বলল, 'মৃতের আত্মা শান্তি পাক।'

ছোট আরেক মগ ওয়াইন আর খানিকটা রুটিও রাখা রয়েছে টেবিলের ওপর, কিন্তু কেউ স্পর্শ করল না ওগুলো।

এসময় গির্জার এক কর্মচারী এগিয়ে এল। সেক্সটন বলা হয় এদের।

'পাপ গ্রহীতা কেউ আছে?' জানতে চাইল সে।

ব্যাপারটা হচ্ছে, জাগতিক প্রাপ্তির বিনিময়ে, কোন পাপ গ্রহীতা যদি শেষকৃত্যানুষ্ঠানে ওয়াইন পান করে এবং রুটি খায়, তবে তার মৃত্যুর পর মৃতব্যক্তির পাপের সাজা তাকে ভোগ করতে হবে।

'হায়, খোদা!' কেঁদে উঠল মা। 'বেচারা সার্নের জন্যে কোন পাপ গ্রহীতা নেই!'

অটুট নিস্তব্ধতা। তারপর অচিন্তনীয় এবং ভয়ঙ্কর এক ঘটনা ঘটল।

টেবিলের কাছে হেঁটে গেছে গিডিয়ন।

'এই যে, এখানে পাপ গ্রহীতা আছে,' বলল ও।

'কই? আমি তো কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না,' বলল গির্জার কর্মচারী।

'আমি পাপ গ্রহণ করব,' বলল গিডিয়ন। মগটা তুলে ধরে মার দিকে চাইল, 'আমি পাপ গ্রহীতা হলে আমার নামে ফার্ম সহ যা কিছু আছে সব দিয়ে দেবে তো, মা?'

'না, না, গিডিয়ন!' সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল মা। 'ওকাজ করিস না! পাপ

গ্রহীতাদের ওপর গজব পড়ে!'

'তাহলে আর পাপ গ্রহণের প্রশ্নই উঠছে না,' বলল গিডিয়ন। 'বাবা বরং তার সব গোনা-গাথা নিয়ে দোজখেই যাক।'

'না, না!' মার আর্তচিৎকার শোনা গেল আবার। 'তার আত্মার মাগফেরাত চাই। এখানে পাপ গ্রহীতা আর কেউ না থাকলে তুই-ই না হয় হ।'

'ফার্মটা দেবে তো আমাকে, মা?'

'দেব, বাবা, দেব। ফার্ম নিয়ে আমি কি করব বল, ওসবে আমার কোন লোভ নেই,' বলে উঠল মা। 'সব না হয় তুই নিস।'

তো যেমন কথা তেমনি কাজ। সবার সামনে রুটি খেল এবং ওয়াইন পান করল গিডিয়ন।

'তোমার আত্মা শান্তি পাক, বাবা,' বলল ও। 'তোমার সমস্ত পাপ আজ থেকে আমার। আমি তোমার সমস্ত গোনাহ্‌র জন্যে দায়ী থাকব।'

এরপর কফিন নামানো হলো কবরে এবং সৎকার শেষ হলো।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সবাই সার্নে, অর্থাৎ আমাদের বাসায় ফিরে এল শেষকৃত্য-ভোজের জন্যে।

বাসায় যখন ফিরে এলাম, দেখলাম মিসেস বিগাইল্ডি আগেভাগেই আগুন জ্বেলে রেখেছেন। ওয়াইন গরম করা ছিল। উনি নিজেও কিছু কেক এনে রেখেছিলেন। ফলে খাবারে কমতি পড়ল না।

মিসেস বিগাইল্ডি ভালমানুষ। কিন্তু লোকে তাঁর স্বামীকে বড্ড ভয় পায়—প্ল্যাশের জাদুকর নামে পরিচিত তিনি।

দরজায় দাঁড়াল গিয়ে গিডিয়ন, দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। সার্নের গৃহস্বামী এখন থেকে সে-ই, সবাই স্পষ্ট উপলব্ধি করল।

'খড় কাটা কাল শুরু হচ্ছে,' বলল গিডিয়ন।

'বারোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ আগেই, বাছা,' বললেন পাদ্রী। 'আগামীকাল মানে এখনই। প্রার্থনা করি তোমাদের আজ এবং আগামী দিনগুলো শুভ হোক।'

'আগামীকাল, ওহ্, আগামীকাল!' বলে উঠল জেনসিস বিগাইল্ডি। মুখখানা ওর তরতাজা গোলাপের মত টকটকে দেখাচ্ছে। 'আগামীকাল শব্দটাই আশা জাগায় মনে, স্বপ্ন দেখায়।' গিডিয়নের উদ্দেশে মধুর হাসি ছুঁড়ে দিল ও।

এবার সবাই মিলে পবিত্র গান ধরল, এবং তারপর একে একে বিদায় নিতে লাগল। মা দরজায় দাঁড়িয়ে, কালো কাগজে মোড়া কেক তুলে দিচ্ছে হাতে হাতে।

কিচিরমিচির করছে পাখিরা, পুবাকাশে উঁকি দিচ্ছে সূর্য।

'এখন আর ঘুম আসবে না রে, প্রু,' গিডিয়ন বলল আমাকে। 'চল ফলবাগানে যাই। কথা আছে তোর সাথে।'

দুই

বাগানে বুড়ো এক আপেল গাছের নিচে বসলাম আমরা।

'আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনবি কিন্তু, বুঝলি?' বলল গিডিয়ন।

'আমাদের দু'ভাই-বোনকে সব সময় একসাথে থেকে কাজ করতে হবে।'

'আর মা?' প্রশ্ন করলাম।

'ও, হ্যাঁ, মাকেও। কিন্তু মা তো বুড়ী হয়ে গেছে। আমরা যদি কঠোর পরিশ্রম করি, আমাদের দেখাদেখি সে-ও করবে।'

'আমি কাজকে ভয় পাই না,' ঘোষণা করলাম।

'বাহ্, তবে তো কথাই নেই,' বলল গিডিয়ন। 'করার মত প্রচুর কাজ পাবি, বুঝলি? আমি বহুত টাকা কামাতে চাই, অনেক অনেক টাকা। তারপর ফার্মটা বেচে দেব। লালিংফোর্ডে গিয়ে বড় দেখে একটা বাড়ি কিনব। আমরা বড়লোক হয়ে যাব রে, প্রু, তখন দেখবি আমার কী ক্ষমতা। তোরও জামা-কাপড়, চিনেমাটির জিনিসপত্রের অভাব হবে না। তবে এসব হতে হতে অনেক বছর লেগে যাবে।'

'এখানে, এই সার্নে থাকতে অসুবিধাটা কি?' বিষণ্ণ সুরে শুধালাম। 'আমি বড় বাড়িতে থাকতে চাই না।'

গিডিয়নের চোখজোড়া ধকধক করে উঠল।

'কিন্তু আমার সাথে থাকতে হবে তোকে,' বলল ও। 'বাবা যেটুকু যা করতে পেরেছে তার চাইতে বেশি করব আমি। আমি জোয়ান ছেলে, প্রু, হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতে পারব। তুই আমার পাশে থেকে সাহায্য করবি। আর হ্যাঁ, কোনদিন বিয়ে করবি না তুই।'

'কি বলছ, গিডিয়ন? কেন বিয়ে করব না আমি? সব মেয়েই তো বিয়ে করে—'

'তোকে তো কেউ বিয়ে করতে চাইবে না, প্রু,' বলল গিডিয়ন।

'কেন চাইবে না?'

'মাকে জিজ্ঞেস করিস,' জবাব দিল ও। 'সে হয়তো বলতে পারবে খরগোসটা তার সামনে দিয়ে কেন গেল আর তোর ঠোঁটই বা কাটা হলো কেন।

'যাকগে, কাটা ঠোঁটের কথা এখন ভুলে যা, প্রু,' বলে চলেছে গিডিয়ন। 'আমাদের যখন অনেক সোনা হবে, ডাক্তার দিয়ে তোর ঠোঁট সারিয়ে দেব। অনেক খরচা পড়ে যাবে। কাজেই এখন মন দিয়ে কাজ কর আর আমি যা বলি শুনে যা। কাজে ফাঁকি দিবি না শপথ করতে হবে তোকে, প্রু। বাইবেল ছুঁয়ে শপথ করবি তুই। আমিও করব।'

গিডিয়ন বাসার ভেতর গেল বাইবেল নিয়ে আসতে। আর গাছের নিচে মন খারাপ করে বসে রইলাম আমি। স্বামী-সংসার-সন্তান কি আমার কপালে নেই?

কোন মেয়ে না এ সবের স্বপ্ন দেখে!

ফিরে এল গিডিয়ন। 'বাইবেলটা ধরে থাক, প্রু,' বলল।

'কিন্তু মা কই? সে আসবে না?'

'মা?' বলল গিডিয়ন। 'মাকে দিয়ে কি হবে? এ ফার্ম এখন আমার। বাবার লাশ দাফনের সময় শুনিসনি? তুই কি ভেবেছিস এমনি এমনি বাবার সমস্ত পাপ ঘাড়ে নিয়েছি আমি? এখন আমার সঙ্গে সঙ্গে বল: আজ থেকে বড় ভাই গিডিয়ন সার্নকে মেনে চলতে অঙ্গীকার করছি আমি। সে যা বলবে সব করতে বাধ্য থাকব। চাকরানী হিসেবে তার জন্যে কাজ করব আমি, সে যতদিন চাইবে ততদিন, কোন টাকা-পয়সা নেব না। পবিত্র গ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ করলাম আমি। আমেন।'

ভাইয়ের কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলাম। এরপর গিডিয়ন বাইবেলে হাত রেখে বলল, 'আমার বোন প্রু সার্নের দায়িত্ব গ্রহণ করলাম আমি। আমাদের টাকা-পয়সা হলে সব কিছু তার সাথে ভাগাভাগি করে নেব। এবং বাড়ি বিক্রির পর শপথ করছি তাকে পঞ্চাশ পাউন্ড দান করব, সে যাতে ঠোঁটের চিকিৎসা করাতে পারে। আমেন।'

গিডিয়ন একথাগুলো যখন বলছে, অজানা আশঙ্কায় সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল আমার।

'কিরে, কি হলো?' শুধাল গিডিয়ন। 'শীত করলে ঘরে গিয়ে আগুন জ্বালগে যা। খাওয়ার সময় কথা বলতে পারি আমরা। মা ঘুমাচ্ছে। তোকে আরও অনেক কিছু বলার আছে আমার।'

তো আমি গিয়ে আগুন জ্বাললাম এবং নাস্তার জন্যে টেবিল সাজালাম। টেবিলে ক'খানা গোলাপ রাখলাম। সৌন্দর্যের প্রতি আমার আজন্ম ভালবাসা।

গিডিয়ন গরুদের দুধ দুইয়ে এলে, খেতে বসলাম আমরা। ওর পরিকল্পনা খোলসা করে বলল আমাকে গিডিয়ন।

প্রথমে, মাখন আর পনির তৈরি করা শিখতে হবে আমাকে। তারপর থেকে প্রতিটি হাটবারে আমাদের ঘোড়া বেনডিগোকে লালিংফোর্ডে নিয়ে যাবে গিডিয়ন, সঙ্গে যাবে মস্ত দুই ঝুড়ি ভর্তি মাখন, পনির, ডিম আর মধু।

'তুই কিছু ফুল কুড়াতে পারিস,' বলল গিডিয়ন। 'ওগুলোও বেচতে পারি আমরা। মাঝে মাঝে মুরগির বাচ্চা হাঁস কিংবা মাছও বেচা যায়। দেখিস, প্রু, সব আমরা নিজের হাতে করব আর দু'হাতে টাকা কামাব।'

'কিন্তু যা দূর!' বললাম আমি। 'লালিংফোর্ড যেতে আসতে পুরো ষাট মাইল! তাও আবার একদিনে!'

'কিছু টাকা জমুক,' আমার কথায় কান না দিয়ে বলে যাচ্ছে গিডিয়ন, 'আরেকটা গরু কিনব আমরা। লাঙল দেয়ার জন্যে কয়েকটা বলদ কিনব, জঙ্গলে কিছু শুয়োর রাখব। মা ওগুলো দেখে রাখবে।

'ভেড়াও থাকবে আমাদের,' খই ফুটছে যেন ওর মুখে। 'ওগুলোর পশম থেকে তুই আর মা সুতো কাটতে পারবি। সে সুতো বেচে দেব আমরা।

'জমিতে বীজ বুনব আমি, একরকে একর ফসল ফলাব,' বলল গিডিয়ন:

'শস্যের দাম এখন কম। কিন্তু লোকে বলাবলি করছে সরকার ট্যাক্স বসাবে এর ওপর।'

'তাহলে তো শস্যের দাম বেড়ে যাবে,' বললাম আমি। 'ময়দার দাম বাড়বে ফলে রুটি দুর্মূল্য হয়ে যাবে। সে তো খুব খারাপ কথা।'

'মানুষের জন্যে হয়তো খারাপ,' বলল গিডিয়ন। 'কিন্তু আমাদের জন্যে ভাল। শস্যের জন্যে ভাল দাম পাব আমরা। কত টাকা হাতে এসে যাবে ভেবে দেখ।

'শোন এখন, তুই প্ল্যাশের মিস্টার বিগাইল্ডির কাছে যাবি,' আরও বলল গিডিয়ন।

'কেন? ওখানে কি করতে যাব?' অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম। কারণ বাবার মত গিডিয়নও ভদ্রলোককে দু'চোখে দেখতে পারে না।

'কেন? সে তোকে লিখতে পড়তে শেখাবে। হিসেবপত্র কিভাবে রাখতে হয় তাও,' জবাবে বলল গিডিয়ন।

শুনে খুব ভাল লাগল আমার। লেখাপড়া শেখার ইচ্ছে কার না থাকে? তখনকার দিনে ক'জনই বা লিখতে পড়তে জানত?

'উনি রাজি হলে বেতন দেব কিভাবে?' প্রশ্ন করলাম।

'কেন, তুই তার বাগান খুঁড়ে দিবি, জমি চষে দিবি,' বলল গিডিয়ন। 'তুই কাজের মেয়ে, আর বিগাইল্ডি একটা কুঁড়ের হদ্দ। কুটোটা নাড়ে না সারাদিনে। তোর ওই কালো পোশাকটা পরে আজ সন্ধেতেই চলে যা না।'

গিডিয়ন এরপরে কাস্তে হাতে খড় কাটতে গেল।

সেদিন বিকেলে, গরুর দুধ দোয়ানো শেষে, ওপরতলায় গিয়ে কাজের পোশাক ছাড়লাম আমি। পরে নিলাম সেরা পোশাকটা। এটা পরার সুযোগ ঘন ঘন আসে না। লম্বা, বাদামী থোকায় চুল বাঁধলাম।

নিচে নেমে আসতে মা বলল, 'খুব সুন্দর হয়েছে তো চুল বাঁধাটা, প্রু, তোকে এই পোশাকে দারুণ মানিয়েছে। তুই দেখি কোন্ ফাঁকে বড় হয়ে গেছিস।'

তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলল মা।

'খোদা, খরগোসটা কেন আমার রাস্তায় পড়ল? সেজন্যে কি আমি দায়ী?'

'মা, ওমা, কেঁদো না। শোনো, মা, আমার কথা শোনো। আমার ঠোঁট কাটা তো কি হলো, পরোয়া করি না আমি।'

তারপর এক ছুটে বাড়ির বাইরে চলে গেলাম, কাঁদছি। মিথ্যে বলেছি মাকে—পরোয়া না করে পারি?

মাঠ-ময়দান ধরে ছুটছি, মনে পড়ল গিডিয়নের কথাগুলো। ওহ্, লেখাপড়া শিখব আমি। আর ঠিক মত তা শিখতে পারলে কিছুটা হলেও কর্তৃত্ব ফলাতে পারব গিডিয়নের ওপর। তারপর তো বাড়ি বেচলে পঞ্চাশ পাউন্ড দেবে বলেছে। শারীরিক ত্রুটিটা সারিয়ে নিলেই অপরূপা এক পরী হয়ে যাব। তখন আর পায় কে আমাকে! সুদর্শন এক যুবক এসে বিয়ে করবে আমাকে, তারপর কোলে বাচ্চা—স্বামী, সংসার, সন্তান সবই হবে আমারও।

খুশিতে নাচতে নাচতে, প্ল্যাশে গিয়ে পৌঁছলাম। বিগাইল্ডিদের পাথুরে

বাড়িটার অর্ধেকটা গুহার মত আর বাকিটা মানুষের বাসা।

বাড়ির বাইরে, জেনসিসকে দেখতে পেলাম। সোনালী চুল ঝিকমিক করছে ওর, মুখখানা ফুলের মত নিষ্পাপ।

'আরে, খুব সুন্দর করে চুল বেঁধেছ তো, প্রু!' বলে উঠল ও প্রশংসার সুরে। 'ইস, আমিও যদি ওভাবে থোকা করতে পারতাম।'

'চাইলে করে দেব,' বললাম। কিন্তু ও এমনিতেই যা সুন্দরী, ওর এসবের প্রয়োজন পড়বে না।

বাড়িতে ঢুকে গলা ছাড়লাম, 'মিস্টার বিগাইল্ডি! আমি আপনার কাছে লেখাপড়া শিখতে এসেছি। তার বদলে আপনার কাজ করে দেব। গিডিয়ন আমাকে পাঠাল···আমাদের যখন অনেক টাকা হবে, মস্ত বড় একটা বাড়ি হবে···'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' বললেন বিগাইল্ডি। 'আগে লেখাপড়া তো করো। আমার কথা মত চলতে হবে তোমাকে, নইলে পড়াব না।'

মিসেস বিগাইল্ডি চেয়ে আছেন আমার দিকে বিস্ময়মাখা চোখে।

'তুমি কি পারবে, বাছা?' জিজ্ঞেস করলেন। আর সবার মত তাঁরও ধারণা, আমার যেহেতু সামান্য শারীরিক ত্রুটি রয়েছে, ঘটে বুদ্ধিও কম থাকবে।

'পারবে না কেন, ও যথেষ্ট চালাক-চতুর মেয়ে,' সামাল দিলেন মিস্টার বিগাইল্ডি। 'ও খুব ভাল ছাত্রী হবে। আমি বলে দিলাম, মিলিয়ে নিয়ো। আগামী হপ্তা থেকে পড়াশোনা শুরু করব আমরা, কেমন, প্রু?'

বাড়ি ফিরে এলাম। নিজেকে বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা মনে হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে সেরা পোশাক পরে জাদুকর বিগাইল্ডির কাছে পাঠ নিতে যাব। হুঁ, হুঁ, বাবা, বিদুষী নারী বলবে লোকে প্রু সার্নকে!

বাড়িতে ঢুকতে মা চোখ তুলে চাইল। গিডিয়ন কোথায় জানতে চাইলাম।

'চাঁদের আলোয় খড় কাটছে,' বলল মা। 'কাজে এমনই মন বসেছে ওর—'

তো, খেতে চলে গেলাম। প্রচুর পরিমাণ খড় কেটে ফেলেছে এরইমধ্যে গিডিয়ন।

'খাবে এসো,' বললাম আমি।

'ও, ফিরেছিস?' বলল গিডিয়ন। 'মুরগিগুলোকে খোঁয়াড়ে ভরা হয়েছে?'

'না।'

'শিগগির ভরগে যা। এক ঘণ্টা আগেই কাজটা করে ফেলা উচিত ছিল। ফাঁদগুলো দেখেছিস?'

'না, আমি ভেবেছিলাম তুমি দেখবে'

'খড় কাটলে আর সব কাজ করব কখন,' বলল গিডিয়ন। 'খোঁয়াড় আর ফাঁদের কাজটা সেরে, হ্রদে ছিপ ফেলগে। আমার কাঠ কাটতে হবে।'

'ছিপ ফেলতে অনেক সময় লাগে, আর আমি তেমন একটা ভাল পারিও না,' কান্না পেয়ে গেল আমার। রাত হয়ে গেছে, আর ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।

'পরিশ্রম করবি কথা দিয়েছিলি, মনে নেই?'

'আছে, গিডিয়ন, আছে।'

'তাহলে কথা রক্ষা কর।'

গিডিয়ন যা যা বলেছে সবই করলাম। কিন্তু চোখের পানি তো বারণ মানে না। ইস, সহজ কোন উপায়ে যদি ঠোঁট সারিয়ে নিয়ে, পরীর মত সুন্দরী হতে পারতাম!

শুরু হয়ে গেছে আমার কঠিন সময়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়ায় হাতে খড়িও হলো। মন যখন খারাপ থাকে, চিলেকোঠায় উঠে যাই। গিডিয়নের কাছ থেকে, খামারের কাজ থেকে অনেক দূরে বসে থাকি চুপ করে।

জানালা আর তাঁতের মাঝখানে বসে, হাতের লেখা মক্স করি আর বাইবেল পাঠ করি।

তিন

এভাবে কটে গেল তিন বছর। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের কথা মাঝেমধ্যে শুনতে পাই। স্থলে-জলে সমানে নাকি লড়াই চলছে। আঠারোশো পনেরোর এক সন্ধেয়, তখন গরমকাল, ওয়াটারলুর মরণপণ যুদ্ধ ও যুদ্ধ বিজয়ের খবর শুনলাম। আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনে কিন্তু কোন পরিবর্তন নেই। তবে, সে বছরই আমাদের জীবন বদলে দিল ভিন্ন ধরনের এক খবর। শস্যের ওপর নয়া কর বসিয়েছে সরকার।

'এক মগ এল নিয়ে আয়, প্রু!' তাজা খবর নিয়ে বাজার থেকে ফিরে হাঁক ছাড়ল গিডিয়ন। 'অনেকদিন এত ভাল খবর শুনিনি। সমস্ত জমি চাষ করে শস্য বুনব। করের কারণে দাম চড়ে যাবে ফসলের। তারপর আর পায় কে আমাদের।'

তারমানে আগের চাইতেও কঠোর শ্রম দিতে হবে! গত ক'বছর, সেই ভোর থেকে নিয়ে যে রাত অবধি কাজ করে চলেছি, তার চাইতেও বেশি খাটুনি। ওফ!

পরিষ্কার টের পাচ্ছি কেবলমাত্র টাকার জন্যে ভূতের বেগার খেটে চলেছে গিডিয়ন। আমার মত ভালবাসা নেই ওর এসব খেত-খামারের প্রতি। টাকা চাই ওর ধনী হওয়ার জন্যে–উন্মুখ হয়ে আছে, এই ফার্ম ছেড়ে দিয়ে, তথাকথিত ভদ্রলোকদের মত লালিংফোর্ডে কবে উঠে যাবে।

দিনকে দিন মাথায় বেড়ে উঠছি আমি–এবং প্রচণ্ড পরিশ্রম আমাকে হাড্ডিসার করে দিয়েছে। ওদিকে আরও লম্বা-চওড়া হয়েছে গিডিয়ন। পরিণত হয়েছে সুদর্শন সুপুরুষে;

শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি হচ্ছে আমাদের ফার্মে। এক পাল ভেড়া আর শুয়োর এখন আমাদের। মা ওগুলো দেখে শুনে রাখে। কিছুদিন পর, একজোড়া বলদ কেনার পয়সা হলো আমাদের– খেতে লাঙল দেব।

'লালিংফোর্ডে যখন বলদ কিনতে যাব,' বলল গিড়িয়ন। 'তুইও যেতে পারিস। দোকানগুলো ঘুরে দেখতে পারিস। যে বাড়িটা কিনব সেটা এবার তোকে দেখাব। তবে তার এখনও অনেক দেরি।'

পরম আগ্রহে যাত্রার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাবা মারা যাওয়ার পর

আর লালিংফোর্ড যাওয়ার সুযোগ ঘটেনি। লালিংফোর্ড চিরদিনই আকর্ষণ করে আমাকে।

'কিন্তু যাব কিভাবে?' প্রশ্ন করলাম।

গিডিয়নের পেছনে, আমাদের ঘোড়াটার পিঠে বসে যেতে পারি না, কারণ বড় বড় ঝুড়ি বোঝাই মাল যাচ্ছে হাটে বিক্রির জন্যে।

'বিগাইল্ডির খেত থেকে শস্য কুড়াতে পারিস,' বলল গিডিয়ন। 'ওগুলো বিক্রি করলে যে পয়সা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে মিলারের ঘোড়াটা ভাড়া করা যায়।'

'কিন্তু জেনসিস যদি নিজেই শস্য কুড়াতে চায়, তখন?'

'বোকার মত কথা বলিস না। জেনসিস কুড়াবে শস্য! আলসের ধাড়ি একটা। ও দেখতে সুন্দর বলে ওকে পছন্দ করি। কিন্তু মেয়েটা কোন কম্মের নয়।'

বাবার মৃত্যুর পর থেকে, টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না গিডিয়ন। অবশ্য এখন প্রায়ই জেনসিসের কথা শোনা যায় ওর মুখে। রবিবারে, গিডিয়ন যেদিন কাজ করে না, দেখা করে ওরা।

মিসেস বিগাইল্ডির মুখে শুনেছি, প্রতি রোববার গিডিয়ন যায় তাঁদের বাড়িতে। ও দরজায় টোকা দিলে, জেনসিস সাড়া দেয়। তার পরনে থাকে সেরা গাউনটা। সেটলে বসে ওরা। মিস্টার বিগাইল্ডি রাগ রাগ চোখে লক্ষ করেন ওদেরকে। জেনসিস একটা চাষাকে বিয়ে করুক চান না তিনি। মেয়েকে নিয়ে অন্য পরিকল্পনা আছে তাঁর।

কিন্তু মিসেস বিগাইল্ডির সায় রয়েছে ওদের মেলামেশায়। রোববার হলেই, স্বামীকে বাড়ি ছাড়া করার চেষ্টা করেন তিনি। একবার তো, গোলাঘরের ছাদে আগুনই লাগিয়ে দিয়েছিলেন! ছোটাছুটি করে পানি এনে আগুন নেভাতে হয় মিস্টার বিগাইল্ডিকে।

শেষে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে বিগাইল্ডি গিডিয়নকে ওমুখো না হওয়ার জন্যে শাসিয়ে দেন। তারপর থেকে ওদের দেখা-সাক্ষাৎ হতে থাকে জঙ্গলে, কিন্তু ওদের অভিসারের কথা অজানা থাকেনি বিগাইল্ডির।

গিডিয়ন জেনসিসকে ভালবাসে আমার বিশ্বাস। কিন্তু হাতে টাকা-পয়সা না জমা পর্যন্ত বিয়ে করবে বলে মনে হয় না। কথাটা গোপন না করে জেনসিসকে সে খোলাখুলি জানিয়েও দিয়েছে।

বড়দিন প্রায় এসে পড়েছে, এসময় প্রথমবার হাটে যাওয়ার কপাল হলো আমার। ভোর চারটেয় বিছানা ছাড়লাম। বাড়ি গোছগাছ করে, বাজারে বিক্রির মালপত্র বেঁধেছেঁদে তৈরি হলাম।

টিভি, সেক্সটনের মেয়ে, সারা দিন মার সাথে থাকবে। আগেভাগেই চলে এল ও, গিডিয়নকে ভালবাসে কিনা। জেনসিসকে ভয়ানক ঈর্ষা করে মেয়েটা। জাদুকরের মেয়ে বলে ডাকে। কিন্তু ওর কথায় কর্ণপাত করে না গিডিয়ন। জেনসিস ছাড়া আর কাউকে বোঝে না সে।

সূর্য সবে উঠছে এমনিসময় আমরা যাত্রা করলাম। আমাদের ঘোড়া বেনডিগোর পিঠে চেপেছে গিডিয়ন। আর আমি সওয়ার হয়েছি মিলারের পনির

পিঠে। নীলচে পাহাড়সারির দিকে চাইলাম। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। কিন্তু গিডিয়ন বারবার পেছনে প্ল্যাশের উদ্দেশে মুখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে। জেনসিসের কথা ভাবছে ও।

সকাল সকালই পৌঁছনো গেল লালিংফোর্ড। ওটার সুবিশাল রাস্তা-ঘাট শান্ত, সমাহিত। রাস্তার এক প্রান্তে দীর্ঘ বুরুজ নিয়ে গির্জাটা দাঁড়িয়ে।

অনেক দোকানপাট এখানে, নানা ধরনের জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে। রাস্তার অপর প্রান্তে কামারশালা। কামারের উষ্ণ, আন্তরিক শিখাগুলো দেখে কি ভালই না লেগেছিল মনে আছে এখনও।

কামারশালার কাছে, এক সার কটেজ। এর একটা তাঁতির। কিন্তু বুড়ো তাঁতি মারা গেছে। এখন কে থাকে এখানে কে জানে। তাঁতির ভাতিজা তার চাচার ব্যবসায় বসেছে শুনেছিলাম।

তাঁতির কুটির দক্ষিণমুখো এবং দেয়ালে লতিয়ে উঠেছে একটা আঙুর গাছ। একবার ঢুকেছিলাম ওই কটেজটার ভেতর, সে অনেক দিন আগে। আলোকিত সিটিংরুমে বসানো মস্ত তাঁতটার কথা মনে আছে। বাড়ির পেছনে ছিল ছোট্ট একফালি সবুজ আঙিনা। আর সব বাড়ির চাইতে আমার চোখে আলাদা দেখিয়েছিল এটাকে। কিন্তু কেন তা জানি না।

গির্জা-নির্ধারিত চত্বরে হাট বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাটিতে ঝুড়ি নামালাম আমরা এবং শীঘ্রিই শুরু হয়ে গেল বেচা-কেনা। হৈ-হল্লা চলছে, নানা রঙের কাপড় পরে রাজ্যের লোক এসেছে—সে এক অন্যরকম আনন্দের দিন। প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে গির্জায়।

সব বিক্রি-বাটা সেরে ভাবলাম সরাইখানায় গিয়ে ঢুকি। খিদে পেয়েছে। সরাইয়ের বাইরে বসে ছিল জনা কয় বয়স্ক লোক। এল খাচ্ছে আর গান গাইছে।

আমি আর গিডিয়ন ওদের পাশ কাটাতে, গান বন্ধ হয়ে গেল। নীরবে সবাই আমার কাটা ঠোঁটের দিকে চেয়ে রয়েছে।

'ও আশপাশে থাকলে পান কোরো না,' বলল এক বুড়ো। 'এল আর এল থাকবে না, বিষ হয়ে যাবে।'

সরাইয়ের ভেতর, চোখের পানি লুকোতে খাবারের প্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়লাম আমি।

এ সময় এক তরুণী—স্কয়্যারের আত্মীয়া—ভেতরে প্রবেশ করল। লালরঙা লম্বা এক রাইডিং কোট গায়ে তার। দীর্ঘাঙ্গী, সুন্দরী এক মেয়ে। চোখের মণিজোড়া কয়লার মত কালো কুচকুচে।

ঘরের চারধারে নজর বুলাতে আমার ওপর চোখ পড়ল ওর। এবার হেসে উঠে বলল ও, 'এই যে, সরাইঅলা, একটা ঝাড়ুর হাতল দাও দেখি।'

বুড়ো লোকগুলোর সঙ্গে কথা হয়েছে এই মেয়ের বুঝতে পারছি আমি। মার কাছে শুনেছিলাম ঝাড়ুর হাতলের কথা তোলার অর্থ, আকারে-ইঙ্গিতে বোঝানো, আমি একটা ডাইনী।

তরুণী মেয়েটি মিস ডোরাবেলা, স্কয়্যারের মেয়ে। ঘরের ওপ্রান্তে, যেখানে ওর ভাই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে হেঁটে গেল সে।

'কে ওই ঠোঁট কাটা মেয়েলোকটা?' গলা চড়িয়ে বলল মেয়েটা।

ওর ভাই মাথা নেড়ে গিডিয়নকে দেখাল আর ওকে আস্তে কথা বলতে বলল। গিডিয়নকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি, 'আরে, সার্নের ছেলে না?'

গিডিয়ন উঠে দাঁড়াতে ওর উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে দিল ডোরাবেলা।

'শিগ্‌গিরিই নির্বাচন হতে যাচ্ছে,' বলল মেয়েটা। 'তুমি বাবার হয়ে কাজ করবে না, সার্ন? নাকি পাহাড় পর্বতে নেচে বেড়াবে তোমার এই বউটাকে নিয়ে? ওফ, তোমার হাতে ঝাড়ুর হাতল থাকলে যা মানাবে না! আর জোছনা রাত হলে তো কথাই নেই।'

মেয়েটির কথার মর্মার্থ বুঝতে কষ্ট হয়নি গিডিয়নের। রাগে জ্বলছে ওর দু'চোখ। মেয়েটির দিকে চেয়ে পরিষ্কার উচ্চারণে আস্তে আস্তে বলল, 'ম্যাম, ও আমার আপন বোন। ডাইনীদের সাথে পাহাড়ে নাচার ইচ্ছে হলে নাচব। হান্ট বল-এ ভদ্রমহিলাদের সাথে নাচতে চাইলেও নাচতে পারি। কি করব সে আমার ব্যাপার। কিন্তু তোমাকে যে পার্টনার হতে বলব না এতে সন্দেহ নেই।

'আর স্কয়্যারকেও সম্ভবত ভোট দিচ্ছি না এবার। যে লোক নিজের মেয়েকেই শাসন করতে পারে না সে দেশ চালাবে কিভাবে? ছোটবেলায় তোমাকে সে চাবকে মানুষ করেনি কেন ভেবে দুঃখ হয়।'

ডোরাবেলার ভাই এবার ওকে ডেকে নিয়ে সরাই ত্যাগ করল। গিডিয়ন বসে পড়ে মন দিল খাওয়ায়। কিন্তু আমার মন এতটাই খারাপ হয়ে গেছে, গলা দিয়ে কিছু নামল না।

গিডিয়ন এরপর গেল নিজের কাজে আর আমি গেলাম দোকানে বেড়াতে। বড়দিনের জন্যে কিছু টুকিটাকি উপহার কিনলাম।

এবার ঝুড়িতে সব জিনিস ভরে বেনডিগোর পিঠে বেঁধে দিলাম। তারপর গিডিয়ন ফিরে এলে সে আর আমি যার, যার ঘোড়ায় চাপলাম। রাস্তাটা ধরে শহরের অপরপ্রান্তে নিয়ে এল আমাকে গিডিয়ন। এ রাস্তা আমাদের বাড়িমুখো নয়, ফলে এটায় আগে কখনও চলিনি।

প্রকাণ্ড দুই ফটকের ভেতর দিয়ে ঢুকে ড্রাইভ ধরে এগিয়ে চললাম আমরা। ড্রাইভের শেষ মাথায় আরেকটা গেট। এই গেটের ভেতর দিয়ে বিশাল এক সুরম্য দালান চোখে পড়ে।

এ বাড়ি একদিন আমাদের হবে,' বলল গিডিয়ন। আবেগে কেঁপে উঠল গলা।

প্রকাণ্ড দরজাটার দু'পাশে চারটে করে জানালা। ওগুলোর ওপরে আরও আটটা এবং ছাদে আরও অনেকগুলো জানালা। বাড়িটা কেমন অন্ধকার মত, ফলে যত বড় আর যত সুন্দরই হোক না কেন বিষণ্ণতা যেন চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে।

এক বুড়ো থাকে এখন এখানে, বলল গিডিয়ন। 'আর ধর, দশ বছরের মধ্যে বুড়ো মরবে। ততদিনে এটা কিনে নেয়ার মত টাকা আমাদের হাতে জমে যাবে।'

'বুড়ো তো মিস ডোরাবেলার চাচা, তাই না?' বললাম। 'চাচা মারা গেলে ওর

ভাই, ক্যাম্পারডাইন থাকবে না এখানে?'

'না, এখানে ও থাকতে চাইবে না। বাড়িটা বেচে দেয়া হবে। আমাদের তাই বেশি বেশি কাজ করে টাকা জমানো উচিত, বুঝলি?'

বন্ধ গেটের কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা হলাম আমরা। সরাইতে আবার যখন গেলাম, সবাই যে যার বাসায় চলে গেছে। জ্বলজ্বলে, গরম আগুনের পাশে বসে রইলাম দু'ভাই-বোনে।

একটু পরে, ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগল গিডিয়ন।

'তোর জানা থাকা দরকার জেনসিসকে কতটা ভালবাসি আমি,' বলল ও। 'বিগাইল্ডি আমাকে তাড়িয়ে দেয়ার পর থেকে ওর প্রতি দুর্বলতা আরও বেড়ে গেছে আমার।

'কখনও কখনও তো এমনও মনে হয়- ভবিষ্যতের সব চিন্তা-ভাবনা ছেড়েছুড়ে দিই। তাই তোকে ওই বাড়িটা দেখাতে নিয়ে গেছিলাম।'

'যাতে ওটার কথা ভুলে না যাও?'

'হয়তো তাই। আমি তোর কাছ থেকে কিছু লেখাপড়া শিখব, প্রু। তখন আমার দাম আরও বেড়ে যাবে, লোকে আমাকে সম্মান করে চলবে। কে জানে, একদিন হয়তো স্কয়্যারের মেয়েকেই বিয়ে করে বসব!'

'কি! মিস ডোরাবেলাকে?'

'অসুবিধে কি? ও তো ভদ্রঘরের মেয়ে, তাই না? কখনও রাগ হয় ওর ওপর, আবার কখনও কখনও ভালও তো লাগে। তাই ভেবে রেখেছি প্রয়োজনে জেনসিসকে ত্যাগ করব। আর কেউ বিয়ে করতে পারে ওকে। বাচ্চা-কাচ্চা হলে, যার সাথেই বিয়ে হোক, সুখী হবে ও।'

'হুঁ, তোমার পরিকল্পনায় সবাই ঠাঁই পেয়েছে দেখতে পাচ্ছি,' বললাম ব্যথিত স্বরে।

আমার ভাই শক্তিশালী ছেলে জানি, কিন্তু এতখানি কঠোর হৃদয় জানা ছিল না।

'নারে,' খেই ধরল গিডিয়ন। 'জেনসিসকে ছাড়ব না। ওই বাড়িটাও কিনব। দুটোই আমার চাই। জেনসিসকে নিয়ে হান্ট বলে যাব। সিল্কের খুব সুন্দর একটা পোশাক পরে থাকবে ও। মিস ডোরাবেলা আমার প্রতি আগ্রহ দেখালে ওকেও গ্রহণ করব। তবে বিয়ে করব না। জাদুকরের মেয়েকে বিয়ে করব আর রক্ষিতা হবে স্কয়্যারের মেয়ে।'

টেবিলে দুম করে এক ঘুষি মারল গিডিয়ন।

'তুমি আমার ভাই হলে কি হয়, খুব কড়া লোক,' বললাম আমি।

'হয়তো। কিন্তু আমি নিজেকে পাল্টাতে পারব না, প্রু। আমি এভাবেই জন্মেছি। কেউ আমাকে বদলাতে পারবে না।'

তারপর পাক্কা একটি ঘণ্টা নিশ্চুপে বসে রইল গিডিয়ন। শেষ পর্যন্ত মুখ খুলল ও। 'হ্যাঁ, আমি জেনসিসকে বিয়ে তো করবই ওই বাড়িটাও কিনব। একাজে সফল হওয়ার চেষ্টা করতে করতে মরে যেতেও রাজি আছি আমি।'

উপলব্ধি করলাম, সামনে আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎ-গিডিয়ন, মা আর

আমার–এবং বেচারী জেনসিসেরও।

সার্ন মেয়ারে পৌঁছতে পৌঁছতে মধ্যরাত পেরিয়ে গেল। বাড়ির জানালায় আলো দেখে গিডিয়ন বলল, 'সময়টা তোর ভাল কেটেছে আশা করি।'

'আহ্, সে আর বলতে। তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব, গিডিয়ন ভাইয়া।'

'আমাকে সাহায্য করবি তো?'

'কেন, প্রতিজ্ঞা করিনি বুঝি?'

'কিন্তু সে তো জেনসিসের সঙ্গে প্রেমের আগেকার কথা।'

'জেনসিসের ব্যাপারে আমার আপত্তি নেই,' বললাম। 'কাজ করব আমি–হাড়ভাঙা খাটুনিকে ভয় পাই না।'

মা আর টিভি অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্যে। মার চোখে পানি। তাঁর ধারণা হয়েছিল এত দেরি হচ্ছে যখন, আমরা বুঝি সার্ন মেয়ারে ডুবে মরেছি।

'আমি রাতটা থেকে যাব,' বলল টিভি। 'এখন আর বাসায় ফেরার উপায় নেই। তোমার সাথে থাকব আমি, প্রু।'

গিডিয়নের দিকে চাইল টিভি। ওর চোখের ভাষায় বোঝা গেল কী পরিমাণ কামনা করে ও গিডিয়নকে। কিন্তু গিডিয়ন ওর দিকে ভুলেও দৃষ্টিক্ষেপ করল না। মনস্থির করে ফেলেছে সে, জেনসিসকে বিয়ে করবে।

টিভির সঙ্গে শোয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। কাজেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বাবার পুরানো শীপস্কিন কোট আর লণ্ঠনটার ব্যবস্থা করলাম। চিলেকোঠায় উঠে গিয়ে, গরম কোটটায় শরীর মুড়ে নিলাম। তারপর লিখতে শুরু করলাম আমার খাতাটাতে। সেদিন যা যা ঘটেছে সব টুকে ফেললাম। ভুলে যেতে চাইলাম দুঃখজনক মুহূর্তগুলো।

আমার যেহেতু কোন প্রেমিক নেই, আমি চাই গোটা দুনিয়া আমাকে ভালবাসুক। কিন্তু নিজেকে যখনই উপস্থাপন করি, হেসে উঠে মুখ ফিরিয়ে নেয় পৃথিবী।

চার

বড়দিন এল আবার চলেও গেল। সার্নে কোন অতিথি আসেনি। মা অসুস্থ ছিল। আমাকে বাসায় থাকতে হয়েছে সেবা-শুশ্রূষার জন্যে।

নববর্ষের দিন, প্ল্যাশে গেলাম পাঠ নিতে। তার আগে বিগাইল্ডির জমি চষে দিলাম। তুষার জমা লাল মাটির বুকে বলদ চালনা করা রীতিমত কষ্টকর কাজ।

লাঙল চষা শেষ হয়েছে যেই অমনি দেখা জেনসিসের সঙ্গে। বাড়ি থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছে, ওর মাও রয়েছে সঙ্গে। দু'জনেই মহা উত্তেজিত। ঠাণ্ডা বাতাসে গোলাপরাঙা জেনসিসের মুখখানা। এক মাথা হলদে চুল, মেয়েটিকে ঠিক

যেন এক অপরূপা পরী মনে হচ্ছে।

'প্রু, প্রু!' চেঁচাচ্ছে জেনসিস, 'গিডিয়ন কথা দিয়েছে আমাকে বিয়ে করবে! হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ওহ্, প্রু, আমি যে আজ কত খুশি!'

'ভেতরে এসো তোমরা, বাছা,' মিসেস বিগাইন্ডি বললেন। 'চা করি আমি।'

বাড়ির ভেতর গিয়ে আমরা আগুন ঘিরে বসলাম। মিস্টার বিগাইন্ডিকে খবরটা মোটেও খুশি করতে পারেনি। ভয়ানক ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছে তাঁকে।

'যাও, এখানে বসে না থেকে তোমার বইপত্র পড়োগে,' স্বামীকে বললেন মিসেস বিগাইন্ডি। 'বিয়ের ঝক্কি কি কম নাকি বাবা!'

'আমার সামনে ওসব বিয়ে-ফিয়ের কথা বলবে না!' গর্জন ছাড়লেন মিস্টার বিগাইন্ডি। 'তোমাকে বলে দিলাম, এই বিয়েতে আমার সায় নেই। বুড়ো সার্ন আমাকে দেখতে পারত না, ওর ছেলেও পারে না। তাছাড়া, আমার এত সুন্দরী মেয়ে চাষার ঘরে যাবে কোন দুঃখে? যে কোন তরুণ জমিদার বিছানায় ওর সঙ্গ পেলে ধন্য হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, সঙ্গ পেলে–কিন্তু বিয়ে করবে না!' পাল্টা গর্জালেন মিসেস বিগাইন্ডি।

'তাতে কি? পয়সা তো দেবে!' কেউ কিছু বলতে পারার আগেই গজগজ করতে করতে নিজের কামরায় চলে গেলেন বিগাইন্ডি।

বাবার অমতের কথা শুনে তখন কাঁদতে বসেছে জেনসিস। ওকে সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিয়ে চা পান করতে বসলাম আমরা। নানারকম পরিকল্পনা ঘুরছে মাথার মধ্যে।

'লাভ-স্পিনিঙের ব্যবস্থা তো করতেই হবে, বললেন মিসেস বিগাইন্ডি। 'যাদের যাদের চিনি সবাইকে দাওয়াত দেব। তুমি চিঠি লিখে দিয়ো কিন্তু, প্রু। তাঁতিকেও আসতে বলতে হবে। দু'তিন দিন থেকে বিয়ের চাদর বুনে দিয়ে যাবে।

'কেকও বানাতে হবে,' বলে চলেছেন সোৎসাহে মিসেস বিগাইন্ডি। 'কেক বেচা টাকা দিয়ে তাঁতির পারিশ্রমিক মেটাব।'

আনন্দে আত্মহারা জেনসিস হাততালি দিয়ে উঠল।

বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হলে, সব চাষী বউ-মেয়ে একত্র হয়ে সুতো কাটে; বহুদিনের পুরানো চল এটা। সুতো বুনে তারপর তৈরি করা হবে কাপড়। সেই কাপড় দিয়ে বর-কনের জন্যে তৈরি হবে নতুন নতুন বিছানার চাদর।

'ওহ্, লাভ স্পিনিং!' চেঁচিয়ে উঠল জেনসিস। 'কী মজাই না হবে। শুধু কি তাই, সঙ্গে কেকিঙও! ওহ্, ভাগ্যিস আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে গিডিয়ন।'

কেকিঙও অতি প্রাচীন এক রীতি। প্রায় উঠেই গেছে এর রেওয়াজ। এক ধরনের জুয়াই বলতে হবে একে, টাকার পরিবর্তে কেক দিয়ে খেলা হয় কিন্তু সেকালের মহিলারা অসম্ভব উপভোগ করত খেলাটা।

'শোনো, প্রু,' বললেন মিসেস বিগাইন্ডি, 'চিঠি যখন লিখবে, উল্লেখ করতে ভুলো না জেনসিস বিগাইন্ডি সার্নের গিডিয়ন সার্নকে বিয়ে করতে যাচ্ছে। ছেলে সার্নে, নিজের জমিতে বাস করে। আর এও জানিয়ো, খুব শিগগিরি বিয়েটা যে হতে যাচ্ছে।'

বিগাইন্ডি তাঁর ঘরের দরজা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে গর্জে উঠলেন, 'লিখে দিয়ো

তোমরা আহাম্মকের দল! এই বিয়ে হওয়ার আগেই শুকিয়ে যাবে সার্ন মেয়ার। কি মনে করেছ আমাকে? আমি প্ল্যাশের জাদুকর, ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি দিব্য দৃষ্টিতে।'

আমি কতখানি লাঙল চষেছি বলার পর খানিকটা শান্ত হলেন বিগাইল্ডি। আমাকে যথারীতি পড়ালেন তিনি। লোকটাকে একটুও ভয় করে না আমার।

'জেনসিসকে কিছু বলবেন না, মিস্টার,' চলে আসার আগে বলে এলাম। 'গিডিয়নের মত ছেলেকে বিয়ে করলে এমনিতেই বেচারীর দুঃখের শেষ থাকবে না। বিয়েটা ঠেকাতে চেষ্টা করলে হয়তো ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু জবাব দিলেন না বিগাইল্ডি।

মিসেস বিগাইল্ডি লাভ স্পিনিঙে অতিথিদের দাওয়াত দিলেন। প্রচুর কেক বানালেন উনি, মহিলাদের কাছে কেক প্রতি এক পেনি করে বেচবেন বলে। এক সকাল সুতো কাটার পর, কেকের জন্যে জুয়া খেলতে বসব আমরা এবং ভাল জুয়াড়ী জিতে নিতে পারবে এক ঝুড়ি কেক। আমরা, মানে মহিলারা এতটাই একঘেয়ে, বিরক্তিকর জীবন যাপন করি, কেকিঙ যে কারণে আ সব কিছুর চাইতে উত্তেজনাকর আর প্রিয় আমাদের কাছে।

মার শরীর সেবারের শীতে তেমন সুবিধের ছিল না, কিন্তু তাই বলে লাভ স্পিনিঙে যাবে না তাও কি হয়?

মা আর আমি সবার আগে পৌঁছলাম প্ল্যাশে। মিস্টার বিগাইল্ডি বাসায় ছিলেন না, ফলে আমাদের আনন্দ মাটি করবেন সে ভয় নেই। জেনসিস দৌড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে স্বাগত জানাল। শীঘ্রি আর সব মহিলারা এসে পড়ল, মোট হলাম গিয়ে বারোজন। তখুনি লেগে পড়লাম কাজে। আমাদের চরকা মৃদু গুঞ্জন তুলল। এরপর জেনসিস গান ধরলে সবাই গলা মেলালাম।

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল, এবং কামরায় এক ঝলক সূর্যকিরণ এসে পড়ল।

এক যুবক দাঁড়িয়ে দরজায়, আমাদের দিকে চেয়ে। একে আগে কোন দিন দেখিনি আমি। প্রথম দর্শনেই, কেন কে জানে, ছেলেটার প্রেমে পড়ে গেলাম!

সবাই আমরা নিশ্চুপ। ছেলেটা তার হ্যাট খুলে বলল, 'এই অধম আপনাদের গোলাম, ভদ্রমহিলারা। আমি তাঁতি।'

ওকে কেমন দেখাচ্ছিল? আমার পক্ষে বলা শক্ত, ভালবাসার দৃষ্টি চিরদিনই অন্ধ হয় কিনা। কিন্তু ঘরের সব ক'জন মহিলা সুতো কাটা থামিয়ে নীরবে চেয়ে রইল ওর দিকে।

এক কোণে বসে রইলাম আমি, দেখা যাতে না যায় আমাকে। আহা, এই যুবকটিকে প্রেমিক এবং স্বামী হিসেবে যদি একান্ত আপনার করে পেতাম। কিন্তু আমি চাইলেই তো আর হবে না। ঠোঁট যার কাটা তাকে কোন দুঃখে ভালবাসবে ওর মত একটা সুদর্শন ছেলে?

আমরা মুখে তালা মেরে বসে আছি দেখে হেসে ফেলল যুবক বলল, 'আমার নাম কেস্টার উডসীভস, আপনাদের তাঁতি।'

মিসেস বিগাইল্ডি এবার তাকে ফায়ারপ্লেসের কাছে এনে খাবার আর পানীয়

দিলেন। আমি সরে রইলাম দূরে ওর চোখে যেন না পড়ি।

'ওহ্, মিস্টার উডসীভস, বলল জেনসিস। 'আপনি এসেছেন বলে আমি খুব খুশি হয়েছি। প্রু আপনাকে দাওয়াতপত্র লিখলে আসবেন তো আমার বিয়েতে?'

'আসব হয়তো,' স্মিত হেসে বলল তাঁতি। 'প্রু কে এখানে, চিঠি লিখতে পারে?'

জেনসিস জবাব দেয়ার আগেই, মেষপালকের স্ত্রী ফেলেনা ঝুঁকে পড়ল সামনে।

'স্যার,' বলল, 'আপনি কি বিবাহিত?'

'হুঁ, না, বিবাহিত নই।' একটু থতমত খেয়ে গেছে তাঁতি বেচারা।

'কাউকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছেন?'

'না, দিইনি,' বলল তাঁতি। 'আমি একা মানুষ বেশ ভালই আছি।'

তো সুতো কাটা শুরু হলে, সবাই মন দিল কাজে। একটু পরে, মিসেস বিগাইল্ডি তাঁতিকে নিয়ে গেলেন চিলেকোঠায়, তাঁতটা আছে ওখানে।

ভদ্রমহিলা নিচে ফিরে এসে বললেন, 'সুতো কাটার জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ। যে পরিমাণ সুতো জমেছে তাতে ওই ছেলের দু'তিনদিন নাক-মুখ দিয়ে উঠে যাবে। বিগাইল্ডি ফেরার আগে আমরা বরং কেকটা করে ফেলি।'

আমরা টেবিলে বসলে পর, প্রকাণ্ড এক ডিশ নিয়ে এলেন মিসেস বিগাইল্ডি, কেকের পাহাড় ওটার ওপর।

মেষপালকের স্ত্রী ফেলেনা বসেছে আমার পাশে।

'কেকের খেলা খেলার বয়স আর আমাদের নেই, প্রু সার্ন, বলল ও। 'এসো ভান করি আমরা তাঁতির ভালবাসা কামনা করে খেলছি।'

'তাঁতির ভালবাসা দিয়ে আমার কি?', বললাম। যুবকটি সম্পর্কে ওভাবে তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলতে রীতিমত বুক ফেটে গেল আমার।

'আরে আরে,' মৃদু হেসে বলল ফেলেনা, 'তোমার গাল অমন লাল দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ লাগছে?'

জবাব দিলাম না। রাগ হচ্ছে, আবার খুশিও। সুন্দরী ফেলেনা আমাকে হিসেবে ধরছে। আমারও যে ভালবাসার, ভালবাসা পাওয়ার মন আছে তার স্বীকৃতি পেলাম ওর কাছে।

'তাঁতির মত লোককে নিয়ে জুয়া খেলা যায়,' খেলা শুরু হলে বলল ফেলেনা।

ওরকম কোন পুরুষের জন্যে জুয়া খেলার অর্থ নেই, নিজেকে মনে মনে শোনালাম। তবে তার জন্যে জীবন বাজি রাখা যায় নির্দ্বিধায়!

জুয়া খেলায় সবাইকে হারিয়ে দিলাম আমি, জিতে নিলাম সব কিছু।

বিদায়ের ক্ষণে, মিসেস বিগাইল্ডি ধন্যবাদ জানালেন মেহমানদের। তারপর মার দিকে ফিরলেন।

'অনেক সুতো হয়েছে,' বললেন, 'আর কেক যা বেচেছি তাতে তাঁতির পাওনা মিটিয়ে দিতে পারব। আপনার ছেলেকে বলবেন, মিসেস সার্ন, কনে আর তার কাপড় তৈরি আছে। ও বললেই বাসর শয্যা বানিয়ে ফেলা যায়।'

বাড়ি ফিরে দেখি, গিডিয়ন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে।

'সময়টা খুব ভাল কাটল আজ,' মা বলল ওকে। 'বহুদিন মনে থাকবে। প্রু তার ওপর খেলায় জিতেছে। কেকগুলো দেখ্ না!'

সন্তুষ্ট দেখাল গিডিয়নকে।

'আর তাঁতি ছেলেটার সাথেও পরিচয় হলো,' মা বলছে। 'খুব ভাল ছেলে! যে কোন মার গর্বে বুক ফুলে উঠবে অমন ছেলে পেলে।'

'ও, কেস্টার উডসীভস,' বলল গিডিয়ন। 'ও নাকি ভাল কুস্তি লড়ে। লেখাপড়াও জানে।'

'ওকে তোর কেমন লাগল রে, প্রু,' মা প্রশ্ন করল। 'ওর সাথে কথা বলেছিস? তুই ওভাবে লুকিয়ে রাখলি কেন নিজেকে?'

'কেমন লেগেছে?' আস্তে করে বললাম। 'ওহ্, কেমন আর...' থেমে গেলাম, অনুভূতি প্রকাশ করা চলবে না কিছুতেই।

'তুই তো ক্লান্তিতে প্রায় ঘুমিয়েই পড়ছিস,' বলল গিডিয়ন। 'যা শুতে যা, নইলে কাল আর কাজ করতে পারবি না।'

কিন্তু কিসের ক্লান্তি, আমি আসলে খুশিতে আর উত্তেজনায় ফুটছি টগবগ করে। বাইবেলে আছে: 'স্বামী এসেছে।' হ্যাঁ, কেস্টার উডসীভস আমার স্বামী, এবং তুচ্ছ এ জীবন একমাত্র ওর পদতলেই সঁপে দেব আমি। কথাগুলো এতই মনে ধরল, সুন্দর হস্তাক্ষরে খাতায় লিখে রাখলাম।

পাঁচ

পরদিন খুব ভোরে, জেনসিস দৌড়তে দৌড়তে আমাদের বাসায় এসে হাজির।

'আমি এখন কি করব?' বলে উঠল। 'ওহ্, খোদা কি হবে আমার? সার্ন শুনলে কি বলবে? ওহ্, কেন যে আমি জাদুকরের ঘরে জন্ম নিলাম!'

'শান্ত হয়ে বসো, জেনসিস,' বললাম আমি। 'কি হয়েছে খুলে বলো। তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বাবার সাথে গতকাল স্কয়্যারের ছেলে ক্যাম্পারডাইনের দেখা হয়েছে,' বলল ও। 'বাবা তাকে বলেছে সে ভালবাসার দেবী ভেনাসকে ডেকে আনতে পারে, ক্যাম্পারডাইন বলেছে সত্যি সত্যি পারলে বাবাকে নগদ পাঁচ পাউন্ড দেবে!'

'তো, তাতে তোমার অত চিন্তার কি হলো, জেনসিস?'

'আরে, আমাকেই তো ভেনাস সাজতে হবে!' কান্নামাখা কণ্ঠে বলল ও। 'জমিদারের ছেলেকে বাবা খুশি করতে চায়। ঘটনাটা পরশু দিন ঘটতে যাচ্ছে, প্রু!'

'কিন্তু তোমাকে কি করতে বলছে তোমার বাবা?'

'আমাকে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হবে আলোর নিচে, ঠিক ভেনাস দেবীর মত। তোমার ভাই যদি জানতে পারে আমি একাজ করেছি, তবে জীবনে আর

আমার মুখ দেখবে না।'

'তাহলে না করলেই হয়।'

'যখনই বারণ করি বাবা মারধর শুরু করে। পাঁচ পাউন্ডের লোভে পেয়েছে তাকে। আমি এখন কি করি, বলো তো?'

'প্রদর্শনীটা তোমার বাবা কিভাবে করবে ভাবছে?' ধীরে ধীরে জানতে চাইলাম। 'জমিদারের ছেলে জানবে না কে তুমি?'

'আমার মুখ নাকি দেখা যাবে না,' বলল জেনসিস। 'লাল আলো আর ধোঁয়ার ব্যবস্থা থাকবে। আমাকে গায়ে দড়ি পেঁচিয়ে তলকুঠুরিতে দাঁড়াতে হবে। বাবা দড়ি ধরে টানলে ট্র্যাপ ডোর দিয়ে তার ঘরে উঠে আসব আমি। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, তারপর আবার নেমে যাব নিচে।'

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে মৃদু স্বরে বললাম, 'তুমি গিডিয়নকে ভালবাস?'

'বলে বোঝাতে পারব না কতখানি ভালবাসি।'

'তাঁতি যাচ্ছে কবে?'

'তাঁতি?' জেনসিস বিস্মিত। 'সে তো আগামীকাল যাবে।'

'বেশ, তবে তোমার হয়ে কাজটা আমিই করব।'

'তুমি!' বিস্ময়ে বিস্ফারিত জেনসিসের চোখজোড়া।

'হ্যাঁ, আমি—প্রু সার্ন। সুন্দরী দেবী সাজতে পারলে মজাই হবে আমার জন্যে। কিন্তু কেউ জানবে না। তোমার বাবা থাকবে রান্নাঘরে। মুখ-মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখব আমি, জমিদারের ছেলে নগ্ন মেয়ে দেখতে এসেছে, দেখবে। আর টাকা পেলে তোমার বাবাও খুশি।'

'ওহ্, প্রু, তুমি এত ভাল! তোমাকে আমি কত যে ভালবাসি,' বলে উঠল জেনসিস। 'আর এতে তোমার কোন ক্ষতিও হবে না, কারণ কেউ তো ভালবাসবে না তোমাকে।'

'যাও তো এখন,' হঠাৎই মেজাজটা গরম হয়ে গেল। 'এব্যাপারে কাল কথা হবে, এখন যাও—জলদি!'

ক্যাম্পারডাইনের ভেনাস দর্শনের সময় এসে গেল, ভয়ে আর লজ্জায় মরার দশা আমার।

কিন্তু ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে যখন টেনে তোলা হলো আমাকে, হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। প্রু সার্ন, শয়তানের ছাপ যার মুখে জন্মগত, সে কিনা অভিনয় করছে প্রেমের আর সৌন্দর্যের দেবীর ভূমিকায়!

লাল আলো গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে রয়েছি, মুখ মাথা কাপড়ে ঢাকা, তরুণ জমিদার সামনে ঝুঁকে পড়ে দু'হাত বাড়াল আমার উদ্দেশে।

ঘরের ওপ্রান্ত থেকে একটা শব্দ ভেসে আসতে, ঝট করে মুখ ফেরালাম আমি। যা দেখলাম তাতে বুক চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল প্রায়, ওখানে বসে রয়েছে আমার প্রিয়তম কেস্টার উডসীভস!

ওহ্, এ কেমন দুর্ভাগ্য আমার! যাকে মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, সব সময় তার কাছ থেকেই কিনা নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হয়।

তাঁতিও সামনে ঝুঁকে এসেছে। আমার ঠোঁট কাটা তো কি হয়েছে, সে রাতে দু'জন যুবক আমার অনিন্দ্য সুন্দর দেহসৌষ্ঠব আবিষ্কার করল।

আমার প্রাণপ্রিয় স্বামী যখন আমাকে লক্ষ করেছে, কামনা করেছে, তখন কি আমার লজ্জা পাওয়া সাজে?

ওঘরে মাত্র এক মিনিট থাকতে হলো আমাকে। তলকুঠুরিতে নামতে শুনি বিগাইন্ডি বলছেন, 'কই, আমার পাঁচ পাউন্ড বের করুন।'

ক্যাম্পারডাইন তার জবাবে বলল, 'পাঁচ পাউন্ড কেন, তার বেশিই প্রাপ্য হয় আপনার।'

কাপড় পরে নিয়ে এক ছুটে বাড়ি ফিরে এলাম। জেনসিসের সঙ্গে কথা বললাম না।

সে রাত থেকে, নিজেকে তাঁতির বউ কল্পনা করি। বাড়িতে কিংবা খেতে যে কাজই করি না কেন মনে পড়ে কেবল কেস্টার উডসীভসের হাসিমাখা মুখখানা।

শীতকাল তখনও যায়নি, সার্ন মেয়ারের পানি এখন বরফ। কিন্তু আমার হৃদয়ে বসন্ত এসে গেছে, খাতায় লিখলাম: 'বসন্তের আজ প্রথম দিন। আমার স্বামী আমাকে দেখেছে, পছন্দ করেছে।'

শীতের দিনগুলো কঠোর পরিশ্রম করলাম আমি আর গিডিয়ন। জমি চষে গেলাম শুধু, কেননা শস্য ছাড়া আর কিছু বুনবে না গিডিয়ন।

'নয়া আইনে শস্যের দাম চড়ে যাবে,' গিডিয়ন প্রায়ই বলে আমাকে। 'ফসল বড় হলে আমরা বড়লোক হয়ে যাব, প্রু। তখন আর এখানে পড়ে থাকে কে, এখানকার কথাও আর মনে পড়বে না।'

'আমি তোমাকে বুঝি না, গিডিয়ন,' বলি আমি। 'তুমি এত খাটুনি দাও অথচ জমি-জমার প্রতি তোমার কোন ভালবাসা দেখি না।'

'না, টাকাও ভালবাসি না আমি।'

'তাহলে কি চাও তুমি, গিডিয়ন?'

'আমি সব কিছুতে একনম্বর হতে চাই, সব কিছু জিতে নিতে চাই। খোদা আমাকে এভাবেই তৈরি করেছে, আমি কখনোই বদলাব না। তুই এ নিয়ে এত ভাবিস কেন, প্রু? আমরা সুন্দর ভবিষ্যতের জন্যে কাজ করছি, ঠিক কিনা?'

'কিন্তু ভবিষ্যৎ কখনও পরিকল্পনা করে ঠিক করা যায় না।'

'ভবিষ্যৎ গড়ে নিতে হয়,' বলল গিডিয়ন। 'আমি আমার ভবিষ্যৎ জানি এবং সেজন্যে কাজ করতেও একপায়ে খাড়া।'

পরে, মাকে বললাম গিডিয়নের কথাগুলো।

'আমার আর পরিশ্রমের বয়স নেই,' দুঃখিত শোনাল মার গলা। 'তুই ওকে বলে দিস, প্রু, শুয়োরগুলোর দেখাশোনা করা আর সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। লেকে যখন খুশি নেমে পড়ে জানোয়ারগুলো, আমার পা ভিজে ভীষণ ঠাণ্ডা লাগে।'

পুরো শীতকালটাই মার খারাপ কেটেছে। পরদিন সকালে, গিডিয়নের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললাম।

'গিডিয়ন,' এভাবে শুরু করলাম। 'মার শরীর ভাল না। তার বিশ্রাম দরকার।

শুয়োরগুলোর জন্যে একটা ছেলে রেখে দাও।'

'বললেই হলো রেখে দাও?' গর্জে উঠল গিডিয়ন। 'আমাকে হুকুম দিস এতবড় সাহস! টাকা গাছে ধরে? এ বাড়ির কর্তা কে, আমি না তুই?'

'কিন্তু তাই বলে মার দিকে খেয়াল দেবে না?' পাল্টা বললাম। 'মা যদি মরে যায়? তারচাইতে একটা ছেলে রাখো।'

কঠোর চোখে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে গিডিয়ন।

'অত ছেলে ছেলে না করে একটা বিয়ে করলেই তো পারিস। তাকে চাকর খাটাস। মানে কেউ যদি তোকে বিয়ে করে আরকি!'

পিঠ ফেরালাম আমি। ওর নির্দয়-নিষ্ঠুর কথাগুলো ভুলতে বহুদিন লেগেছিল আমার।

অবশেষে, বসন্ত এল। গরম হাওয়া বইছে। ফুল ফুটছে গাছে গাছে। প্রায়ই লাঙল চষতে গিয়ে আপন মনে গান গেয়ে উঠি। মার মনও এখন আগের চাইতে ভাল।

বসন্তের শেষাশেষি, এক বিকেলে, জানালার পাশে বসে চা খাচ্ছি, মা ফস করে বলে বসল, 'তাঁতিকে আনাব ভাবছি।'

শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল আমার, কিন্তু চুপ করে রইলাম।

'মিস্টার উডসীভসকে ডাকব,' বলল মা। 'সেরা জিনিস চাই আমি।'

ব্যস, হয়ে গেল। স্বপ্নে ভালবাসার জাল বুনে চললাম আমি। কেস্টার এলে নিশ্চয়ই চিলেকোঠায় বসে কাজ করবে। ওখানে হাঁটাহাঁটি করবে সে, উঁকি দেবে জানালা দিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা, এতদিন হৃদয়ে ছিল; এবার চোখের সামনে দেখতে পাব ওকে।

মা চশমা পরে একদৃষ্টে দেখছে আমাকে। হাসল একগাল। বোদ্ধার হাসি।

পরদিন, ডেইরীতে মাখন তৈরি করছি এমনিসময় জেনসিস এসে হাজির।

'ওহ্, প্রু!' বলল সে। 'জমিদারের ছেলেকে দেখলাম বাবার সাথে কি সব আলোচনা করছে। ওর ধারণা, এমনকি বাবারও, যে আমিই ভেনাস। ছেলেটা এখন আমাকে কাছে পেতে চায়। আমি রাজি না হলে, বাবা নাকি আমাকে দূরে কোথাও ডেইরীমেইডের কাজ করতে পাঠাবে। তিন বছরের আগে আর ফেরা যাবে না। গিডিয়নকে বলো না বিয়েটা এখনই সেরে ফেলুক।'

মাথা নাড়লাম আমি।

'ও রাজি হবে না,' বললাম। 'তোমার কোলে বাচ্চা আসবে। গিডিয়নের তখন পয়সা খরচা হবে তার পেছনে।'

'ওহ্, তবে কি করব আমি?'

সে মুহূর্তে, ডেইরীতে এসে ঢুকল গিডিয়ন। সুদর্শন গিডিয়ন ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। জেনসিস যে পাগল হয়ে গেছে একে বিয়ে করতে সেজন্যে তাকে দোষ দেয়া যায় না। বেচারী হাবুডুবু খাচ্ছে গিডিয়নের প্রেমে।

জেনসিসের উদ্দেশে চাইল গিডিয়ন। মাখনের রং মেয়েটির হলদে চুলে। গোলাপী গালদুটো গোলাপের মতই অপূর্ব লাগছে ওকে।

'এত সকাল সকাল এখানে যে?' প্রশ্ন করল গিডিয়ন।

'একটা কথা ছিল,' চট করে বলল জেনসিস। তারপর থেমে গিয়ে আমার দিকে চাইল।

'বিগাইল্ডি ওকে বেচে দিতে চায়, গিডিয়ন,' বললাম আমি। 'জমিদারের ছেলের হাতে ফুর্তির জন্যে তুলে দিতে চায়।'

'কি! আমার প্রেমিকাকে বেচে দেবে? আমি খুন করব ব্যাটাকে!'

'এখনও বেচেনি,' বললাম। 'কিন্তু জেনসিস রাজি না হলে ওকে মেলায় পাঠাবে। তিন বছরের জন্যে ভাড়া করা হবে ওকে। লালিংফোর্ড থেকে বহুদূরে কোন খামারে বাস করতে হবে বেচারীকে।'

'আমি যাব না গিডিয়ন!' আকুল স্বরে বলল জেনসিস। 'আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

গিডিয়ন কি বলে শোনার জন্যে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু সে বোবা মেরে আছে।

'জেনসিসকে যেতে দিয়ো না, গিডিয়ন,' বললাম।

জেনসিস প্রেমিকের হাত টেনে নিয়ে চুমু খেল।

'আমি তোমার কাছে কাছে থাকতে চাই, লক্ষ্মীটি।'

গুঙিয়ে উঠল গিডিয়ন।

'তুমি আমাকে ফকির বানানোর তাল করছ,' বলল ও। 'তোমাকে এখন বিয়ে করলে আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বহু বছরের জন্যে হাত খালি হয়ে যাবে আমার। তাছাড়া, তোমাকে ক্যাম্পারডাইনের কাছ থেকে সরিয়ে নিলে ওর সাথে আমার শত্রুতা পয়দা হবে। ব্যাটা হঠাৎ করে তোমার জন্যে এমন খেপে উঠল কেন?'

জেনসিস চাইল আমার দিকে। কিন্তু সত্যি কথাটা বলতে পারলাম না আমি।

'তোমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একটু শুধু পিছিয়ে যাবে, গিডিয়ন,' বললাম মৃদু সুরে। 'টাকা দেখবে হাতে ঠিকই এসে গেছে এক সময়।'

'না,' বলল ও। মুখের চেহারায় কাঠিন্য। 'বিয়ে এখন হবে না। তিন বছর অপেক্ষা করব আমরা। এছাড়া উপায় নেই।'

আমরা তিনজন দাঁড়িয়ে রইলাম ওখানে। একটু পরে জেনসিসের দিকে এক পা আগে বাড়ল গিডিয়ন। আশা করলাম, ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু সে তার বদলে বলল, 'তিন বছর বেশি সময় না, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ততদিনে, আমাদের সমস্ত জমিতে অনেক ফসল ফলবে আর যা বুনব তার সুফল ঘরে উঠবে; অবস্থা পাল্টে যাবে আমাদের, এরকম থাকবে না।'

'ঘরে দুঃখ আর অভিশাপ না এলেই হয়,' বললাম আমি। 'শস্য সোনা আনবে ঠিকই, কিন্তু আমার বড় ভয় করে। আমি বইতে পড়েছি, সোনা অনেক সময় সর্বনাশ ডেকে আনে, জিনিসটা দামী বটে, তবে একইসঙ্গে ক্ষতিকরও। হয়তো আমাদের ধ্বংস করে দেবে।'

'তোর যা খুশি ভাবগে,' বলল গিডিয়ন। 'আমার কাছে সোনা সোনাই। আর মনে করিস না বিগাইল্ডিকে আমি ভয় পাই। এই রবিবার দেখিস ওকে কেমন

দু'কথা শুনিয়ে দিই।'

'মানুষ কেন যে প্রিয়জনদের নিয়ে মিলেমিশে থাকতে পারে না!' বলে উঠল জেনসিস। 'তুমি এত পাষাণ কেন, সার্ন?'

দরজার দিকে ভগ্নহৃদয়ে এগিয়ে গেল মেয়েটি।

'ওই শোনো, বাতাস জোরাল হচ্ছে,' বলল ও। 'আমাদের সবার কপালে দুর্ভোগ আছে, দেখে নিয়ো।'

গিডিয়ন ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল, কিন্তু তাই বলে মত পাল্টাল না।

শেষমেষ, জেনসিস নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'যাই। আলো মরে গেছে। চোখে অন্ধকার দেখছি আমি। কালো এক রাস্তা পানিতে নেমে গেছে দেখতে পাচ্ছি। আমাকে ওই রাস্তায় পাঠিয়ো না, সার্ন, দোহাই তোমার।'

পরমুহূর্তে বিদায় নিল ও, ঝড়ো বাতাস সয়ে একাকী হেঁটে চলল আঁধার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে।

ছয়

আজ মে দিবস, মজুর ভাড়া করার মেলা বসেছে। বাজারে বেচার মত প্রচুর জিনিস রয়েছে আমাদের। কাজেই মিলারের পনি ভাড়া নিয়ে সাত সকালে গিডিয়নের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম।

ফুলের সুবাসে চারদিক ম ম করছে। বাতাস নেই, ভোরের পবিত্র আলোয় সব কিছু স্বচ্ছ, তরতাজা।

'জেনসিস বেচারী আজ রাতে কোথায় ঘুমাবে কে জানে,' বললাম আমি।

'গ্রিম্বলের খামারে,' গিডিয়নের জবাব।

'মেলা বসার আগেই জানলে কিভাবে?'

'মিসেস গ্রিম্বল ডেইরীমেইড খুঁজছে জানি আমি,' বলল গিডিয়ন। 'অনেক দূরের পথ। ক্যাম্পারডাইন ওখানে ওর নাগাল পাবে না।'

'বেচারী ভীষণ একা হয়ে পড়বে।'

'তুই আমার হয়ে চিঠি লিখবি,' বলল গিডিয়ন।

'তা না হয় লিখব,' বললাম। 'কিন্তু ও জবাব দেবে কিভাবে?' গিডিয়নের মত জেনসিসও বকলম, পড়তেও জানে না।

মৃদু হাসল গিডিয়ন।

'সে আমি ভেবে রেখেছি,' বলল। 'গ্রিম্বলের খামারটা এতই বড় যে তাঁতিকে দু'এক মাস পরপরই নিয়ে যায়। তাঁতি লিখে দেবে ওর হয়ে।'

'মিস্টার উডসীভসের কথা বলছ?' প্রশ্নের জবাবে সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল গিডিয়ন।

বাহ্, আজব তো! আমার ভাইয়ের হয়ে প্রেমপত্র লিখব আমি। আর যাকে ভালবাসি সেই মানুষটা ওগুলো পড়ে, জবাব দেবে আমার পড়ার জন্যে।

মনে মনে এবার সাজিয়ে ফেললাম পরিকল্পনা। আমার মনের সমস্ত কথা উজাড় করে লিখব–এমন সব বিষয় গিডিয়ন যেগুলো কখনও বলবে না কিংবা ভাববে না। কেস্টার উডসীভস আমার মনের কথা পড়ে তারপর নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে জবাব দেবে!

ব্যাপারটা এতই অদ্ভুত আর জটিল, হো হো করে হেসে উঠলাম হঠাৎ।

লালিংফোর্ড পৌঁছে দেখি, মেলা সবে আরম্ভ হচ্ছে। জেনসিসকে নিয়ে ইতোমধ্যেই তার বাপ হাজির। মেয়েটির হাতে দুধ দোয়াতে বসার টুল। অসম্ভব সুন্দর লাগছে ওকে দেখতে।

গ্রিম্বল আর তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিল ও।

'স্বামী-স্ত্রীকে তেমন নরম স্বভাবের মানুষ মনে হচ্ছে না,' বললাম আমি। 'ওকে ওদের কাছে যেতেই হবে, গিডিয়ন?'

'ওদের বিরাট খামার। বেশি পয়সা দেবে। টাকাটার কথাই আগে ভাবতে হবে আমাদের।'

খালি সোনা, আর সোনা। এই সোনাই একদিন আমাদের সোনার সংসার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক না করে দেয়।

গিডিয়ন এগিয়ে গিয়ে গ্রিম্বলদের সঙ্গে কথা বলল, বেতন সম্পর্কে। জেনসিস বাবার উদ্দেশে গলা ছেড়ে বলল, 'মিসেস গ্রিম্বল আমাকে কাজে নিচ্ছেন, বাবা।'

'ও, তাই বুঝি,' বলে এগিয়ে এলেন বিগাইল্ডি। 'এই তিন বছরের বিনিময়ে আমি কি পাচ্ছি?' মিসেস গ্রিম্বলকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আঠারো পাউন্ড।'

'বিশ দিন, ওকে নিয়ে যান। জোয়ান মেয়ে, প্রচুর খাটাতে পারবেন, প্রয়োজনে ধোলাই দেবেন।'

'আমার প্রেমিকার গায়ে ফুলের টোকাও যদি পড়ে,' গর্জন ছাড়ল গিডিয়ন। 'তোমাকে আমি ছাড়ব না, বিগাইল্ডি। আর টাকা পেলে জেনসিস পাবে, তুমি কেন?'

'তুমি ফোপর দালালি করতে এসেছ যে বড়, কে তুমি?' পাল্টা চেঁচালেন জাদুকর। 'গিডিয়ন সার্ন, পাপ গ্রহীতা, অভিশপ্ত লোক!'

জবাবটা হাতে হাতে দিল গিডিয়ন, বিগাইল্ডি প্রচণ্ড এক ঘুষি খেয়ে ছিটকে পড়লেন।

'এর প্রতিফল তুমি পাবে, সার্ন!' দাঁতের ফাঁকে উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ। 'তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি আমি। মাঠে-বাড়িতে গজব পড়বে তোমার ওপর। আগুন আর পানির নামে আমি শাপ দিচ্ছি তোমাকে! এই মুহূর্ত থেকে, তোমার কোন কাজই সফল হবে না।'

গিডিয়ন আগেই ঘুরে দাঁড়িয়ে রওনা দিয়েছিল, বিগাইল্ডির কথা শোনেনি।

ও আমাকে যে মস্ত দালানটা দেখিয়েছিল, জেনসিসকে সেটা দেখাতে নিয়ে গেল। যে বাড়িতে জেনসিস একদিন রাণীর মত বাস করবে।

বাজারে রয়ে গেলাম আমি। জিনিসপত্র আমাদের হু-হু করে বেচা সারা।

লালিংফোর্ডে সেদিন মেলা লোক এসেছে, বুল-বেইটিং দেখবে বলে। একটা খুঁটির সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা হয় একটা ষাঁড়কে, এবং একপাল হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেয়া হয় ওটার বিরুদ্ধে। বড় নিষ্ঠুর খেলা, মানুষ কি যে এত মজা পায়!

শীঘ্রিই মানুষজন হাট ত্যাগ করতে লাগল। আমি বসে রয়েছি গিডিয়নের অপেক্ষায়।

মিসেস গ্রিম্বল আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

'ওই ডেইরীমেইডের প্রেমিকের বোন না তুমি?' বললেন। 'ওদের বিয়ে হচ্ছে বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ভাল, খুব ভাল,' বললেন মিসেস গ্রিম্বল। 'মেইডদের প্রেমিক থাকলে আমার আপত্তি নেই–তারা যদি বহু দূরে থাকে আরকি।' এবার আমার ঠোঁটের দিকে চেয়ে আরও বললেন, 'এরকম অভিশপ্ত জীবন বড় দুঃখজনক।'

দিনটা আঁধার হয়ে গেল। চোখের পানি লুকাতে মুখ ফিরিয়ে নিলাম চট করে।

ফাঁকা রাস্তা ধরে হেঁটে এদিকেই আসছে এক যুবক। লোকটা আর কেউ নয়–কেস্টার উডসীভস।

সবুজ কোট, ওয়েস্টকোট আর কালো হ্যাটে দারুণ মানিয়েছে তাকে।

'তাঁতি, তাঁতি!' হাঁক ছাড়লেন মিসেস গ্রিম্বল। 'আমাদের ওখানে কবে আসছ আবার?'

আমাদের কাছে হেঁটে এল ও। এত দ্রুত উঠে পড়লাম আমি, এক পাত্র ফুল উল্টে পড়ে গেল। দৌড় দিয়ে একটা ওয়াগনের পেছনে গিয়ে লুকালাম। তাঁতিকে কোনমতেই আমার চেহারা দেখানো চলবে না!

'কি হলো মেয়েটার?' চেঁচিয়ে উঠলেন মিসেস গ্রিম্বল। 'জোয়ান ছেলে দেখলে মেয়েরা কোথায় দাঁড়িয়ে থাকবে তা না, পালাচ্ছে।'

'কে মেয়েটা?' কেস্টার প্রশ্ন করল। ওর কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

'ওই যে, ফ্রু সার্ন, গিডিয়ন সার্নের ছোটবোন। ঠোঁট কাটা। সেজন্যেই হয়তো অমন...কেউ কেউ বলে ও নাকি ডাইনী...'

কেস্টারের মুখে কথা নেই, তবে ফুলগুলো পাত্রে তুলে রাখছে। একটু পরে গলা চড়িয়ে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'ওর ফিগারটা কিন্তু দুর্দান্ত।'

অন্তর থেকে প্রাণঢালা ধন্যবাদ জানালাম ওকে।

'বুল বেইটিঙে যাচ্ছ?' মিসেস গ্রিম্বল প্রশ্ন করলেন।

'এর উত্তর হ্যাঁ, না দুটোই হতে পারে।' মৃদু হেসে বলল তাঁতি।

'মানে?'

'শীঘ্রিই দেখতে পাবেন। আসি, মিসেস।'

রাস্তা বরাবর হেঁটে চলল তাঁতি।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে এলাম ওয়াগনের পেছন থেকে। কেস্টার উডসীভসকে অনুসরণ করছি।

শহরের বাইরে, সবুজ যে ময়দানটিতে খেলাটা হবে সেদিকে হেঁটে যাচ্ছে ও।

বনেটে মুখ ঢেকে, অনুগমন করছি আমি।

মাঠ দর্শকে গিজগিজ করছে। শিকলে বাঁধা এক ষাঁড় কুকুরদের কামড় খাবে তাই দেখার জন্যে কিনা মানুষের এত উৎসাহ, হতাশ মনে ভাবলাম।

মাঠের মধ্যখানে মিস্টার ক্যালার্ডের সাদা ষাঁড়টাকে দেখা গেল। একটা খুঁটিতে বাঁধা। চারধারে দর্শকদের চেঁচামেচি, বাচ্চাদের হৈ হল্লা আর কুকুরের তর্জন গর্জন। কেস্টারকে জনতার মাঝে দেখে ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালাম।

কেস্টারের মত মানুষ এখানে কি করছে তাই ভাবছি। এটুকু বুঝতে পারছি, নিষ্ঠুর আনন্দ নিতে আসতে পারে না ও। এবং মন বলছে আমার, ওর কাছে কাছে থাকা উচিত। আজ আমার সাহায্য ওর দরকার পড়বে, কেন জানি মনে হচ্ছে।

সাত

কয়েকজন লোক জটলা করে দাঁড়িয়ে, তাদের সবার সঙ্গে একটা-দুটো করে কুকুর। লোকগুলোর চেহারা যেমন কুৎসিত তেমনি নিষ্ঠুর। কুকুরগুলোও মনিবদের চাইতে কম যায় না। ঝকঝকে তীক্ষ্ণ দাঁত খিঁচোচ্ছে, দেখলে আত্মার পানি শুকিয়ে যায়।

কেস্টার ওদিকে পা বাড়াতে সব ক'জনের চোখ ওর দিকে ঘুরে গেল।

হাগলেট, লম্বা, মোটা কৃষকটি, কেস্টারের উদ্দেশে চাইল।

'তোমার কুকুর কই, মিস্টার?' জিজ্ঞেস করল। হাগলেট ধরে রয়েছে দুটো হিংস্রদর্শন কুকুর।

'ও, তাঁতি যে,' বললেন মিস্টার গ্রিম্বল। 'কই হে, তাঁতি, তোমার কুকুর দেখছি না যে?'

'নেই।'

'কুকুর নেই? তাহলে এখানে কি, সরো, সরে দাঁড়াও। খেলা এখুনি শুরু হবে।'

কিন্তু এক পা নড়ল না কেস্টার। সটান দাঁড়িয়ে সে, বুক চিতিয়ে। দর্শকদের দিকে একবার নজর বুলিয়ে কুকুরঅলাদের উদ্দেশে চাইল।

'এ খেলা বন্ধ করো তোমরা,' বলল ও।

দীর্ঘ নীরবতা। এবার অট্টহাসি হেসে উঠল হাগলেট। মুচকি হাসি মিস্টার গ্রিম্বলের ঠোঁটেও।

'বন্ধ করব?' খেঁকিয়ে উঠল হাগলেট। 'ষাঁড়ের খেলা? কেউ এ খেলা বন্ধ করতে পারবে না।'

'আমি চাই পুরো ইংল্যান্ডে এ খেলা বন্ধ হোক,' শান্ত স্বরে বলল তাঁতি।

'কেন, জানতে পারি?' মিস্টার গ্রিম্বলের প্রশ্ন।

'কারণ এটা খেলা না, নিষ্ঠুরতা।'

'মোটেই না। কুকুররা খেলাটা ভালবাসে। ষাঁড়ও!' গর্জাল হাগলেট।

'জন্তু-জানোয়ারের কথা ছাড়ো,' বলে উঠলেন গ্রিম্বল। 'আমি ভালবাসি। ব্যস, আমার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট।'

'বেইটিং বন্ধ করতে চাইছ কেন তুমি?' মিস্টার ক্যালার্ড জবাব চাইল।

'আগেই তো বললাম,' উত্তর দিল তাঁতি। 'দেখুন, মিস্টার ক্যালার্ড, ষাঁড়টা আপনার। ওটা বেচবেন আমার কাছে? ভাল দাম পাবেন।'

'তা হয় না,' জবাব দিল মিস্টার ক্যালার্ড। 'আরে বাপু, ষাঁড়টা জিততে পারলে কড়কড়ে বিশটা পাউন্ড পকেটে আসবে।'

'আমি আপনাকে বিশ পাউন্ড দেব। আর ষাঁড়টা ফাও, ওটাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবেন।'

ক্যালার্ড অবাক চোখে কেস্টারের দিকে চেয়ে, মুখে বাক্য সরছে না। কিন্তু তার স্ত্রী ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে বলল, 'টাকাটা নিয়ে নাও। তারপর ষাঁড়টা নিয়ে চলো বাড়ি যাই।'

'এহ্, বাড়ি নিয়ে যাবে! দাঁড়াও। আমাদের খেলা মাটি করতে দেব না তোমাদের!' বাঘা গলা শোনা গেল হাগলেটের।

কেস্টার নীরব। এক থলে মুদ্রা সাধল ও ক্যালার্ডকে।

ক্যালার্ড হাত বাড়িয়েছিল, কিন্তু ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিল ওকে হাগলেট।

'খেলা হবে!' চেঁচিয়ে উঠল ও। কুকুরঅলারা গলা মেলাল ওর সঙ্গে।

'কি ধরনের খেলা এটা,' বলল কেস্টার। 'অবলা জানোয়ারদের একটাকে আরেকটার পেছনে লেলিয়ে দিচ্ছ। খেলা যদি এতই ভালবাস, কুস্তি লড়লেই পারো। কে লড়বে এসো, এক এক করে আমি সবার সাথেই লড়তে রাজি।'

সবার ঠোঁটে তালা। কুস্তির মারপ্যাঁচে এঁটে ওঠা যাবে না কেস্টারের সঙ্গে, সবাই জানে।

চোখে ঘৃণা নিয়ে কেস্টারকে নিরীখ করছিলেন মিস্টার গ্রিম্বল। মৃদু হেসে এবার জনতার উদ্দেশে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

'আমি তোমার কথা মেনে নেব, তবে এক শর্তে,' বললেন।

'কি সেটা?' কেস্টার শুধাল।

'তুমি নিজে যদি কুকুরগুলোর সঙ্গে লড়ো!'

হেসে উঠলেন গ্রিম্বল। তাঁর হাসি ছাপিয়ে শোনা গেল হাগলেটের অট্টহাসি।

'ষাঁড়ের বদলে মানুষ চান, এই তো, মিস্টার গ্রিম্বল,' শান্ত সুরে বলল কেস্টার। 'বেশ, তবে তাই হোক। একটা একটা করে লড়ব আমি কুকুরগুলোর সাথে। খুন করব না, শেকলে বাঁধব।

'আর কাজটা যদি পারি,' বলছে কেস্টার, 'আপনাদের সবাইকে কথা দিতে হবে লালিংফোর্ডে আগামী দশ বছর এ মরণ খেলা বন্ধ থাকবে। কিন্তু একটা কুকুরকেও যদি বাঁধতে না পারি, আপনাদের খেলা চলতে থাকবে।'

হৈ-হৈ পড়ে গেল চারদিকে। হাগলেট প্রথমটায় কথাই বলতে পারল না, হাসতে এতটাই ব্যস্ত ছিল। তারপর সংবিৎ ফিরে পেয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে গর্জে উঠল, 'যারা যারা রাজি হাত তোলো।'

সবার হাত উঠল।

'ঠিক আছে,' চেঁচাল হাগলেট। 'তাই হবে।'

ভালবাসার শক্তি অনুভব করলাম নিজের মধ্যে। সর্বতোভাবে ওকে সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলাম মনে মনে। চুপিসারে একটা দোকানে গিয়ে লম্বা এক ছোরা হাতসাফাই করলাম। স্কার্টের নিচে লুকিয়ে রাখলাম ওটাকে। দরকার পড়া মাত্র বের করা যাবে।

দর্শকরা বৃত্তাকারে দাঁড়াল। বেষ্টনীর মধ্যখানে শিকল হাতে কেস্টার দাঁড়িয়ে। পিলে চমকানো হাঁক-ডাক ছাড়ছে হিংস্র কুকুরগুলো। বুনো কুকুর এগুলো, লড়াইয়ের জন্যে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

ছেড়ে দেয়া হলো প্রথম কুকুরটাকে।

'যা! ছিঁড়ে ফেল ওকে!' গর্জাল মনিব।

এবার আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটে গেল–এতই অস্বাভাবিক যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। কেস্টার আগে বাড়ল। খুব শান্ত, আদুরে সুরে বলল, 'বিঙ্গো, তুই না ভাল কুকুর, তুই না আমার বন্ধু। আয়, কাছে আয়।'

পরমুহূর্তে লেজ নাড়া শুরু হলো জানোয়ারটার, হাত চেটে দিল ওটা কেস্টারের। আলগোছে ওটার গলায় শিকল পরিয়ে দিল কেস্টার।

হাগলেট খেপে আগুন, কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

তারপরেরটা এবং তারও পরেরটা এভাবেই আপোষে বশ মেনে গেল। সব কটাকে শেকল পরিয়ে যার যার মালিকের হাতে ধরিয়ে দিল কেস্টার।

'আমি কুকুর ভালবাসি,' বলল ও। 'এখানকার সব কুকুর আমার ভক্ত।'

'হুঁ,' বললেন গ্রিম্বল। 'কিন্তু আমার কুকুর না। টবিকে তুমি চেনো না। পারলে ওর সাথে দোস্তি করো দেখি।'

গ্রিম্বল ঠিকই বলেছেন। টবি কেস্টারকে চেনে তো না-ই, বন্ধুত্ব পাতাতেও আগ্রহী নয়। কিন্তু কেস্টার ঠিকই শিকল বেঁধে দিল ওটার গলায়। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, লাফিয়ে উঠে কেস্টারের টুঁটি কামড়ে ধরল বুনো জানোয়ারটা।

গ্রিম্বলের বাহু আঁকড়ে ধরলাম আমি।

'শিগ্‌গির আপনার কুকুর সরান! ওকে মেরে ফেলল তো!' চেঁচিয়ে উঠলাম। কিন্তু এক চুল নড়লেন না উনি। যে কোন মুহূর্তে মারা পড়বে আমার প্রাণপ্রিয়। সবেগে ধেয়ে গেলাম।

বিশাল কুকুরটা আমার স্বামীর গলায় দাঁত বসিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই সুযোগে ওটার হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে সজোরে ছোরাটা চালিয়ে দিলাম আমি। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ছেড়ে মাটিতে পড়ে গেল কুকুরটা। তারপর খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে নিস্পন্দ হয়ে গেল। ওদিকে আমার কেস্টারও জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েছে ওটার পাশে।

'পানি!' চেঁচিয়ে উঠলাম। 'পানি নিয়ে এসো!'

দর্শকদের মধ্যে লালিংফোর্ডের এক ডাক্তার ছিল। কেস্টারের শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়ে গলার ক্ষতটা পরখ করল সে।

'জখমটা গরম লোহা দিয়ে পুড়াতে হবে,' বলল ডাক্তার। 'কিন্তু আগুন

লাগবে লোহা সেঁকার জন্যে।'

সিধে হয়ে দাঁড়ালাম আমি, কাউকে পরোয়া করছি না এ মুহূর্তে।

'জলদি! আপনারা পুরুষরা কাঠ-টাঠ দিয়ে আগুন জ্বালুন। শিগ্‌গির করুন, নইলে খুনের দায়ে সবাই দায়ী থাকবেন।'

লোকজন মুহূর্তে কাজে লেগে পড়ল। অনেকটা আমার ভয়েই যেন। শীঘ্রই আগুন জ্বলে উঠল। লোহার ছোরাটা আগুনে ধরলাম। ডাক্তার লোকটা কেস্টারের গলা দিয়ে ব্র্যান্ডি ঢেলে দিল। তারপর গলার জখমে তপ্ত ছোরাটা ঠেকাল।

বীভৎস চিৎকার করে উঠল কেস্টার।

'একটু সহ্য করো, জান,' বললাম আমি। 'এই তো, হয়ে গেছে। আর ভয় নেই।'

'ভাগ্যিস সময় মত এখানে হাজির ছিলাম আমরা,' মন্তব্য করল ডাক্তার।

'থাকতেই হত,' বললাম। 'আমি যে আজকের জন্যে ওর জীবন-দেবী।'

মাথাটা এরপর কেমন যেন ঘুরতে লাগল। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। চেতনা ফিরতে দেখি, গিডিয়ন আর জেনসিস ওখানে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে। আর সব লোকজন চলে গেছে।

'ও কোথায়?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কার কথা বলছ?' শুধাল জেনসিস। 'তাঁতি? ওকে লালিংফোর্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওখানে ঠিকমত চিকিৎসা হবে।'

'তুই ওর জীবন বাঁচিয়েছিস,' বলল গিডিয়ন। যেভাবে ছোরা বের করে কুকুরটাকে কোতল করলি, ভাবাই যায় না।'

'ধ্রু ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরতে পারবে না,' জেনসিস বলল গিডিয়নকে। 'মিলারকে বলি ওকে কার্টে করে নিয়ে যাক? আমিও না হয় তোমাদের সাথে যাই, দু'একদিন থেকে কাজে সাহায্য করব–ধ্রুর একটু বিশ্রামও তো দরকার।'

'মিলারকে বললে বলো। কিন্তু তোমার আসতে হবে না। গ্রিম্বলের খামারে কাজ করবে কে তুমি সঙ্গে গেলে?'

'আমি ওখানে যাব না,' কেঁদে ফেলল জেনসিস। 'আমাকে ওখানে যেতে বোলো না, সার্ন।'

'তুমি একদিন কোন বাড়ির বিবিসাহেব হবে তোমাকে দেখিয়েছি কিনা বলো,' বলল গিডিয়ন। 'কিন্তু পায়ের ওপর পা তুলে খেতে হলে আগে তোমাকে গ্রিম্বলের খামারে তিন বছর কাজ করতে হবে। কেঁদে কোন লাভ হবে না, জেনসিস।'

তো জেনসিস গেল গ্রিম্বলের ফার্মে, আর আমি মিলারের কার্টে চড়ে বহু সময় লাগিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। বেনডিগোর পিঠে সওয়ার হয়ে আগে ভাগে বাড়ি পৌঁছল গিডিয়ন।

বাড়ি ফিরে, আজকের ঘটনাটা জানালাম মাকে।

'বলিস কি রে, তুই তো মারা পড়তিস!' সভয়ে বলে উঠল মা।

আমাদের খেতে বসাল মা। নিজেও বসল আমাদের সঙ্গে, প্রশ্নে প্রশ্নে

জেরবার করল গিডিয়নকে।

শেষমেশ বার কয়েক মাথা নেড়ে বলল, 'গরমের দিনে তাঁতিকে আনাব। প্রচুর সুতো জমে যাবে ততদিনে।'

আট

জুনের শেষে এসে, মা জানাল তাঁতিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

'এত সুতো কেটেছি যে তাঁতিকে না ডেকে উপায় নেই।'

কিন্তু আমি চাই না কেস্টার আমার চেহারা দেখুক। ও যেদিন আসছে মাকে বললাম, 'আমি সারাদিন মাঠে কাজ করব। রুটি আর পনির নিয়ে যাচ্ছি যাতে বাসায় আসতে না হয়।'

'গাধীটা বলে কি,' আওড়াল মা। তবে জোরাজুরি করল না।

সন্ধেবেলা ফিরলাম যখন, তাঁতি কাজ সেরে চলে গেছে। কিন্তু উলের টুকরো-টাকরা পড়ে রয়েছে চিলেকোঠার মেঝেয় আর ওর তামাকের সুগন্ধে ভরে আছে ঘর।

তাঁতির প্রশংসায় মা পঞ্চমুখ–ওর মত ছেলে হয় না। নিজের পেটের ছেলের মত লেগেছে ওকে মার কাছে।

'ও জানতে চাইল সার্ন ছাড়া আমার আর কোন ছেলে-মেয়ে আছে কিনা,' বলল মা। 'তোর কথা বললাম।'

'কি বললে?' উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

'বললাম দুনিয়ার সবচেয়ে ভাল মেয়েটা আমার। বললাম আমার মেয়ে লম্বা-পাতলা, রেশমের মত দীঘল চুল তার, কাজল কালো চোখ। মেয়ে আমার গুণীও বটে–লেখাপড়া জানে।'

'ধ্যেত, তুমি যে কি, মা···একগাদা মিথ্যে কথা ফেঁদেছ।'

'মিথ্যে কি রে? সব সত্যি কথা।'

'ওকে বলেছ তোমার মেয়ের ঠোঁট কাটা?'

'না! তা বলতে যাব কেন?'

'তবে তো আমাকে দেখলে ও হতাশ হবে, মা···'

'মোটেই না, তোকে খুব পছন্দ করবে দেখিস,' একগাল হেসে বলল মা। তারপর আরও বলল, 'প্রু, তাঁতি যদি নুলো কিংবা ল্যাংড়া হত, তবে কি ওকে তোর খারাপ লাগত?'

'খারাপ লাগবে কেন, মা?' না ভেবেই বলে উঠলাম। 'তাহলে তো ওকে আরও বেশি ভালবাসতাম আমি।'

মুচকি হাসল মা।

'তুই ওকে ভালবাসিস আমি বুঝি, প্রু। সেজন্যে আমি খুশিও বটে। কিন্তু ওর কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করিস না, প্রু, নিজেকে লুকোস না।'

'আমাকে ওভাবে ফাঁদে ফেলা তোমার উচিত হয়নি, মা,' বললাম আমি লাজুক কণ্ঠে। 'তাঁতির কথা কাউকে বলতে চাইনি আমি।'

'তাই বলে মাকেও বলবি না,' পাল্টা বলল মা। 'আমি জানি একদিন তোর কপালে সুখ হবে। তাঁতি বলেছে ও বিয়ে করেনি। কিন্তু যদি করে তবে করবে তোর মত একটা লক্ষ্মী মেয়েকে, বুঝলি রে হাঁদী?'

ফসল কাটার মৌসুম শেষ হলে, জেনসিসকে চিঠি লিখে দিতে বলল গিডিয়ন।

'কি লিখব?' জানতে চাইলাম।

'খামারের কথা আর শস্য কাটার কথা লেখ,' বলল গিডিয়ন। 'আর ওকে জানাস···ওহ্, কি লিখতে হবে তুই তো জানিসই, প্রু। ভাল-মন্দ সব মিলিয়ে লিখে দিস যা হয়।'

তো, আমার মন মত চিঠি লেখার অনুমতি পাওয়া গেল। কে পড়বে ওটা জানি আমি–কেস্টার। কাজেই অন্তর থেকে প্রিয়তমর জন্যে চিঠিটা লিখলাম। চিঠিটা এরকম:

সার্ন
ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর

প্রিয় জান আমার,

শস্য গোলায় তোলা হয়েছে। শীতও এসে গেল। বড়দিনের বাজারে হয়তো দেখা হবে তোমার সাথে।

তুমি আর তাঁতি বসে আছ দেখতে পাচ্ছি মনের চোখে–তুমি ওকে কি লিখতে হবে বলছ। ও লিখছে আর ওর মুখে লেগে আছে মিষ্টি এক টুকরো হাসি।

তাঁতিকে বোলো হাগলেট কোত্থেকে ভয়ানক হিংস্র এক কুকুর জোগাড় করেছে। সে যেন সাবধান থাকে।

তাঁতির যদি সেলাই করার কিছু থাকে, আমার মা-বোন সানন্দে করে দেবে–জানিয়ো ওকে।

ফসলের অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। মিস্টার গ্রিম্বলকে বোলো ক'টা ভেড়ার বাচ্চা পাঠাতে–ভাল দেখে, নইলে সোজা ফেরত পাঠিয়ে দেব।

আর বিশেষ কি। নিজের যত্ন নিয়ো। ঠাণ্ডার ভাল ওষুধ হচ্ছে লেবু আর মধুর গরম সরবত। তুমি আমার জানের জান, কলজের টুকরো। তোমার জন্যে যে কোন সময় মরতে রাজি আমি–চাই কি কুকুরের কামড় খেয়ে অথবা অন্য যে কোনভাবে।

ইতি
তোমার ভালবাসা
গিডিয়ন সার্ন।

জেনসিসের জবাব আসতে আসতে বড়দিন এসে গেল।

দ্য হাই ফার্ম, আউটর‍্যাক
পয়লা ডিসেম্বর।

ওগো আমার প্রাণপ্রিয়,

আমার ভালবাসা নিয়ো। এ চিঠি লিখছি দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ প্রেমিককে।

তোমরা সেলাই করে দিলে মিস্টার উডসীভস কৃতজ্ঞ থাকবে। মনে করে প্রস্তাবটা দিয়েছ বলে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমার বোনকে কথাটা জানিয়ো কিন্তু।

মিস্টার উডসীভস বলছে এত ভাল সর্দির ওষুধ নাকি জীবনে খায়নি, কিন্তু কোন মেয়ে নিজ হাতে বানিয়ে দিলে নাকি আরও বেশি কাজ হত।

হাগলেটের কুকুর নিয়ে চিন্তা কোরো না–তাঁতি ভয় পায় না। তবে দুঃসাহসী এক মেয়ে ওর জীবন রক্ষা করেছিল এটা সে জানে। কাজল কালো চোখ নাকি মেয়েটির, লম্বা-পাতলা আশ্চর্য সুন্দর গড়ন। তাঁতি বলে, কাউকে যদি ভালবাসে তবে অমন মেয়েকেই বাসবে। আজকের মত এখানেই শেষ করছি, শুভ বড়দিন।

জেনসিস বিগাইল্ডি।

এভাবে কেটে গেল আরেকটা বছর, এবং পরবর্তী বছরের বড়দিনের আগের সন্ধে এসে গেল। কেস্টারের ষাঁড়ের বাজি বন্ধ করার এক বছর আট মাস পূর্ণ হয়েছে।

দীর্ঘদিন জেনসিসের চিঠির দেখা নেই। তবে গিডিয়ন মোটেই উদ্বিগ্ন নয়। গ্রিম্বলের খামারের আশপাশে রাস্তা-ঘাটের দশা এতটাই করুণ, প্রতিকূল আবহাওয়ায় কারও পক্ষে ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। জেনসিসের কথা ভাবি আমি বিমর্ষ মনে, তুষার আর উঁচু উঁচু পর্বতমালা বেচারীকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে আমাদের কাছ থেকে।

সেদিনের সন্ধেয়, বাড়িটা একদম শান্ত। মা বিছানায়। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়লে বেশিরভাগ সময় বিছানাতেই কাটে মার। কাঠ কাটতে গেছে গিডিয়ন। ওর কুঠারের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

রুটি সেঁকছি আমি, রান্নাঘরে আরামদায়ক উষ্ণতা আর মিষ্টি রুটির সুঘ্রাণ। বড়দিন উপলক্ষে অনেক পাই করেছি। জন্তু-জানোয়ার সব আজ রাতের মত বন্দী এবং বিড়ালটা আগুনের ওম পেয়ে সেঁটে ঘুম দিচ্ছে।

গুনগুন করে গান গাইছি, এসময় দরজায় টোকার শব্দ হলো। কে এল? দরজা খুললাম।

আগুনের আলোয় ফ্যাকাসে, ম্লান মুখ দেখতে পেলাম জেনসিসের। ওকে টেনে ভেতরে আনতে বেচারী মূর্ছা গেল।

কাপড়-চোপড় ওর ছিন্নভিন্ন আর ভেজা। মুখে-হাতে কাটাকুটি, আঁচড়ের দাগ।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে জেনসিস বলল, দু'দিন নাকি পেটে কিছু পড়েনি ওর। গ্রিম্বলের ওখান থেকে পালিয়েছে সে, সার্মে এসেছে পুরোটা রাস্তা পায়ে হেঁটে।

'ওহ, প্লু, তুমি রাগ কোরো না প্লীজ!' সকরুণ কণ্ঠে বলল ও। 'ওখানে আর থাকা সম্ভব ছিল না। কেউ ওখানে থাকতে পারবে না। বড়দিন এসে গেল অথচ ও কোন খবর দিল না। আমি আর সইতে পারছিলাম না।'

'গিডিয়নকে কি বলবে?'

'ও বকলে বকুক, কিছু যায় আসে না। কিন্তু আজ রাতে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ো না, প্রু।'

তা কেনই বা করতে যাব? আগুনের পাশে সেটলে ধরে ধরে বসলাম ওকে। বেচারী ক্লান্তিতে এতই ভেঙে পড়েছে যে ঘুমিয়ে পড়তে দেরি হলো না।

গিডিয়ন ফিরে এসে ওকে ঘুমোতে দেখে বেজায় রেগে গেল।

'এতগুলো টাকা সব হাতছাড়া হয়ে গেল!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'যে পর্যন্ত কাজ করেছে তার বেতনও মার চলে যাবে। পালিয়ে এসে মায়নাটা পানিতে ফেলল ও!'

'বেচারীর জীবন যায় যায় আর তুমি কিনা টাকা টাকা করছ?' দাবড়ে উঠলাম আমি। 'কেমন মানুষ তুমি? ও যে বেঁচে আছে এই ঢের।'

হকচকিয়ে গেছে গিডিয়ন, তবে চুপ থাকল। জেনসিসের দিকে চাইল, ঘুম ভেঙেছে ইতোমধ্যে ওর।

'তো কাজের ভয়ে পালিয়ে চলে এলে?' ক্রুদ্ধ কণ্ঠ গিডিয়নের।

গাল বেয়ে অশ্রু গড়াল জেনসিসের।

'কেঁদো না, কেঁদো না,' বলে উঠল গিডিয়ন। 'তোমার কান্না দেখলে আমাকে ধমকি দেবে প্রু। গ্রিম্বল তোমাকে ঠিকমত খেতে দেয়নি দেখতে পাচ্ছি। ক্যাম্পারডাইন তোমার খোঁজে গেছিল?'

'না,' ফিসফিস করে বলল জেনসিস।

'আর কোন ছেলে লেগেছে তোমার পিছে?'

'না, সার্ন। কিন্তু গ্রিম্বলের ছেলে আমার দিকে কুদৃষ্টি দিত। তাই পালিয়ে এসেছি আমি। তোমাকে ছাড়া আমি যে আর কাউকে বুঝি না, সার্ন।'

'এত মাইল ঠেঙিয়ে এসেছ শুধু আমারই জন্যে?'

'হ্যাঁ, সার্ন, আর কার জন্যে আসব বলো?'

'তাহলে এসো, একটা চুমু খাও।'

প্রেমিক যুগলকে একান্তে থাকার সুযোগ দিতে এক ছুটে ডেইরীতে চলে গেলাম আমি। বিড়ালটাও পাঁই পাঁই ছুটল আমার পিছু পিছু, গিডিয়নকে খানিকটা ভয় পায় ওটা।

আহা, এমন যদি হত সেটলে বসে আছি আমি, আর আমাকে জড়িয়ে রয়েছে কোন এক যুবকের একখানা বলিষ্ঠ বাহু। নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না কে সেই কল্পনার যুবক?

'আমি যা চাই তা পাই না রে, পুসি,' বললাম বেড়ালটাকে। 'কিন্তু তুই পাস। যা চাস তাই পাস।'

এক বাটি সর দিলাম ওটাকে।

বাড়িতে ফিরে এলাম মার চা বানাতে। তাকে জেনসিসের কথা জানাতে, মা বলল, 'মেয়েটা প্র্যাশে নিজেদের বাসায় গেল না কেন?'

'বাবার ভয়ে হয়তো,' বললাম। 'মিসেস বিগাইন্ডিকে পরে জানাব আমি। ও বড়দিনটা এখানেই করুক।'

'তুমি থাকতে পারো, জেনসিস,' বললাম ওকে। 'তোমার মায়ের কাছে ছাব্বিশে ডিসেম্বর যাব আমি। উনি যদি মনে করেন তোমার ফিরে আসার কথা তোমার বাবাকে জানাবেন। তারপর কি হবে কে জানে? গিডিয়ন হয়তো…'

কথাগুলো কানে গেল গিডিয়নের।

'যদি ভেবে থাকিস এখুনি জেনসিসকে বিয়ে করব আমি,' বলল ও। 'তবে ভুল করবি। বিয়ে আমি করব ঠিকই, কিন্তু আমার সময় মত। তার আগেও না পরেও না। জেনসিসকে বলেছি, ফসল ভাল হলে গোলায় তোলার পরপরই বিয়ে হতে পারে। ও আপত্তি করেনি।'

'জেনে খুশি হলাম,' বললাম। 'কাউকে ভালবাসলে তাকে কাছে রাখাই উচিত, দূরে ঠেলে দেয়া ঠিক নয়।'

ছোট্ট এক কটেজের ছবি ভেসে উঠল মনের পর্দায়, বেশি দূরে নয় কাছেই, তাঁতি যেখানে বাস করে।

'জেনসিস,' বললাম আমি, 'মিস্টার উডসীভসকে তোমার একটা চিঠি লেখা উচিত। তুমি এখন কোথায় আছ জানানো দরকার।'

'বেশ, লেখো না,' সোৎসাহে বলল জেনসিস।

সার্ন
চব্বিশে ডিসেম্বর

প্রিয় মিস্টার উডসীভস,

আমি মিসেস গ্রিম্বলের খামারে আর কাজ করছি না জানানোর জন্যে লিখছি। মহিলা খুব কঠিন মনের মানুষ। প্রায় না খাইয়ে রাখতেন আমাকে। আমি এখন সার্নে। শীঘ্রিই বিয়ে হতে পারে আমার আর গিডিয়নের। কাউকে মন থেকে ভালবাসলে তাকে চোখের আড়াল হতে দিতে নেই। তাতে মনে শান্তি থাকে না। তাছাড়া কথায় আছে না, চোখের আড়াল হলে মনেরও আড়াল হয়।

আমি আমার স্বামীকে দুনিয়ায় সবচাইতে বেশি ভালবাসি। কতটা ভালবাসি বলে বোঝাতে পারব না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসে যাব ওকে।

আজ এখানেই শেষ করছি, মিস্টার উডসীভস। বড়দিনের শুভেচ্ছা।

জেনসিস বিগাইল্ডি।

চিঠিটা খামে ভরে দিলাম। আগামী হাটের দিন লালিংফোর্ডে নিয়ে যাবে গিডিয়ন।

আমরা সেরা বড়দিন উদ্‌যাপন করলাম এ বছরটায়। হাসিতে-গানে ভরপুর সময় কাটল। মা বড়দিনে বিছানা ছেড়ে আগুনের পাশে বসে থাকল। জেনসিসের দিকে তাকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে বুঝলাম, নাতি-নাতনীর কথা ভাবছে।

'ফসল তোলার পরপরই বিয়েটা করে ফেল, সার্ন,' বলল মা। 'দেরি করিস না. কবে মরে যাই কে জানে। তোদের বিয়েটা দেখে যেতে চাই আমি।'

'দেরি হবে না,' বলল গিডিয়ন। 'শস্য বেচা হলেই বড়লোক হয়ে যাব।

দু'তিন বছর বড়জোর, তারপরই ওই বড় বাড়িটাতে উঠে যেতে পারব।'

ছাব্বিশে ডিসেম্বর, প্ল্যাশে গেলাম আমি। বিগাইল্ডি ছিলেন না, ফলে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারিতার সুযোগ মিলে গেল।

'শুনছি ক্যালার্ডের লোক লাগবে,' বললেন মিসেস বিগাইল্ডি। 'জেনসিসকে ওরা হয়তো নিতেও পারে।'

ক্যালার্ডকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করব কথা দিলাম এবং পরদিন হাজির হলাম গিয়ে। তুষারে পা দেবে যায় আর সে কী ঠাণ্ডা! কিন্তু গলা ছেড়ে গান গাইছি আর হাঁটছি আমি। একটু পরে মাঠে ক্যালার্ডের ষাঁড়টাকে দেখতে পেলাম। সেই সাদা ষাঁড়টা, কেস্টার যেটাকে হিংস্র কুকুরদের কবল থেকে বাঁচিয়েছিল। ওর কথা ভাবতে মনটা খুশি খুশি হয়ে উঠল।

ক্যালার্ড স্বামী-স্ত্রী ভালমানুষ। জেনসিসকে ছ'মাসের জন্যে কাজে নিতে রাজি হলো, ভাল বেতনও দেবে। তো পরদিন, ওয়াগনে চাপিয়ে জেনসিসকে নিয়ে গেলাম ক্যালার্ডের খামারে। রাস্তায় থামলাম একবার প্ল্যাশে, বিগাইল্ডির সঙ্গে কথা বলব বলে।

ওঁকে এতটা ক্রুদ্ধ আগে কোনদিন দেখিনি। ক্ষিপ্ত ভদ্রলোক সব দোষ চাপিয়ে দিলেন গিডিয়নের ওপর। অবশ্য মিসেস বিগাইল্ডি খুশি, শরতে মেয়ের বিয়ে লাগছে।

'গোলাপ ফুটবে তখন, জেনসিস, তোর বিয়ের ফুলও ফুটবে,' হেসে বললেন মা।

'আমার মেয়েকে ওই সার্ন চাষাটা পাচ্ছে না!' গর্জন ছাড়লেন বাবা। 'আগুনে-পানিতে অভিশাপ দিয়েছি আমি ওকে, গজব হয়ে যাবে ওর। ওদের বিয়ে কোনদিনই হবে না, মিলিয়ে দেখো!'

এঁর সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই, তাই বিনীত সুরে বললাম, 'আসি, মিস্টার বিগাইল্ডি। আমাদের যাওয়ার সময় হয়েছে।'

প্ল্যাশ আর ক্যালার্ডের খামারের মাঝামাঝি এক জায়গায়, ডাগর, নীল নয়ন মেলে আমার দিকে চাইল জেনসিস, 'প্রু, তুমি গ্রিম্বলের কুকুরটার হাত থেকে তাঁতিকে বাঁচিয়েছিলে কেন? যাকে চেনো না জানো না তার জন্যে অতবড় ঝুঁকি কেউ নেয়? সবাই কিন্তু অবাক হয়ে গেছে।'

জবাব দিলাম না, কিন্তু টের পাচ্ছি লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে মুখ।

'তাঁতি জানে কিনা কে জানে!' বলল জেনসিস।

'তখন তো জানত না। জ্ঞান ছিল না,' চট করে বললাম আমি।

'কিন্তু পরে নিশ্চয়ই জেনেছে। আমাকে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করলে কি বলব?'

'কিছু বলতে হবে না।' মুখ ঝামটা দিলাম।

'কিন্তু তুমি সেদিন যেভাবে ওকে বাঁচালে! ছোরা হাতে দেবদূতের মত লাগছিল তোমাকে। মনে হচ্ছিল ওকে রক্ষা করার জন্যেই যেন পাঠানো হয়েছে তোমাকে।'

'তো কি হয়েছে! এসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।'

'হবে, প্রু। কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।'

চুপ থাকলাম, তবে মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

আমি চলে আসার ঠিক আগ মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল জেনসিস, 'তাঁতিকে শিগ্‌গিরি ডাকব আমি।'

'কেন?'

'সার্নের কাছে চিঠি লিখে দেয়ার জন্যে।'

'কি যে বলে, মাত্র তো দু'তিন মাইলের পথ। চিঠি লিখতে যাবে কোন দুঃখে?'

সশব্দে হেসে উঠল জেনসিস।

'এসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না, প্রু সার্ন,' বলল ও।

নয়

প্রতি রবিবার ক্যালার্ডদের ওখানে জেনসিসকে দেখতে যায় গিডিয়ন। সারাটা সপ্তাহ তিনজন মানুষের কাজ একা করে ও। আমিও খেটে চলেছি। আমাদের খামারের এতটা সমৃদ্ধি আগে কখনও দেখা যায়নি। খেতে খেতে সোনার ফসল। গিডিয়নের কাছে শস্য মানেই সোনা। মাঝে মাঝে ফসলের দিকে চেয়ে থাকতে দেখি ওকে, কৃপণ যেভাবে তার সোনাদানার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তেমনি দৃষ্টিতে।

সার্ন মেয়ারে বছরের সেরা সময়টা হচ্ছে গ্রীষ্মের শুরু। মেয়ারের চারধারে গাছে গাছে তখন সবুজের সমারোহ। ডালে ডালে দিন ভর পাখিদের গান। সাদা আর সোনালী জলপদ্মের ঝিকিমিকি হ্রদের বুকে।

এমনি এক দিনের কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার। খামারের কাজ ভুলে, মেয়ারের স্থির পানিতে ড্রাগন ফ্লাইদের ওড়াওড়ি দেখছিলাম মগ্ন হয়ে।

হঠাৎ কাজের কথা মনে পড়ল। যেই ঘুরে দাঁড়িয়েছি খামারে ফিরব বলে অমনি শুনি একটা শব্দ-চেয়ে দেখি সামনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং কেস্টার উডসীভস।

দৌড়ে পালাব না পানিতে ঝাঁপ দেব ভেবে পাচ্ছি না, ও আমার কাঁধে একটা হাত রাখল। কুস্তিগীরের বলিষ্ঠ হাত, নড়াচড়ার সাধ্য হলো না আমার।

'পালাচ্ছিলে কেন, প্রু সার্ন?' জিজ্ঞেস করল মৃদু সুরে। 'আমাকে দেখলেই পালাও কেন বলো তো ?'

মাথা নোয়ালাম আমি, যাতে ঠোঁট দেখতে না পারে। চুপ করে রইলাম।

'আমি তোমার জন্যে এত কষ্ট করে এলাম আর তুমি কিনা আমাকে দেখে সটকানোর তাল করছ, এ তো ভাল কথা নয়, প্রু। কোথায় ভাবলাম জীবন

বাঁচিয়েছ বলে ধন্যবাদ জানাব তোমাকে অথচ তুমি কিনা···কি দেখছিলে অত মন দিয়ে?'

'ড্রাগন ফ্লাই।'

'হ্যাঁ, ওরা দেখতে খুব সুন্দর আর উড়তেও পারে অনেক উঁচুতে,' বলল কেস্টার।

'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মনে হয় হয়তো বেহেশতে পৌছে যাবে।'

'সবাই পৌছতে চায় ওখানে,' বলল কেস্টার। 'কিন্তু পৃথিবীতেও আমি নিজের জন্যে একটা বেহেশত গড়তে চাই।'

এতই আগ্রহ নিয়ে ওর কথা শুনছি যে কাটা ঠোঁটের কথা বেমালুম ভুলে গেছি। ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, 'আপনার বেহেশতটা কেমন হবে?'

'এখনও জানি না,' বলল সে। 'তবে মনে হয় এক বছরের মধ্যে জেনে যাব।'

'এক বছর?' হেসে বললাম আমি। 'অনেক লম্বা সময় হয়ে গেল না ছোট্ট একটা বেহেশতের জন্যে?'

'এর চাইতে তাড়াতাড়ি তুমি বুঝি মনের মত বেহেশত বেছে নিতে পারবে, প্রু সার্ন?'

ওর সবুজ কোটটার বুকের কাছে চোখ চলে গেল আমার, মাথাটা যদি একটিবার রাখতে পারতাম ওখানে; দুনিয়ার বেহেশত এই মুহূর্তে এসে যেত আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু তা কি আর হয়!

'পারব। কোথায় সেটা জানি আমি।'

'তাই নাকি? কোথায়?'

'দেখুন, মিস্টার উডসীভস, আমার কল্পনা আমারই থাকুক, আপনি জানতে চাইবেন না,' লাজুক হেসে বললাম।

হেসে উঠল ও।

'তবে তুমি কিন্তু বড় চমৎকার চিঠি লিখতে পারো, প্রু।'

'ওগুলো গিডিয়নের চিঠি,' তড়িঘড়ি জবাব দিলাম।

'ও, সর্দির ওষুধ তাহলে ও-ই বাতলেছিল, আর আমার সেলাইও সে করে দেবে? বাহ্, এমন পুরুষমানুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার বলতে হবে।'

কেস্টার তার স্বচ্ছ, নীল চোখে এমনভাবে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে, মাথা নত না করে পারলাম না।

'আর জেনসিসও খুব সুন্দর সুন্দর চিঠি লেখে,' বলল কেস্টার। 'ওর চিঠি পড়েও মনটা ভরে যায়। কথাবার্তা শুনলে খুব ভাল মেয়ে মনে হয় ওকে। কি যেন লিখেছিল? ও, হ্যাঁ: আমি আমার স্বামীকে দুনিয়ায় সবচাইতে বেশি ভালবাসি। কতটা ভালবাসি বলে বোঝাতে পারব না। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসে যাব ওকে।

'আরও কি যেন,' মুখস্থ বলে চলেছে কেস্টার, ···তোমার জন্যে যে কোন

সময় মরতে রাজি আমি–চাই কি কুকুরের কামড় খেয়ে অথবা অন্য যে কোনভাবে।

'একেই বলে প্রেম, আহা,' আরও বলল কেস্টার। 'সার্ন এসব কথা লিখেছে জেনসিস বিগাইন্ডিকে। খাঁটি প্রেমিক ছাড়া কেউ পারে এসব লিখতে? ফসল কাটার সময় আমি আসছি সাহায্য করতে। ওর এতসব ভাল ভাল উপদেশ আর মিষ্টি মিষ্টি কথার জন্যে ধন্যবাদ জানাতে হবে না ওকে?'

'ও কাজ করতে যাবেন না!' মিনতি ঝরে পড়ল আমার কণ্ঠস্বরে।

'আরে, আজব মেয়ে তো দেখছি! নিজের ভাইকে ধন্যবাদ জানাতে নিষেধ করে!'

কিন্তু ওর মুখের চেহারায় পরম সন্তুষ্টির অভিব্যক্তি। জানা হয়ে গেছে ওর যা জানতে চেয়েছিল।

'অত কথার কাজ নেই,' মুচকি হেসে বলল কেস্টার। 'চিঠিগুলো তুমি মন থেকে লিখেছ, আর যার কথা ভেবে লিখেছ সে ভাগ্যবান লোক।'

'আমার তেমন কোন বিশেষ মানুষ নেই।'

'কিন্তু বন্ধু তো আছে,' বলল কেস্টার। 'বাড়ি গিয়ে তোমার খাতায় লিখে রেখো, কেস্টার উডসীভস তোমার বন্ধু। চিরদিন থাকবে।'

এরপর ড্রাগন ফ্লাই আর এটা সেটা নিয়ে আলাপ করে চমৎকার সময় কেটে গেল। একসময় ওকে জিজ্ঞেস করলাম আমার যে একটা খাতা আছে, তাতে মনের কথা লিখি আমি ও জানল কিভাবে।

'তোমার প্রায় সব কথাই জানা আছে আমার, প্রু,' বলল কেস্টার।

ওহ্, কানে যেন মধু ঢালল কথাগুলো! হঠাৎ খেয়াল হলো সন্ধের ছায়া প্রলম্বিত হচ্ছে হ্রদের জলে। কত কাজ পড়ে আছে আমার! রওনা হতে গেলাম।

'যাওয়ার আগে একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও,' বলল কেস্টার।

আমার চোখে গাঢ় দৃষ্টিতে চাইল ও।

'ষাঁড়ের বাজিতে ও কাজটা কেন করতে গেছিলে তুমি?' বলল ও। 'হিংস্র কুকুরটা যদি তোমার ওপর হামলে পড়ত?'

অটুট নিস্তব্ধতা। কি বলব আমি?

'আপনাকে রক্ষা করার জন্যে দেবদূত হিসেবে পাঠানো হয়েছিল আমাকে, কোনমতে বলতে পারলাম।

'আবারও যদি দেবদূতের দরকার হয় জানাব তোমাকে, বলল কেস্টার।

একটু পরে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রওনা হলো, ওর হাসির শব্দ কানে এল আমার।

দশ

ফসল কাটার মৌসুম এল শেষ অবধি। আমার জীবনে কোনদিন এমন ফসল দেখার সৌভাগ্য হয়নি। মাঠের পর মাঠ যেন সোনা ঝরাচ্ছে শস্য।

আগস্টের গোড়ায় ফসল কাটা শুরু করলাম আমি আর গিডিয়ন। সে কী হাড়ভাঙা পরিশ্রম! আবহাওয়া বেশ মনোরম, কাজেই মাঠেই ফেলে রাখলাম শস্যের আঁটি।

অবশেষে স্বপ্ন সত্যি হতে যাচ্ছে গিডিয়নের। ফসলের দাম অস্বাভাবিক চড়া—ফলে ফসল বেচার পর রীতিমত ধনী লোকে পরিণত হবে গিডিয়ন।

আমিও বেজায় খুশি। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেস্টার সাহায্য করতে আসছে। শীঘ্রিই লন্ডন যাচ্ছে ও নানা রঙের সুতো একসঙ্গে বোনার কাজ শিখতে। ফিরে যখন আসবে, গিডিয়নের প্রতিশ্রুত টাকাটা পেলে, আমার কষ্টটা ঠোঁট সেরে যাবে। প্রিয়তমর সামনে অপরূপা এক পরী হয়ে হাজির হব আমি।

লাভ-ক্যারিজ নামে এক রীতি চালু ছিল তখন। ফসল কাটা হলে প্রতিটি পরিবার জমিতে যার যার ওয়াগন নিয়ে আসবে। ওয়াগনে তোলা হবে আঁটি। সেখান থেকে আঁটি যাবে গৃহস্থের উঠনে, চৌকো করে বিরাট বিরাট সব গাদা করা হবে আঁটি দিয়ে।

মধ্য সেপ্টেম্বরের এক শুভ দিনে লাভ-ক্যারিজের আয়োজন করা হলো। স্বচ্ছ, ঘন নীল আকাশ, মেঘের ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। আগেভাগেই চলে এল ওয়াগনগুলো। সবাই এত আন্তরিকভাবে খাটছে যেন ফসলের মালিক তারাই।

দুপুর নাগাদ, সবাই যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, উঁচু এক মাঠে গিয়ে কেস্টারের খোঁজে উঠলাম আমি। ওই দূরের মাঠ থেকে এদিকেই আসতে দেখলাম ওকে। আমাকে দেখতে পেয়ে হ্যাট নাড়ল।

দেরিতে এলেও, খাটুনি কারও চাইতে কম খাটল না কেস্টার। প্রায়ই চোখে চোখ পড়তে লক্ষ করলাম, মৃদু হাসি ফুটছে ওর ঠোঁটে। একবার তো আমার কাছাকাছি এসে নিচু স্বরে বলে, 'তুমি কিন্তু এখনও আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ, প্রু সার্ন। মানুষ সব সময় বন্ধুর কাছে আসে দূরে সরে কখনও শুনেছ?'

একমনে আঁটি তুলে যাচ্ছি আমি, জবাব দিলাম না।

এবার গলার ভেতর হেসে বলল ও, 'একটু সহ্য করো, জান। আর ভয় নেই!'

সরাসরি আমার চোখের দিকে চেয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করল ও। কান গরম হয়ে গেল। ও, কেস্টার তারমানে শুনতে পেয়েছিল? মধুর হাসি হেসে, নিজের কাজে ফিরে গেল ও।

আহা, কি দারুণ স্মৃতিময় সেই দিনটা আমার জীবনে! নিরলস পরিশ্রম করে চললাম আমরা। শস্যের আঁটি তো নয় খাঁটি সোনা যেন আমাদের সবার বাহুতে। সূর্য পাটে বসার ঠিক আগ দিয়ে শেষ ওয়াগনটা ভর্তি হয়ে গেল। সব জমি এখন শূন্য।

শেষ ওয়াগনটায় আঁটির স্তূপে চড়ে বসে আছে জেনসিস। ওকে ঘিরে বসা ছেলে-মেয়ের দল ডালপালা আর বুনো ফুল নাড়ছে। ওয়াগনটার পাশাপাশি হাঁটছে ঋজু, দীর্ঘদেহী গিডিয়ন সার্ন।

উঠনে আঁটি দিয়ে শেষ ডাঁইটা তৈরি করার পর পাদ্রী আশীর্বাদ করলেন।

'তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ, বন্ধুরা,' বলল গিডিয়ন, 'যখনই ডাকবে, আমিও তোমাদের সবার জন্যে হাজির হয়ে যাব।'

ভোজের মধ্য দিয়ে লাভ-ক্যারিজের ইতি টানার নিয়ম। ফলবাগানে টেবিল চেয়ার পেতে বসে পড়ল মেহমানরা।

খানাপিনা চলছে, এমনিসময় তরুণ জমিদার আর তার বোন মিস ডোরাবেলাকে ঘোড়ায় চেপে আমাদের বাসায় ঢুকতে দেখা গেল।

'শুভ সন্ধ্যা,' ক্যাম্পারডাইন গলা চড়িয়ে বলল। 'এবারের ফসল তোমাদের জন্যে সৌভাগ্য বয়ে আনুক!'

'এই, সার্ন,' বলল মিস ডোরাবেলা। 'কি, আমাদের এল খাওয়াবে না?'

ভাই-বোনের জন্যে এল ঢেলে দিল গিডিয়ন।

'ভেবেছিলাম বিগাইন্ডিকেও এখানে দেখতে পাব,' বলল ক্যাম্পারডাইন।

'না, স্যার,' মিসেস বিগাইন্ডি তড়িঘড়ি বললেন। 'সে দু'তিন সপ্তার জন্যে বাইরে গেছে।'

'তাহলে পরে যাব আপনাদের বাসায়,' জানাল ক্যাম্পারডাইন। 'ভেনাসকে যেন পাই তখন!'

হেসে উঠল জেনসিস, আর আমি পালিয়ে বাঁচলাম। আমার কাণ্ড দেখে ওর হাসি আরও বেড়ে গেল।

মিসেস বিগাইন্ডি চালাকি করে দূরে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছেন স্বামীকে। বিয়ের সময়টায় যাতে উপস্থিত থাকতে না পারেন জাদুকর। চাচাতো বোনের সঙ্গে শলা করে কাজটা করেছেন তিনি। চাচাতো বোনটি বিশেষ এক তাবিজ নিয়ে আসতে বলেছে মিস্টার বিগাইন্ডিকে। প্রচুর টাকা পাবেন জাদুকর ওটা আনতে পারলে। পাঁউরুটির একটা টুকরো সেই তাবিজ। ওটা সেঁকেছে বাবা-মার কোন এক সপ্তম সন্তানের সপ্তম সন্তান। তো অমন মানুষের সন্ধানে গোটা দেশ চষে ফেলা ছাড়া বেচারা বিগাইন্ডির আর কিই বা করার আছে? উনি ফিরে আসতে আসতে জেনসিসের বিয়ে সারা।

আঁধার ঘনাচ্ছে, তার সাথে পাল্লা দিয়ে চাঁদ চড়ছে, আরও বড় আরও গোল আকার নিচ্ছে। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ শিস বাজাতে নাচ আরম্ভ হলো।

জেনসিসকে বুকের কাছে ধরে নাচছে গিডিয়ন।

কেস্টার খুঁজে বের করল আমাকে।

'নাচবে না?' জিজ্ঞেস করল।

'না।'

'কেন?'

'আমি আর সব মেয়েদের মত নই।'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল ও, 'আমি এখন যাব। জানো নিশ্চয়ই, দশ মাসের জন্যে লন্ডনে যাচ্ছি আমি, রঙিন সুতো বোনা শিখব বলে। ভাল পয়সা ও কাজে। আগামী বছর নিজের তাঁত নিয়ে বসে পড়ব বাসায়।'

মনে হচ্ছে ডুবে যাচ্ছি অতল সাগরে।

'কবে ফিরবেন?'

'আগস্টের মেলায় আসার ইচ্ছে আছে। তখন তোমার সাথে কথা হবে, গ্রু সার্ন।'

'আপনার মনে থাকলে তবে তো।'

'না থাকার কোন কারণ নেই।'

'ভাল থেকেন।' ফিসফিস করে বললাম।

'তুমিও। ভেনাসের সঙ্গে যার এত মিল সে মেয়ের নাচতে না চাওয়া বোকামি।'

ওর কথাগুলো বুঝতে পারার আগেই রওনা হয়ে গেল।

মা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, শুতে যাচ্ছে। তাকে বিছানায় তুলে দিয়ে শোবার ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ালাম, নিচে মানুষজন দেখছি।

জেনসিসকে পাশে নিয়ে হাঁটার সময় গিডিয়নকে বলতে শুনলাম, 'তোমার বাবা নেই যখন, কাল রাতে প্ল্যাশে আমি তোমার সাথে থাকব।'

এই ফন্দি এঁটেছে ও? হয়তো এর মধ্যে দোষের কিছু নেই। আর দু'সপ্তাহ পর তো বিয়েই হয়ে যাবে ওদের।

সবাই বিদায় নিল, থালা-বাসন-গেলাস সব গোছগাছ করা হলো, তারই ফাঁকে ভোরের আলো ফুটল। চিলেকোঠায় গিয়ে আমার খাতায় সব ঘটনা লিখে রাখলাম। শেষ যে শব্দগুলো লিখলাম সেগুলো হলো: ভেনাসের সঙ্গে যার এত মিল সে মেয়ের নাচতে না চাওয়া বোকামি। অন্তরে পুলক অনুভব করছি, কারণ যতটুকু যা দেখলাম, তাতে আমার কাটা ঠোঁট নিয়ে মোটেও দ্বিধান্বিত নয় কেস্টার।

সতেজ, ফুরফুরে এক সকাল। গোয়ালে গরুর দুধ দোয়াতে গেছি এসময় ফসলের আঁটির দিকে নজর চলে গেল আমার। খোদার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

কিন্তু হঠাৎ করে 'প্রেশাস বেইন' শব্দ দুটো মনে এল। ভয় ধরল বুকে। বাম্পার ফলন আমাদের জন্যে সুখ বয়ে আনবে তো? নাকি অভিশাপ হয়ে দেখা দেবে?

এগারো

পরদিন সাপার সেরে গিডিয়ন বলল, 'আজ রাতে প্ল্যাশে যাচ্ছি আমি, প্রু। ফিরতে দেরি হবে দরজা লাগিয়ে দিস না।'

ওকে সযত্নে শেভ করে সবচেয়ে সুন্দর কোটটা পরতে দেখলাম। তারপর মনের সুখে শিস দিতে দিতে প্ল্যাশের পথ ধরল।

দু'সপ্তাহর মধ্যে বিয়ে হবে ওদের। গোলাপে ছেয়ে গেছে গাছগুলো। আমি তাহলে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, বিষণ্ন কেন?

প্রতিদিন সন্ধেবেলা, প্ল্যাশে চলে যায় গিডিয়ন, রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ফেরে। সারাদিন কাজ করে আর শিস বাজায়।

জেনসিস আর গিডিয়নের জন্যে একটা শোবার ঘর ঠিকঠাক করে রেখেছি আমি। গোলাপ ফুলের ছাপ দেয়া সুন্দর সুন্দর রঙিন কাগজ সাঁটিয়েছি দেয়ালে।

বিয়ের প্রস্তুতি চলছে পুরোদমে, এমনি সময় এক সকালে, পাগলিনীর মত ছুটতে ছুটতে আমাদের বাসায় এলেন মিসেস বিগাইল্ডি।

'হায় হায় গো!' চেঁচিয়ে উঠলেন। 'এখন কি হবে গো! উনি ফিরে এসেছেন!'

'কে? মিস্টার বিগাইল্ডি?'

'হ্যাঁ। কে যেন গিডিয়নের কথা তাঁকে লাগিয়েছে। পাঁচ দিন পর বিয়ে হবে, ছেলেটা রাতে জেনসিসের সঙ্গে থাকে বলে আমি কিছু মনে করিনি। আমাদের শোবার ঘরটা ওদের ছেড়ে দিয়ে নিজে রান্নাঘরে ঘুমাচ্ছি আমি।

'কাল রাতে শুতে যাচ্ছি জেনসিসের বাবা এসে হাজির। জেনসিস কোথায় জানতে চাইলেন।

' "ঘুমাচ্ছে,' বললাম আমি।

'আমার দিকে একবার তাকিয়ে ওপরতলায় ছুটে গেলেন উনি। ওদের দু'জনকে একসাথে দেখতে পেয়ে খেপে উঠে ভয়ঙ্কর বদদোয়া করলেন গিডিয়নকে, "আগুনে-পানিতে আবারও অভিশাপ দিলাম তোমাকে। আমার মেয়েকে তুমি পাবে না!"

'গিডিয়ন হেসে উঠে বলল "পেতে আর কিছু বাকিও নেই।"

'একথা শুনে ওর বাবার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। পুরানো বন্দুকটা তুলে নিলেন উনি। আমি আর জেনসিস ভয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। গিডিয়ন এক ঘুষিতে ওঁকে মাটিতে ফেলে দিল। উনি পড়লেন যে পড়লেনই আর নড়েন চড়েন না।'

"ওর পা দুটো ধরুন, মা বিগাইল্ডি," বলল গিডিয়ন। "ওকে রান্নাঘরে রেখে আসি। মরল কি বাঁচল তার আমি থোড়াই পরোয়া করি। আজ রাতে তো আর

কেউ বিরক্ত করতে আসছে না!"

'রেগে গেলে তোমার ভাই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, প্রু,' বললেন মিসেস বিগাইন্ডি।

'বিগাইন্ডির কি হলো?'

'ওঁকে শক্ত করে বেঁধে গায়ে পানি ঢেলে দিলাম। তারপর ব্র্যান্ডি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।

'তোমার ভাই সকালে চলে এলে ওঁর বাঁধন খুলে দিই,' বলে চলেছেন উনি। 'চুপচাপ বাইরে চলে গেলেন। সেজন্যেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমি তো চিনি আমার স্বামীকে, বিগাইন্ডির শান্ত-শিষ্ট ভাব মানে সামনে ঝড় আসছে।'

তড়িঘড়ি প্ল্যাশে ফিরে গেলেন মহিলা, আফসোস করে গেলেন বিয়ের দিনটা আরও আগেই কেন এল না।

হঠাৎ করে জোরাল বাতাস বইতে লাগল সেদিন। আঁটি নিয়ে চিন্তা নেই, নিরাপদ আছে ওগুলো, আশ্বস্ত করল আমাকে গিডিয়ন। দু'দিনের মধ্যেই এক লোক আসবে ফসলের দাম যাচাই করতে। তার তিনদিন পর বিয়ে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল সে রাতে। উজ্জ্বল লাল আলো দেখতে পেলাম চারদিকে। সে সঙ্গে প্রচণ্ড গর্জন। আমার ঘরের দরজার পাশ দিয়ে সবেগে দৌড়ে গেল গিডিয়ন, আমাকে আর মাকে উঠে পড়তে বলল।

এক ছুটে নিচে, উঠনে নেমে এলাম আমি। আলো আর শব্দের উৎস আবিষ্কার করলাম। আমাদের ফসল, আমাদের ভবিষ্যৎ, চোখের সামনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!

হায়, খোদা, একি হলো! নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা। গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম, মুখে এসে লাগছে তীব্র, আগুনে হলকা।

আঁটি থেকে আঁটিতে বাতাসের ঝাপটায় ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। আগুন যতই জোরদার হচ্ছে, প্রতিটি আঁটি প্রথমে পুড়ে সাদা, তারপর লাল হয়ে যাচ্ছে। আর সে কী গনগনে দীপ্তি!

সেক্সটনের পরিবার কাছেই থাকে, উঠনে গিডিয়নের সঙ্গে তাদের দেখা গেল। এক সারিতে দাঁড়িয়ে, কুয়ো থেকে পানি তুলে, হাতে হাতে বালতি চালান করছি আমরা। কিন্তু লোকসংখ্যা বড়ই অপ্রতুল। আগুন ইতোমধ্যেই তার করাল থাবা বসিয়ে দিয়েছে।

একদম সেই ভোরের দিকে, বাতাস ঝিম মেরে বৃষ্টি শুরু হলে–সে অনেক দেরিতে–নিভে গেল আগুন। খোদাকে শুকরিয়া, বাড়িটা আর জন্তু-জানোয়ারগুলো রক্ষা পেয়েছে।

কিন্তু কালো ছাইয়ে ছেয়ে গেছে উঠন। সর্বনাশ ঘটে যাওয়ার পর, আগুন লাগার কারণ জানা গেল একসময়।

'টিভি আর আমি রাত করে বাড়ি ফিরছিলাম,' বলল স্যামী, সেক্সটনের ছেলে। 'বিগাইন্ডিকে দেখি স্পর্নের দিকে হেঁটে আসছে। আমরা ওর পিছু নিই, বাজে লোক, কি মতলব তার কে জানে।

'একটু পরে দেখি উঠনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বিগাইন্ডি আমাদের

পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। উঠনে এসে দেখি এটা পড়ে আছে—'

চমকাবার পাশের জায়গায় একটা বাক্সের ঢাকনা তুলে ধরল ন্যান্সি, বিশাইডিস এর দেখা ওতে।

'শয়তানটাকে আমি আস্ত পুড়িয়ে মারব,' উন্মাদের মত বলে উঠল পিডিয়ন।

'অভিশাপ দেখেছে!' মা চেঁচাল। 'বিশাইডি আমার ছেলেকে জাদুমন্ত্র পাঠিয়ে বশ করেছিল। আমার পাশ প্রতিভা ছেলেটার ওপর অভিশাপ পড়েছে!'

চরকির মত ঘুরে দাঁড়িয়ে চমকাবারে খেপাটে দৃষ্টি বুলাল পিডিয়ন। ঘুরে চক্কুরের মত ঠাঁড় পড়ে গেছে ওর মুখের চেহারায়।

ছাঁচ বলা নেই কওয়া নেই, আন্তাবলের উদ্দেশে পা বাড়াল ও। ওর মাথার ভি চলছে ঘুরে পেছি, তাই দৌড়ে পেলাম পেছন পেছন।

'পিডিয়ন!' প্রতিবাদ করে ডাকলাম। 'আগে এসে পরামর্শের একটা বাবস্থা করি, তারপর প্র্যাশে যেয়ো।'

অনেক আগেই সুখ দোয়ানোর সময় পেরিয়ে গেছে। আমার কথা শুনে ঠাঁস দিয়ে, দোয়ালে তড়ুনি দিয়ে চলল পিডিয়ন।

'কেনডিথোকে নিয়ে প্র্যাশে চলে যাও,' মেয়েটির আর স্যান্ডিকে উদ্দেশ্য করে বলল। 'বিশাইডিকে লাগিয়ে দিয়ে দিয়ে ছেলে ছোকরাও। আইন তাকে যা শাস্তি দেবার দেবে।'

ঘোড়ার উঠল ড্যাশের শব্দ কানে এলে, পিডিয়ন দোয়ালঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল।

'বিশাইডিকে ওরা ছেলে নিয়ে যাবে,' বললাম আমি। 'তুমি নিজের হাতে আইন তুলে নিতে পারো না, পিডিয়ন।'

'ও মরলে আমি শান্তি পেতাম,' বলল পিডিয়ন, অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি লক্ষ করলাম ওর মুখে। 'আজকের এই ঘটনা কোনদিন ভুলতে পারব না আমি।'

'কিন্তু তাই বলে শয়তানকে খুন করবে নাকি?'

'কিসের বদলা? কিসের বিয়ে?'

'কেন, কেনডিথোকে তুমি।'

কথা কেড়ে নিল পিডিয়ন।

'বলবেও না, বলবারটি বলে ঠেকিয়ে উঠল ও। 'ওই শয়তানটার মেয়েকে বিয়ে করব আমি? বিয়ে তো দূরের কথা, ওর মুখও দেখব না এ জীবনে।'

'এ তুমি কি বলছ, পিডিয়ন?'

'ঠিকই বলছি, আমার আর পাগল হয়ে গেছে,' বলল ও। 'আমার বাবাকে [illegible] বিয়ে না তুমি তাই করবে পরে [illegible] আমি না [illegible]। ওই [illegible] ওই ছেলেটিকেও খুন করব আমরা।'

'কিন্তু [illegible] এর পেছনে ওই [illegible] এসে [illegible]'

'[illegible] ঠিক [illegible] ও [illegible] এই বিশাইডি [illegible] [illegible] ঠিকিয়ে [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মূর্তির মতন, আমি চলে এলাম।

পরে, উঠনে আবার দেখা পেলাম ওর, ছাইয়ের গাদায় মুখ ডুবিয়ে পড়ে রয়েছে। মরা মানুষের মত নিথর আর শ্রবণশক্তিহীন মনে হলো তাকে। আসলে সেদিন থেকেই, আমার ধারণা, মরে গেল গিডিয়নের হৃদয়টা।

বারো

এর পরের ঘটনাগুলো লিখতে ভীষণ, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে আমার। বড় দুঃসময় গেল আমাদের–ভয়ানক অশান্তি।

অগ্নিকাণ্ডের পর বেশ অনেকদিন খামারে কোন কাজ-কর্ম করলাম না আমরা। প্রতিদিন গিডিয়ন অপেক্ষা করে আজ বুঝি বিগাইল্ডির মৃত্যুসংবাদ কানে আসবে। কিন্তু বুড়ো জাদুকর তখনও সিলভারটনের কারাগারে, আদালতে মামলা ওঠার অপেক্ষায়।

মিসেস বিগাইল্ডি আর জেনসিস বাড়ি ছেড়ে সিলভারটনে, বিগাইল্ডির কাছাকাছি একখানে উঠে গেল। ওয়াগনে চড়ে গেছে ওরা, কারণ জেনসিস অসুস্থ হয়ে পড়েছে–হাঁটার কিংবা ঘোড়ায় চড়ার সাধ্য নেই তার।

জঙ্গলে দাঁড়িয়ে ছিল গিডিয়ন, ওয়াগনটাকে পাশ দিয়ে যেতে দেখেছে। দু'হাত মুঠো পাকিয়ে ঝাঁকাতে দেখেছি ওকে ওয়াগনটার উদ্দেশে।

আমরা সবাই অভিশপ্ত জীবন যাপন করছি, প্রায়ই মনে মনে বলি।

একদিন সকালে, ছাউনি থেকে লাঙলটা বের করল গিডিয়ন।

'আয়, প্রু, বড় জমিটায় লাঙল দিই,' বলল আমাকে।

'কি হবে ওসব করে,' বলল মা। 'ফসল পুড়ে ছাই, বিয়ে বরবাদ–কি পেলাম আমরা? আমার শরীরের অবস্থা খুব ভাল না, প্রু। হয়তো আগামী ফসলটা দেখে যেতে পারব না। পেটের ছেলেটাও আমাকে ভালবাসে না। আমি যে আর কোন কাজে আসি না। আমি মরলেই মনে হয় জানে বাঁচে ও!'

এরপর থেকে সেক্সটনের মেয়ে টিভিকে মার কাছে বসিয়ে, গিডিয়নকে নিয়ে জমিতে যাই আমি।

টিভি মেয়েটা আলসে আর অমনোযোগী, তবে বাড়িতে আমাদের কাজও খুব সামান্য। বিনা বেতনে টুকটাক কাজগুলো করে দেয় ও। আসলে গিডিয়নের জন্যে পাগল মেয়েটা। কিন্তু ওকে খাওয়াতে হয়, আর এখন তো আমাদের আগের সেই রমরমা অবস্থাও নেই।

বড়দিনে লালিংফোর্ডের সরাইখানায় ছোট্ট একটা প্যাকেট দেয়া হলো আমাকে। ভেতরে এক টুকরো কাপড় আর কেস্টারের চিঠি:

লন্ডন টাউন
বড়দিন

প্রিয় প্রু সার্ন,

আশা করি ভাল আছ। আমি একরকম ভালই আছি। দেখতেই পাচ্ছ দু'রঙা কাপড় বুনতে পারি এখন আমি। এখানকার মহিলারা বেঁটেখাট আর ফর্সা। কালো চোখ দেখলাম না একজনেরও। এদের দেখলে, ছোট্ট একটা কামরার কথা মনে পড়ে। জমিদারের ছেলে যেখানে লম্বা-পাতলা এক নারীর সৌন্দর্য উপভোগ করেছে। এক বান্ধবীর হয়ে কাজটা করতে হয়েছিল তাকে। খুব সহজ ছিল না ব্যাপারটা। কিন্তু ঘরে উপস্থিত আরেকজনের চোখে, তাকে মূর্তিমতী ভেনাসের মত দেখিয়েছিল। সেই যুবক কিন্তু কোনদিন মেয়েটিকে ভুলতে পারবে না।

শুভ বড়দিন, এবং নতুন বছরের শুভেচ্ছা–

কেস্টার উডসীভস।

তখুনি বসে পড়লাম জবাব লিখতে।

সার্ন
বড়দিন

প্রিয় তাঁতি,

এই চিঠির সঙ্গে নিজের হাতে বোনা একটা শার্ট পাঠাচ্ছি। ভাল ভাল মন্ত্র পড়ে দিয়েছি এর ওপর। জামাটা পরলে, কখনও অসুখ-বিসুখ করবে না।

দু'জন মিলে জলপদ্ম আর ড্রাগন ফ্লাইদের নাচ দেখেছিলাম, বড্ড মনে পড়ে সেদিনটার কথা।

আজ এখানেই ইতি। খোদা তোমাকে সুখী করুন।

তোমার বাধ্যগত,
প্রু সার্ন।

জানুয়ারি মাসে, ভারী তুষারপাত হলো। মা এক রাতে এতটাই অসুস্থ হয়ে পড়ল হাতুড়ে ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। এসব অঞ্চলে শিক্ষিত ডাক্তারের সংখ্যা এতই অল্প যে প্রশিক্ষণহীন হাতুড়ে ডাক্তার দিয়েই কাজ চালাতে হয়। মাকে মন দিয়ে পরীক্ষা করে নিচে নেমে এল সে।

'আরও কিছুদিন আয়ু আছে তাঁর,' আগুনের পাশে বসে খোশমেজাজে বলল লোকটা।

'কত বছর?' চট জলদি প্রশ্ন করল গিডিয়ন।

'বলা শক্ত। হয়তো দশ বছর। যদি ঠিকমত যত্ন আত্তি করা হয়।'

'দ-শ বছর!' টের পেলাম হতাশা ঝরল গিডিয়নের কণ্ঠস্বরে।

'হ্যাঁ। নিয়মিত ওষুধ খাইয়ে যেতে হবে। শীতকালে, বিছানা থেকে নামতে দেবেন না। পরে অবশ্য এমন সময়ও আসতে পারে, সারা বছরই বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।'

'আরমানে আর কোনদিন কাজ করতে পারবে না,' বিড়বিড় করে বলল গিডিয়ন।

আবহাওয়া বেজায় খারাপ, ফলে ডাক্তারকে ক'দিন থেকে যেতে হলো। সে বিদায় নেয়ার আগে, আমাদের পুরানো গাভীটার ব্যাপারে প্রশ্ন করল গিডিয়ন।

গাভীটার জ্বর হয়েছে, বলল সে। 'বুক ধড়ফড় করছে। শিয়ালকাঁটার এক দাগ খাওয়ালে কি সারতে পারে?'

'তা পারে,' বলল লোকটা। 'শিয়ালকাঁটার বিষ বুক ধড়ফড়ানি থামিয়ে দেবে। তবে বেশি দেবেন না। মারা পড়বে।'

তারপর থেকে, প্রতিদিন মার শরীরের খোঁজ নেয় গিডিয়ন। এমনই উঁচু স্বরে কথা বলে, মা বেচারী ভয় পেয়ে যায়।

'কি বিশ্রী কাশি ধরেছে মাগো,' বলে ও। 'খুব কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই? এ জীবন রেখে কি লাভ বলো?'

'তুই ঠিকই বলেছিস, বাপ,' মা একদিন মলিন মুখে বলল।

উত্তরটা শুনে খুশি মনে হলো গিডিয়নকে।

এপ্রিলের এক দিন, জমিতে বীজ বুনছি, চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এল টিভি।

'জলদি এসো, প্রু। তোমার মার অবস্থা খুব খারাপ। গিডিয়ন কড়া করে চা বানাতে বলেছিল। তাই খেয়ে একদম কাঠ হয়ে গেছে। তোমার নাম ধরে ডাকছিল।'

দৌড়ে বাড়ি ফিরে এলাম। ঝুঁকে পড়ে মাকে চুমু খেতে মা বলল, 'চা-টা খুব তেতো ছিল রে।' তার খানিকক্ষণ পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল আমার স্নেহময়ী মা।

'গিডিয়ন!' চিৎকার করে উঠলাম। 'চায়ে কি ছিল?'

'তার আমি কি জানি?'

'ওহ্, সার্ন,' বলল টিভি। 'তুমি না আমাকে বললে কড়া করে বানাতে আর তোমার মা যাতে পুরোটা খায় দেখতে।'

'চোপ, মিথ্যুক কোথাকার!' গর্জে উঠল গিডিয়ন। 'নইলে তোর মুখ দিয়ে বলিয়ে ছাড়ব গত রবিবার চিলেকোঠায় আমার সাথে কি করছিলি!'

মুখখানা লাল হয়ে গেল টিভির। উচ্চবাচ্য করল না আর সে।

ডাক্তার ডাকলাম আমি। মা কেন মারা গেল জানতে চাই। মাকে কখনও শিয়ালকাঁটা দিয়েছি কিনা জানতে চাইল ডাক্তার।

'শিয়ালকাঁটা? কেন, শিয়ালকাঁটা দেব কেন?' আমি তো থ। 'মা কিভাবে মারা গেছে বলুন আমাকে।'

'আমি নিজেও সেটা জানতে চাই,' বলল ডাক্তার।

'তদন্ত করালে কেমন হয়,' সুপারিশ করলাম আমি।

'করাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'তদন্তের দরকার আছে কিনা সে ব্যাপারে অতখানি নিশ্চিত হতে পারছি না, বলল ডাক্তার। 'প্রচুর টাকা খরচ। মৃতের তাতে কোন উপকার হয় না। আর তদন্ত চান বলেই প্রমাণ হচ্ছে তদন্তের আসলে কোন প্রয়োজন নেই। থাক, বাদ দিন।' সে সময়, ডাক্তারের কথার মর্মার্থ বুঝে উঠতে পারিনি আমি। কিন্তু পরে, সমস্ত রহস্য খোলসা হয়েছিল আমার কাছে।

*

এবাড়ি কোনদিন এখনকার মত এত নিরিবিলি দেখিনি। মাকে বড় মনে পড়ে। প্রায়ই তার কথা ভেবে কান্নাকাটি করি আমি।

কাজ তাই বলে থেমে নেই। বাজারে বিক্রি করার মত মালপত্র জমে গেল আবার।

হয় গিডিয়ন আর নয়তো আমি যাব লালিংফোর্ড।

গিডিয়ন যখনই যায়, মিস ডোরাবেলা কিছু না কিছু কেনে ওর কাছ থেকে। টিভির মত সে-ও কাছে পেতে চায় গিডিয়নকে।

টিভিকে পাত্তাও দেয় না গিডিয়ন, জানি আমি। কিন্তু ওর শরীর গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই তার। কাজ না থাকলে, টিভিকে সঙ্গ দেয় ও।

মার কথা ভুলেও উচ্চারণ করে না গিডিয়ন, তবে মার শূন্য চেয়ারটার দিকে প্রায়ই কেমন অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকায়। মাঝেমধ্যে, চারদিক যখন চুপচাপ, কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করে।

মে এল। গাছে-গাছে, ফুলে-ফুলে রঙের বাহার দেখি আর কেবল কেস্টারের রঙিন বুননের কথা মনে পড়ে।

রান্নাঘরে একদিন খাওয়া সারছি আমরা, এসময় জানালার পাশ দিয়ে সাঁৎ করে চলে গেল কি যেন। তারপর দরজায় মৃদু টোকার শব্দ শোনা গেল। সাড়া দিতে দেখি, জেনসিস দাঁড়িয়ে।

ধবধবে সাদা এক পোশাক গায়ে ওর, মুখের চেহারা মড়ার মতন ফ্যাকাসে। শালে মুড়ে, পুতুলের মত এক বাচ্চা নিয়ে এসেছে।

'আরে, তুমি এখানে এলে কিভাবে, জেনসিস?' আমি প্রশ্ন করলাম অবাক কণ্ঠে।

শ্বেতবসনা জেনসিস কোন কথা না বলে কিচেনে প্রবেশ করল। বাচ্চাটাকে মেঝেতে, গিডিয়নের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল ওটার পাশে।

ওর সোনালী কেশ গুচ্ছে রোদ ঝিকোচ্ছে। সাদায় আর সোনালীতে মাখামাখি এমুহূর্তে ও।

আমার গাল বেয়ে অশ্রু গড়াল। মা-বেটা দু'জনকেই কেমন রোগাভোগা, মলিন দেখাচ্ছে। টিভি বসে মুখ হাঁ করে, কিন্তু গিডিয়নের মধ্যে কোন ভ্রূক্ষেপ দেখা গেল না।

'ওগো,' ফিসফিস করে বলল জেনসিস। 'আমার দিকে একটিবার তাকাও। সুখের সেই দিনগুলোর কথা কি একবারও মনে পড়ে না তোমার? আমাকে তুমি কত ভালবাসতে। আমাকে ছাড়া আর কিছু বুঝতে না। একটুও কি মনে পড়ে না আমার কথা?'

'ওসব পুরানো প্যাঁচাল ছাড়ো ' কঠোর মুখ করে বলল গিডিয়ন।

বাচ্চাটাকে তুলে ধরল জেনসিস, কিন্তু পিঠ ফেরাল গিডিয়ন।

'তোমার ছেলে,' বলল জেনসিস। 'তোমাকে ও খামারের কাজে সাহায্য

করবে। দেখো, তোমার মতই মন দিয়ে খাটবে তোমার ছেলে।'

ছেলের দিকে চেয়ে কর্কশ হাসি হাসল গিডিয়ন।

'ওইটা?' বলল। 'ওইটা করবে কাজ? আরে, বাঁচে কিনা দেখো।'

বাচ্চাটা কেঁদে উঠল, বাবার কথা বুঝতে পেরেই যেন।

গিডিয়ন উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল।

'যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও,' বলল। 'তোমাকে এখানে কেউ চায় না–তোমার ওই বাচ্চাটাকেও না।' দরজাটা সশব্দে লাগিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ও।

ধপ করে মেঝেতে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল জেনসিস। দৌড়ে ওর কাছে গিয়ে ওকে ধরে ধরে সেটলে বসালাম আমি। চা খেতে দিলাম, কাপে চুমুক দিতে বেচারীর দু'গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে নামল দরদর করে।

'সেই সিলভারটন থেকে হেঁটে এসেছি, প্রু,' কোনমতে আওড়াতে পারল।

'তোমার মা এ ব্যাপারে কি ভাবছেন?'

'মা নেই, মারা গেছে।'

'বলো কি! আমি দুঃখিত। তুমি তাহলে এখানে, আমাদের সাথে থাকবে, জেনসিস।'

'তা হয় না, প্রু। গিডিয়ন তো আমাকে আর ভালবাসে না।'

'তাতে কি, আমি যতদিন আছি কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো।'

টিভি হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, 'এঁহ, তুমি বললেই হলো? ও এখানে থাকতে পারবে না। সার্ন আমাকে বিয়ে করবে। মানে করতেই হবে ওকে।'

'করলে তো ভালই হত,' মেয়েটার দিকে চেয়ে বললাম। 'কিন্তু সত্যিই করবে তো?'

টিভি গর্ভবতী।

'না করে যাবে কোথায়,' বলল টিভি। 'কেন শুনবে? শিয়ালকাঁটার চা, সেজন্যে।'

'কি বলতে চাইছ তুমি?'

'তোমার মায়ের চায়ে শিয়ালকাঁটার পাতা মেশানো হয়েছিল। গিডিয়ন কড়া করতে বলেছিল চা-টা।' এবার জেনসিসের উদ্দেশে ফিরে বলল টিভি, 'তুমি যদি এখানে এক রাত থাকো, গিডিয়নের অপকর্মের কথা সব্বাইকে বলে দেব আমি।'

মেজাজের রাশ আমার আলগা হয়ে গেল।

'যা! শিগ্‌গির বেরো এবাড়ি থেকে। দুধের বাচ্চাটার প্রতিও এতটুকু দয়া নেই তোর মনে? তুই আর গিডিয়ন যা খুশি করগে যা। তুই এখানে বাস করতে এলে, আমি চলে যাব। কিন্তু আজকের জন্যে তুই দূর হচ্ছিস–যা, এখুনি দূর হয়ে যা!'

আমার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে হতচকিত টিভি একরকম পালিয়ে বাঁচল।

'তুমি সেটলে আরাম করো, জেনসিস,' বললাম আমি। 'সোনামণিটার যত্ন নাও।'

'ধন্যবাদ, প্রু,' কোনমতে বলতে পারল ও।

বাইরে বেরিয়ে খুঁজে বের করলাম গিডিয়নকে।

'টিভি বলে গেল মাকে নাকি বিষ খাইয়ে মেরেছ। কথাটা কি সত্যি?'

'বলে কি, বেটীকে ধরে তো আচ্ছাসে প্যাঁদাতে হয়।'

'তা না হয় পেঁদিয়ো,' বললাম। 'কিন্তু মা যাতে চা-টা খায় তুমি সে ব্যবস্থা করেছিলে, তাই না?'

'মার আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে ছিল না। আর তাছাড়া ফার্মের কাজে আসছিল না, বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব নাকি?'

'স্বীকার যখন করলেই, একজন খুনীর সাথে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। তোমার সাথে সব চুক্তি আজ থেকে চুকে গেল।'

'তুই কথা দিয়েছিলি আমার কথা মত চলবি, যেভাবে বলব করবি।' খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল গিডিয়ন।

'খুনীর কাছে আবার কিসের ওয়াদা রক্ষা?' বললাম। 'তোমার তো টিভি রইলই।'

'কে চায় ওকে? অকম্মার ধাড়ি একটা।'

'যে কোন একটা তোমার বেছে নিতে হবে। হয় টিভি নয়তো ফাঁসির দড়ি।' বললাম দৃঢ়কণ্ঠে। 'মায়ের পেটের ভাই, তোমাকে ঘেন্না করতে পারব না। কিন্তু কেন করলে অমন কাজ? যে মা তোমাকে পেটে ধরেছে, এত বড় করেছে তাকে খুন করতে তোমার হাত কাঁপল না? কি করে পারলে?'

'মাকে দিয়ে কোন কাজ হত না বললাম না,' গিডিয়ন বলল আবারও। 'যাকগে, ফসল কাটা পর্যন্ত তোর থাকতে হবে, প্রু।'

'না। টিভি তোমার বউ হয়ে এলেই আমি চলে যাব। এবং বিয়েটা খুব শিগগিরি সারতে হবে তোমাকে। কিন্তু জেনসিস আর তোমাদের বাচ্চাটার কথা কি ভাবছ?'

উঠনের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করল গিডিয়ন।

'জেনসিস কার মেয়ে জানিসই তো,' বলে আপন মনে আরও বলল, 'কিন্তু ওকে একসময় ভালবাসতাম আমি।'

ওকে ভাবনা-চিন্তা করতে দিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম আমি।

কিন্তু রান্নাঘরটা ফাঁকা।

এক দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে এমাথা-ওমাথা নজর বুলালাম। কিন্তু না, জেনসিস নেই। এবার বাড়িতে ছুটে এসে প্রতিটা ঘর তল্লাশী করলাম আর গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগলাম, 'জেনসিস, জেনসিস।'

দৌড়ে বেরিয়ে গেলাম আবারও নাম ধরে ডাকছি ওকে। বাতাসে ফুলের আশ্চর্য সুবাস।

অবশেষে গিডিয়নের কাছে ছুটে এসে বললাম, 'জেনসিসকে কোথাও খুঁজে

পাচ্ছি না।'

'ওকে তো যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যেতে বললাম।'

'কিভাবে যাবে? সঙ্গে টাকা-কড়ি নেই, মা-টাও মারা গেছে। বাবা জেলখানায়, কি হবে তার ভাগ্যে কেউ জানে না। সিলভারটন থেকে মাইলকে মাইল হেঁটে এসেছে ও, আর তুমি কিনা ওকে তাড়িয়ে দিলে!'

গিডিয়ন কর্ণপাত না করে কাজ করে চলল।

'মেয়েটাকে এসো খুঁজে বের করি,' বললাম। 'সবখানেই তো দেখলাম। এখন শুধু ..'

হ্রদের দিকে আঙুল ইশারা করলাম।

'কি? আমাকে ভয় দেখাতে চাইছিস নাকি?'

কিন্তু আমার সঙ্গে মেয়ারের তীরে এল ও।

পানিতে নেমে গেছে যে পথটা তার ওপর বাচ্চার এক পাটী জুতো পড়ে আছে। হ্রদের জলে অসহায় জেনসিস আর তার নিষ্পাপ বাচ্চাটার লাশ–জলপদ্মের গুচ্ছের মধ্যে ভাসছে। বিনাবাক্যব্যয়ে, পানিতে নেমে লাশ দুটো উদ্ধার করলাম আমরা, বয়ে নিয়ে এলাম বাসায়।

ওদের গোসল করিয়ে, পরিষ্কার সাদা কাপড় পরিয়ে মার বিছানায় শোয়ালাম আমি। তারপর সাদা আর সোনালী ফুল দিয়ে ঢেকে দিলাম খাটটা–বেচারী জেনসিস বেঁচে থাকতে ঠিক যেমনটা দেখতে ছিল।

লোকজন এল জেনসিস আর তার বাচ্চার লাশ দেখতে।

মহিলাদের চোখে জল, পুরুষদের কণ্ঠে সহানুভূতি।

পুরোটা সময়, নিশ্চুপ রইল গিডিয়ন। তবে চার্চইয়ার্ডে লাশ নেয়ার আগে, শুনতে পেলাম লাশের ঘরে গেল গিডিয়ন।

ওখানে নীরবে দাঁড়িয়ে ছিল ও। তারপর আলতো হাতে জেনসিসের চুল ছুঁয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমি একসময় ওকে ভালবাসতাম।'

তেরো

কাহিনীর সবচাইতে ভয়ানক অংশে এবার পৌঁছে গেছি আমরা। ঘটনাগুলো পরপর সাজিয়ে লেখা বড়ই কষ্টকর হবে আমার জন্যে, তবু চেষ্টা তো করতে হবে। আমি চাই সত্য জানুক লোকে।

গিডিয়ন আগে থেকেই শান্ত স্বভাবের ছিল, কিন্তু সে ঘটনার পর থেকে একদম চুপসে গেল।

টিভি ওকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু সার্নে বাস করতে ভয় পায়। কাজেই আমাকেই সব কাজ করে যেতে হচ্ছে।

জুলাই এসে গেল। আবহাওয়া প্রচণ্ড গরম। একদিন, দরজার কাছে বসে

সুতো কাটছি এসময় সহসা কোণার দিক থেকে উদয় হলো গিডিয়ন ঘামে জবজব করছে ওর সারা দেহ।

'ওখানে মার মত সেজে বসে আছিস কেন?' গর্জে উঠল। 'মা ওখানে বসে সুতো কাটত। আমি ভেবেছিলাম মা-ই বুঝি।'

'দেখতেই পাচ্ছ আমি,' বললাম। 'ওভাবে ছুটতে ছুটতে এলে যে?'

'হেজ কাটছি দেখি সে তার ওপর চড়ে বসে আছে, গায়ে সাদা কাপড়।'

'কে?'

'জেনসিস।'

এর পরের বার ও দেখল, জেনসিস দুটো সাদা বলদ দিয়ে খেতে হাল চষছে, আর ওর বাচ্চাটা বসে রয়েছে একটা বলদের পিঠে।

'এসব চিন্তা মাথায় ঠাঁই দিয়ো না,' হুঁশিয়ার করলাম। 'পাগল হয়ে যাবে।'

'আমি ওর কথা ভাবি না তো,' অসহায় কণ্ঠে বলল ও। 'ও নিজে থেকেই এসে পড়ে।'

'অন্য কিছু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাও,' পরামর্শ দিলাম। 'বেশি বেশি খাটো, পয়সা জমাও, বাড়ি কিনবে না তুমি?'

'চাই না আমার।'

'বলো কি? বাড়ির লোভে অন্ধ হয়ে না মাকে বিষ খাওয়ালে জেনসিসকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে!'

'এখন আর ওসব চাই না। পানিতে ওদের লাশ দেখার পর থেকে সব কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে।'

'তাহলে টিভির কথা ভাবো। নয়তো মিস ডোরাবেলা। সে তো কামনা করে তোমাকে, ঠিক না?'

'ডোরাবেলা শ্যামলা মেয়ে। আমার পছন্দ ফর্সা, নীল চোখের মেয়ে।'

'তবে আমার কথা ভাবো। আমি আরও কিছুদিন থাকব। কিন্তু তোমাকে পুরানো কথা ভাবা বাদ দিতে হবে।'

কিন্তু আমি ওকে কোনরকম সাহায্য করতে ব্যর্থ হলাম। ক'দিন বাদে, আবারও জেনসিসকে দেখল ও; তারপর আরও অনেকবার।

'আজ ওকে দেখলাম জঙ্গলে,' গিডিয়ন বলে। নয়তো, 'রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিল ও। মেয়ার থেকে উঠে এসেছে ভেজা গায়ে।' একবার হ্রদের মাঝখানে একটা নৌকায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল জেনসিসকে।

তারপর আগস্টের শুরুতে, একদিন হ্রদের ওপার থেকে জেনসিসের গান কানে এল ওর।

জানালা লাগিয়ে দিলাম, তবু নাকি গান শুনতে পায় গিডিয়ন।

মধ্য আগস্ট। সার্ন মেয়ারে মেলা বসবে। গির্জা আর হ্রদের মাঝখানের ময়দানে মেলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে লোকজন।

মিস ডোরাবেলার পাঠানো চিঠি পড়ে শোনালাম গিডিয়নকে; ও জানিয়েছে, বিগাইল্ডি শিগগিরিই ছাড়া পাচ্ছে জেল থেকে।

ধুস শালা। ভেবেছিলাম ব্যাটা ফাঁসিতে লটকাবে,' বলল গিডিয়ন, ঘৃণায় ধকধক করে জ্বলে উঠল ওর দু'চোখ। কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিভে গেল।

ইতোমধ্যে, মাকেও দেখতে শুরু করেছে ও।

'হ্যাঁ, প্রু। মা-ই ছিল ওটা। মা আর জেনসিস দু'জনকেই দেখতে পাই এখন আমি।'

চুপচাপ বসে আছি দু'জনে ফিসফিসিয়ে বলল গিডিয়ন 'ওই শোন! জেনসিস গান গাইছে!'

গিডিয়ন একটা হাত তুলে জেনসিসের প্রিয় গানটা গাইতে লাগল। খোলা দরজায় দৃষ্টি নিবদ্ধ ওর।

'ওই যে জেনসিস,' বলল ও। 'মেয়ার থেকে উঠে এসেছে। দেখ দেখ, ওর গাউনটা কেমন সপসপ করছে।' মেঝের দিকে চোখ রেখে দীর্ঘক্ষণ বসে রইল ও।

শেষমেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল জানোয়ারগুলোর দেখাশোনা করতে যাচ্ছে। অচেনা-অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওকে, একবার ভাবলাম সঙ্গে যাব। কিন্তু কি ভেবে বসে রইলাম, বই পড়লাম প্রায় আধ ঘণ্টা মত।

ন'টার দিকে দরজায় টোকার শব্দ। তারপর হুড়মুড় করে ভেতরে প্রবেশ করল স্যামী, সেক্সটনের ছেলে।

'প্রু, প্রু, সার্নকে একটু আগে দেখলাম মেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘুমন্ত মানুষের মত পথটা ধরে হেঁটে যাচ্ছে। তারপর নৌকায় চড়ে হ্রদের মাঝখানে চলে গেল।'

ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে চলে গেলাম হ্রদের কাছে। পানিতে নৌকা দেখলাম, তবে গিডিয়ন নেই।

মেয়ারে সলিল সমাধি ঘটেছে গিডিয়ন সার্নের। আমার ভাই শক্তিশালী, কঠোর মনের মানুষ ছিল। যারা ওকে ভালবেসেছে তাদেরই ক্ষতি করেছে সে। কিন্তু এখন নিজের জীবন দিয়ে সবার ঋণ শুধে গেল।

চোদ্দ

সে রাতের বীভৎসতা আর দুঃখ কোনদিন ভোলা যাবে না। একাকী বসে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৃতের জন্যে দোয়া করছি। বিগাইন্ডির আগুন এবং পানির অভিশাপের কথা ভাবছি। একে একে মনে পড়ছে মৃত মানুষগুলোর মুখ–মা, বাবা, জেনসিস, তার দুধের বাচ্চা, মিসেস বিগাইন্ডি সবার কথা ঘুরেফিরে মনে পড়ছে।

সুখের দিনগুলোর কথাও স্মৃতিতে ভেসে উঠছে।

এ বাড়িতে একা থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমার সঙ্গে আর কেউ থাকতে চাইবে বলেও মনে হয় না। সবার কাছে ভূতের বাড়িতে পরিণত হয়েছে এটা। চলে যেতে হবে আমাকে। কিন্তু জানোয়ারগুলোর কি হবে?

ভোরে মনে পড়ল আজ মেলার দিন। জানোয়ারগুলোকে মেলায় বেচে দেব ঠিক করলাম।

নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই। হ্রদের তীর বরাবর মেলার মাঠের উদ্দেশে পা চালালাম। লোকজন জমতে শুরু করেছে দেখলাম।

মিস্টার হাগলেট আর মিস্টার গ্রিম্বল দু'জনকেই দেখতে পেলাম। আমার দিকে কটমট করে চাইল তারা।

গোটা মেয়ার জুড়ে ড্রাগন ফ্লাই পানিতে নেচে বেড়াচ্ছে। কেস্টারের কথা বড্ড মনে পড়ছে। আমাকে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে সে।

জানোয়ারগুলোকে বিক্রির কথা পাকা করে বাসায় ফিরে গেলাম আবার। সবক'টা জানোয়ারকে জড় করলাম। বুড়ো বেনডিগোর পিঠে চড়ে, ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলাম মেলার মাঠে।

এবার ফিরলাম পাখিগুলোর জন্যে, ঝুড়িতে ভরে ওগুলোকেও নিলাম মেলায়। সব শেষে, একটা ঝুড়িতে বিড়ালটাকে ভরে নিয়ে বাড়িতে তালা মেরে দিলাম।

খামার ত্যাগ করলাম আমি। সঙ্গে নিলাম কেবল বাইবেল আর আমার প্রিয় খাতাটা। কোথায় যাব জানি না। মনটা বড্ড টাটাচ্ছে। কিন্তু যেতেই হবে যে আমাকে।

মেলায় ফিরে এসে দেখি জানোয়ারগুলো বিক্রি হয়ে গেছে। চার্চইয়ার্ডের দেয়ালে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি। টাকাটা হাতে পাইনি এখনও।

মেষপালকের স্ত্রী, ফেলেনাকে বেড়ালটা উপহার দিলাম। কেস্টারের কথা জানতে চাইল ও। বললাম বহু দিন কোন যোগাযোগ নেই।

তো দেয়ালে বিমর্ষচিত্তে বসে আছি, লোকজন পাশ দিয়ে আসছে যাচ্ছে। আমার দিকে তীব্র ঘৃণামিশ্রিত চাহনি হানছে তারা। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। মেলায় কমপক্ষে শ'তিনেক লোক জড় হয়েছে। টাকাটা নিয়ে কখন যে যাব।

একজনের মুখে শুনলাম হাগলেট আর গ্রিম্বল আমাকে নিয়ে নাকি লোকের কান ভারী করছে। আমি নাকি একটা ডাইনী আর তার ওপর বিগাইল্ডির অভিশাপ পড়েছে আমাদের ফার্মের ওপর। একে একে তাই মা, জেনসিস এবং সবশেষে গিডিয়ন মারা পড়েছে।

আমি একা যেহেতু বেঁচে, লোকে বলাবলি করছে আমি নাকি অপয়া, আমার কারণেই নাকি এসব ঘটেছে। শয়তানের চিহ্ন নয় কি আমার কাটা ঠোঁট? বুড়ো জাদুকর শয়তান বিগাইল্ডির কাছে কি হাতে খড়ি হয়নি আমার?

লোকের এসব কথা নিয়ে ভাবছি, এসময় টিভি দৌড়ে এসে বলে, 'তুমি আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, প্রু সার্ন। এখন দেখো আমি কি করি।' একথা বলে লাফ মেরে দেয়ালে চড়ে বসে চিৎকার ছাড়ল, 'আপনারা সবাই শুনুন, আমার প্রতি কী অবিচার করা হয়েছে। পাঁচ মাস আগে সার্নের সাথে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই প্রু সার্ন তা হতে দেয়নি। আমাকে সে বাসা থেকে অপমান করে বের করে দেয়। ডাইনী মেয়েমানুষটা ফার্মে আর কোন মেয়ে আসুক

তা চায়নি। আর আজ আমার সার্ন মারা যাওয়ার পরদিনই, ঘটি বাটি সব বেচে দিয়েছে। আজ আমি সার্নের বউ হতাম, শুধুমাত্র এই মেয়েলোকটা যদি বাধা না দিত!'

এবার মুখ খুলল গ্রিম্বল।

'ভাই-বোনেরা,' বলল। আজ বড় কষ্টের দিন। একজন সৎ কৃষক কাল ডুবে মারা গেছে পানিতে। সতী-সাধ্বী এক মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছিল সে।

'এখন শুনুন সবাই মন দিয়ে। প্রুডেন্স সার্ন জন্ম থেকেই অভিশপ্ত এক মেয়েলোক। আমরা জানি মাঠে-ময়দানে খরগোসের মত ছুটে বেড়ায় ও। আমার কুকুরটার কি দশা করেছিল আপনাদের মনে নেই?

'কিন্তু সেটাই শেষ নয়, অপকর্মের আরও বাকি ছিল। ওর মা মারা গেল কিভাবে? শিয়ালকাঁটার চা খেয়ে। বিষাক্ত চা। অসুস্থ মার দেখাশোনা কে করে? তার মেয়ে, সহজ উত্তর। আপনারা এব্যাপারে কি বলবেন?'

জনতা কাছিয়ে এল এবং ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। কিন্তু গ্রিম্বলের বক্তৃতা তখনও শেষ হয়নি।

'জেনসিস আর তার বাচ্চা যখন ডুবে মরে তখন বাসায় একা ছিল কে? আর কে, প্রুডেন্স সার্ন! ডাইনীটা জেনসিসকে ঘৃণা করত কেন? তার কারণ জেনসিস জানত বুড়ো বিগাইল্ডি প্রু সার্নকে ডাইনী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে।

'আর ডাইনীটা শেষে ওর একমাত্র ভাইটাকেও খেয়েছে। ভাইয়ের বিয়ে হোক চায়নি সে। হ্যাঁ, বন্ধুরা ভাইকে ধাক্কা মেরে পানিতে ডুবিয়ে ফেলে দেয়।'

মুহূর্তখানেক অপেক্ষার পর বলল গ্রিম্বল, 'খোদার গজব আছে ওর ওপর! ডাইনী কোথাকার! খুনী!'

গর্জে উঠল হাগলেট।

'একটা ডাইনীর বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই!'

'মারো শালীকে! মারো! চুবিয়ে মারো ডাইনীটাকে!'

একাধিক কঠিন হাত চেপে ধরল আমাকে। ডাকিং-স্টুল আনতে কিছু লোক দৌড়ে গেল গির্জায়।

কোন মহিলাকে ডাইনী সন্দেহ হলে ডাকিং-স্টুল ব্যবহার করা হয়। টুলে সেই মহিলাকে বেঁধে গভীর পানিতে নামিয়ে দেয়া হয়। মহিলার মাথা চলে যাবে পানির নিচে। মহিলা ডুবে না মরলে বলতে হবে শয়তানের কৃপায় বেঁচে আছে ডাইনীটা। তখন হত্যা করা হবে তাকে। আর যদি ডুবে মরে, তবে ডাইনী নয় আহা মেয়েটা তাহলে ভাল ছিল! অর্থাৎ একজনকে মরে প্রমাণ করতে হবে সে ডাইনী নয়, ভাল মেয়ে ছিল।

'ডাইনী! ডাইনী! মারো ওকে!' জনতার সম্মিলিত হুঙ্কার।

জ্ঞান হারালাম, চেতনা ফিরতে দেখি ডাকিং-স্টুলে বাঁধা, হ্রদের শীতল পানিতে ওরা নামিয়ে দিয়েছে আমাকে।

এবার পানি থেকে তোলা হলে চোখ মেলতে পারলাম। প্রথমটায় মনে হলে নিশ্চয়ই বেহেশতে চলে গেছি।

সেখানে, বুড়ো সাদা ঘোড়াটার পিঠে সওয়ার হয়ে, দেখছে আমাকে আমার স্বপ্নের রাজপুত্র কেস্টার উডসীভস!

ওর নীল চোখজোড়া আমার ওপর নিবদ্ধ। আমার আপাদমস্তক লক্ষ করছে ও। পরম শান্তিতে বিশ্রাম নিচ্ছি আমি। হ্যাঁ, ডাকিং-স্টুলে বাঁধা তো কি হয়েছে, আমার কেস্টারকে দেখে বুকটা ভরে গেল।

কার সাধ্য এখন আমার গা স্পর্শ করে? তিনশো লোক জমেছে জমুক, কেস্টার তো আছে। তারমানে আমি নিরাপদ।

'প্রু, সোনামণি,' অবশেষে বলল ও। 'আমি এসে গেছি, আর ভয় নেই।'

গলা কেঁপে গেল আমার আবেগে। 'জানতাম আসবে।'

কেস্টার চারধারে দৃষ্টি বুলিয়ে ফেলেনাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওর বাঁধন খুলে দাও।'

দৌড়ে নির্দেশ পালন করতে এল ফেলেনা।

'কেউ কি আমার ঘোড়াটা এক মিনিট ধরবেন?' বলল কেস্টার।

'নিশ্চয়ই, সাদা ষাঁড়ের মালিক ক্যালার্ডের জবাব এল।

সমবেত জনতার দিকে চাইল কেস্টার।

'খুব মজা লুটছিলেন সবাই। এর আগে অবলা ষাঁড়ের ওপর অত্যাচার করতেন, আর এখন শুরু করেছেন ফুলের মত নিষ্পাপ একটা মেয়ের ওপর।'

গ্রিম্বলের কাছে হেঁটে গেল ও।

'তোমার নাকটা অতিরিক্ত লম্বা হয়ে গেছে, গ্রিম্বল,' বলল কেস্টার। তারপর দুম করে এমন এক ঘুষি মারল যে লোকটা নাক চেপে ধরে 'বাবাগো' 'মাগো' করতে লাগল।

এবার হাগলেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও।

'কিহে, কুস্তি লড়বে নাকি আমার সাথে?'

হাগলেট জানে কেস্টার বাঘা কুস্তিগীর, তাই মুখে তালা মেরে রইল। কিন্তু জনতা বিনে পয়সার রগড় ছাড়বে কেন, 'লড়ো, লড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল।

'গোল হয়ে দাঁড়াও! একটা বৃত্ত করো!'একজন চিৎকার করে বলল।

'ওই যে, পানির কাছে সুন্দর ঘাস আছে,' বলল কেস্টার। জনতা বৃত্ত তৈরি করল ওখানে।

কেস্টারের দেখাদেখি হাগলেটও কোট খুলল। কিন্তু ওর কুস্তি লড়ার অনিচ্ছা স্পষ্ট টের পাওয়া গেল।

চরম আক্রোশে হামলে পড়ে, কেস্টারের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করল ও। কিন্তু কেস্টার তুখোড় লড়িয়ে।

পুরোটা সময়ই, পানির দিকে সরে যাচ্ছিল কেস্টার। বুঝতে পারছিলাম না কেন, ওখানকার মাটি তো কাদাটে। এবার হঠাৎ করে এমন এক প্যাঁচ কষল ও, হাগলেট উড়ে গিয়ে পড়ল সার্নের ঠাণ্ডা পানিতে। কাদা মাখা ভূত হয়ে হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে এল একটু পরে। হো-হো করে হাসছে তখন দর্শকরা।

এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল কেস্টার। তারপর রাশ ধরে একলাফে উঠে

বসল স্যাডলে।

'প্রু!' ডাকল।

উঠে দাঁড়ালাম আমি।

'এবার অন্তত কাছে এসো?'

'আসছি।'

'আমার বুকে এসো, প্রু উডসীভস!'

ঝুঁকে পড়ে আমাকে সবলে জড়িয়ে ধরল ও, তুলে নিল স্যাডলে। হঠাৎই চারদিক স্তব্ধ হয়ে গেল।

'চল রে, আমার বুড়ো ঘোড়া,' বলল কেস্টার এবং আমরা আকাশছোঁয়া নীল পর্বতমাল্যর উদ্দেশে এগিয়ে চললাম।

'না, না, দাঁড়াও।' বললাম আমি। 'তোমার কাছে আসা আমার ঠিক হয়নি। পদ্ম ফুলের মত সুন্দর কোন মেয়েকে তোমার বিয়ে করা উচিত। আমাকে বিয়ে করতে পারো না তুমি। আমি ঠোঁট কাটা বদখত মেয়ে।'

ঘোড়া থামাল কেস্টার।

'আর দুঃখের কথা নয়, প্রু,' বলল। 'এবার একটু সুখের কথা ভাবতে চেষ্টা করো। জানো, পৃথিবীতেই আমি আমার বেহেশত খুঁজে পেয়েছি। সেটা কোথায়, শুনবে? এইখানে, তোমার বুকে, জান আমার।'

মুখ নামিয়ে আমার ঠোঁটে চুমো এঁকে দিল ও।

পাঠক, প্রুডেন্স সার্নের কাহিনী এখানেই ফুরোল।

***

বেন হার

লিউ ওয়ালেস/কাজী মায়মুর হোসেন

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

SHUVOM

জুডাহ্ বেন-হারের যখন ঘুম ভাঙল, সূর্যটা তখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে বসেছে। চোখ মেলে বাইরে তাকাল ও। প্রাসাদ থেকে, ওর ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায় সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলমলে জেরুজালেম শহর। ঝাঁক ঝাঁক কবুতর সাদা ডানায় রোদ মেখে নির্মেঘ নীল আকাশে উড়ছে। চমৎকার দৃশ্য।

শুয়েই রইল বেন-হার। উঠতে ইচ্ছে করছে না, আলস্য লাগছে ওর। মনে হচ্ছে যদি আরও অনেকক্ষণ ঘুমানো যেত! কিন্তু সেটা ঠিক হবে না, এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। তবুও কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে উড়ন্ত কবুতর দেখল ও। তারপর আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে নেমে গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'অ্যামরাহ্··· অ্যামরাহ্!'

অ্যামরাহ্ বহুদিন ধরে ওদের পরিবারের সঙ্গে আছে। সতেরো বছরের বেন-হারকে বলতে গেলে প্রায় কোলে-কাঁখে করে মানুষ করেছে মিশরীয় এই মহিলা।

ডাক শুনে পানির পাত্র আর তোয়ালে হাতে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল প্রৌঢ়া অ্যামরাহ্। বেন-হার হাত-মুখ ধুয়ে নিতেই নাস্তা সাজিয়ে নিয়ে এল, থালাটা নামিয়ে রাখল বিছানার পাশে একটা টেবিলে, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল ঘর ছেড়ে।

বেন-হার খাওয়া শুরু করেছে, তিয়েরজাহ্ ঢুকল ঘরে। তিয়েরজাহ্ ওর ছোট বোন। বেতের মত ছিপছিপে গড়ন, হার বংশের অন্য সবার মতই দেখতে সুন্দর সে। বোধহয় একটু বেশিই। সিল্কের ঝিলমিলে পোশাকে দারুণ মানিয়েছে ওকে। গোড়ালি আর কব্জিতে কারুকার্য খচিত সোনার মল আর বালা পরেছে ও। মাত্র পনেরো বছর বয়স, এখনই তিয়েরজাহ্‌কে দেখে যুবতী বলে ভ্রম হয়।

বেন-হারের নাস্তা শেষ হয়েছে, দু'ভাই-বোন গল্প করছে, এমন সময় রাস্তায় ওরা শোরগোল শুনতে পেল। চড়া পর্দায় ট্রামপেট বাজছে, সেই সাথে অনেক লোক এক সঙ্গে ছন্দবদ্ধভাবে হেঁটে যাবার ভোঁতা শব্দ। ট্রামপেটের রণধ্বনিতে টগবগ করে উঠল ওর তরুণ রক্ত, লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল বেন-হার। 'সৈন্যদের কুচকাওয়াজ!' বোনের হাত ধরে টান দিয়ে বলল সে, 'রোমান সৈন্য! চল গিয়ে ওদের দেখি।'

বোনকে নিয়ে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে ছাদে হাজির হলো বেন-হার। প্রাসাদের ছাদ। প্রকাণ্ড, চওড়া। উত্তর-পুব দিকে ছাদের শেষ প্রান্তে অনেকখানি ঝুঁকে কার্নিসের মত আগ বেড়ে আছে টালি বসানো ঢালু প্রাচীর। শোভাযাত্রা ভাল করে দেখতে সেই প্রাচীরে হেলান দিল বেন-হার।

প্রাসাদ সংলগ্ন সরু রাস্তাটা চওড়ায় দশ ফুট হবে কিনা সন্দেহ, তবে বেশ

কয়েকটা সেতু আছে পথ পারাপারের জন্যে। বাড়িঘরের ছাদের মতই এমুহূর্তে সেগুলোতেও ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য নারী-পুরুষ আর শিশু। রোমানদের দেখতে জড় হয়েছে সবাই।

পুরো পথ জুড়ে এগিয়ে এল রোমান সৈনিকের দল। রাস্তায় যতদূর চোখ যায় দলের শেষমাথা দেখা গেল না। দৃঢ় মাপা পায়ে মার্চ করছে সৈনিকেরা কারও মধ্যে এতটুকু ছন্দপতন নেই। রোদে ঝিলিক মারছে তাদের চকচকে তলোয়ার, বর্শা, বুকে বাঁধা ইস্পাতের প্লেট, বর্ম আর মাথার শিরোস্ত্রাণ।

সৈন্যদলের লম্বা সারির মাঝামাঝি জায়গায়, মাঝখানে ঘোড়ায় চড়ে আসছেন একজন অফিসার। দেহরক্ষী সৈন্যরা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে। ভদ্রলোকের মাথায় সাধারণ সেনাদের মত শিরোস্ত্রাণ নেই, তবে তিনিও সশস্ত্র। যে ঘোড়াটায় চড়েছেন সেটার পিঠে জিন চাপানো হয়নি, বদলে বেগুনি কাপড় বিছানো হয়েছে। হাতে ধরে রাখা লাগামটি হলুদ সিল্কের তৈরি।

একপলক দেখেই অফিসারের পরিচয় আঁচ করে ফেলল বেন-হার। কোন সন্দেহ নেই, এই লোকই ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাস, নতুন রোমান গভর্নর। জেরুজালেমের সবাই শঙ্কায় ভরা মন নিয়ে এলোকেরই পদার্পণের অপেক্ষায় ছিল। এই লোককে পাঠানো হয়েছে বিজয়ী রোমানদের পক্ষ হয়ে ইহুদীদের কাছ থেকে কর তোলার জন্যে। সহস্র ছলচাতুরি করে টাকা আদায় করবে ভ্যালেরিয়াস, দরিদ্র ইহুদী জনসাধারণকে চুষে ছিবড়ে বানিয়ে ছাড়বে।

এমনিতেই জেরুজালেমবাসীরা কর আদায়কারীদের দু'চোখে দেখতে পারে না, তার ওপর এই লোকটা আবার রোমান। সে কারণেই বোধহয় পরাজিত, ক্ষুব্ধ ইহুদী জনগণের ঘৃণা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

গ্রেটাসকে দেখেই ভীড়ের মধ্যে অসন্তোষ আর উত্তেজনা দানা বেঁধে উঠল। ছাদের রেলিঙে ঝুঁকে মুঠো করা হাত ঝাঁকিয়ে ঘুসি দেখাল অনেকে। চেঁচিয়ে গালাগাল করছে কেউ কেউ। পুলগুলোর তলা দিয়ে যাবার সময় গ্রেটাসের উদ্দেশে থুতু দিল পুরুষরা: মহিলাদের অনেকে এমনকি পা থেকে খুলে স্যান্ডেল পর্যন্ত ছুঁড়ল।

সৈন্যের দল এগিয়ে এল। কাছ থেকে গ্রেটাসের মুখ দেখতে পেল বেন-হার। অপমানে কালো, গম্ভীর হয়ে গেছে গ্রেটাসের চেহারা, তীব্র ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ইহুদীদের দেখছেন তিনি। যেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, সুবিধা এবং সুযোগ মত দেখে নেবেন সবাইকে।

ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাস হার প্রাসাদের কোণে চলে আসতেই আরও ভাল মত দেখার জন্যে টালি বসানো ঢালু দেয়ালে ঝুঁকে দাঁড়াল বেন-হার। হাতের ভর দিল একটা টালিতে। দীর্ঘদিনের রোদ বৃষ্টি-ঝড়ের অত্যাচারে টালিটা আলগা হয়ে গিয়েছিল, চাপ পড়তেই নিচে খসে পড়ল ওটা।

ভয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল বেন-হার। টালির দিকে তড়িঘড়ি হাত বাড়াল ধরতে পারল না। একটুর জন্যে পোড়া ইঁটের ভারী খণ্ড হাত ফস্কে গেল

সৈন্যদের সাবধান করতে আবার চেঁচাল বেন-হার। অবাক হয়ে ব্যাপার কি জানতে মুখ তুলল সৈন্যের দল। অফিসার গ্রেটাস তাকাতে যাবেন ঠিক এই সময় তাঁর মাথায় আঘাত করল টালি। ধড়াস করে ঘোড়া থেকে মাটিতে পড়লেন তিনি। পড়েই রইলেন মড়ার মতন।

মুহূর্তের জন্যে থেমে গেল রোমানদের পদচারণা। তারপর লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বর্ম বাগিয়ে গ্রেটাসকে আড়াল করে দাঁড়াল দেহরক্ষী সৈন্যরা। প্রত্যক্ষদর্শী ইহুদীদের মনে কোন সন্দেহ নেই যে ঘটনাটা ইচ্ছা করে ঘটানো হয়েছে। উৎফুল্ল চিৎকারে কিশোর প্রিন্স বেন-হারকে অভিনন্দন জানাল তারা। তখনও দেয়ালে হেলান দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বেন-হার, হাতটা তখনও সামনে বাড়ানো।

বেন-হারের দুর্ঘটনাকে সাহসের পরিচয় হিসেবে ধরে নিয়ে খেপে উঠল নিরীহ ইহুদী জনতা। টালি আর রোদে পোড়া ইঁটের টুকরো যার যার ছাদ থেকে ছুঁড়ে দিতে লাগল নিচে, রাস্তায় দাঁড়ানো সৈন্যদের লক্ষ্য করে।

বেজে উঠল ট্রামপেট। চেঁচিয়ে নির্দেশ ঝাড়ল কয়েকটা কণ্ঠস্বর। রণহুঙ্কার ছেড়ে তলোয়ার আর বর্ম উঁচিয়ে দু'পাশের বাড়িগুলোতে ঢুকতে লাগল সৈন্যদল। চিৎকার, চেঁচামেচি, আহতদের গোঙানি গালাগাল আর বাচ্চাদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠল পরিবেশ।

দেয়ালের কাছ থেকে সরে এল আতঙ্কিত বেন-হার, এতক্ষণে খেয়াল করল তিয়েরজাহ্ দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তিয়েরজাহ্র মুখ। ওর হাত আঁকড়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল। 'ভাইয়া...এখন? কি করবে ওরা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল বেচারি।

রাস্তা আর কাছাকাছি বাড়িগুলো থেকে আর্তনাদের শব্দ আকাশে মাথা কুটছে, শুনতে পেল বেন-হার। গ্রেটাসের স্থিরপ্রতিজ্ঞ কঠোর মুখচ্ছবির কথা ওর মনে পড়ল। স্পষ্ট বুঝতে পারল শাঁখের করাতে ফেসে গেছে। গ্রেটাস যদি মরে গিয়ে না থাকে তাহলে কত ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবে কে জানে! আবার যদি মরেই যায়, তাহলেই কি রোমানরা ছেড়ে দেবে? দেবে না। এই অঞ্চলের সবাইকে ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে এই সুযোগে ইহুদীদের জন্যে রোমানরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

এসব চিন্তা মাথায় আসতেই কাঁপ উঠে গেল বেন-হারের। টলমল পায়ে দেয়ালের কাছে গিয়ে আবার উঁকি দিল। মুহূর্তের জন্যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না, তারপরই স্বস্তির শ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে বুক থেকে ওজনদার একটা পাথর নেমে গেছে ওর। জ্ঞান ফিরেছে গ্রেটাসের, মরেনি লোকটা। এখন দেহরক্ষীরা ধরাধরি করে তাকে ঘোড়ার পিঠে উঠতে সাহায্য করছে।

'বেঁচে আছে,' ঢোক গিলে কাঁপা কাঁপা উত্তেজিত গলায় বলল বেন-হার, 'আর ভয় নেই, কি ঘটেছে ওদের আমি বুঝিয়ে বলব।'

চমকে উঠল ওরা। ওদের পায়ের তলায় মৃদু কেঁপে উঠেছে ছাদ। মড়মড় করে ভেঙে পড়ল প্রাসাদফটক। আঙিনায়, প্রাসাদ প্রাঙ্গণে শুরু হলো রক্ষী আর

রোমানদের চিৎকার-হৈচৈ হট্টগোল, কাতর আর্তনাদ। প্রাণভয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে মহিলারা, কাকুতি মিনতি করে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে। কারও কারও চিৎকার থেমে যাচ্ছে মাঝপথে।

সিঁড়ি বেয়ে সশব্দে দ্রুত পায়ে উঠে আসছে কারা যেন!

রোমানরা আসছে! নিজেকে শিকারীর তাড়া খাওয়া আহত জন্তুর মত মনে হলো বেন-হারের। বড় বড় চোখে ওর দিকে তাকাল তিয়েরজাহ্। বেন-হারের হাত আঁকড়ে ধরে বলল 'ভাইয়া, আমরা কি করব এখন?

তাই তো, কি করব এখন? কি করা উচিত? হতভম্ব হয়ে গেল বেন-হার নিজের অসহায়তা কল্পনা করে। বাবা বেঁচে নেই ওর, এখন সে-ই পরিবারের প্রধান, একমাত্র পুরুষমানুষ!

'তিয়েরজাহ্, নড়বি না এখান থেকে,' বলল বেন-হার, 'কি হচ্ছে দেখতে নিচে যাচ্ছি আমি।'

মায়ের কান্না শুনতে পেল ও। তিয়েরজাহ্ হাত ছাড়ছে না, ওকে নিয়েই সিঁড়ির দিকে ছুটল বেন-হার। সিঁড়ি যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেখানে, সিঁড়ি-সমতলে গিজগিজ করছে রোমান সৈন্য। খোলা তলোয়ার নিয়ে ঘরে ঘরে তল্লাশী করছে। মেঝে ভরে আছে ভাঙা আসবাবপত্র আর গৃহস্থালী জিনিসে। এককোণে মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে– কাঁদছে, দয়া ভিক্ষা করছে কেউ কেউ। এক রোমান সৈন্যের হাত থেকে কব্জি ছোটানোর চেষ্টা করছেন বেন-হারের মা। পাগলের মত দেখাচ্ছে তাঁকে। ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে ছিঁড়ে গেছে পোশাক, লম্বা উস্কো-খুস্কো চুল মুখ ঢেকে দিয়েছে। 'মা!' ভয়ের বদলে তীব্র রাগ অনুভব করল বেন-হার। অসহায় লাগল নিজেকে। ছুটে যেতে চাইল মাকে সাহায্য করতে। কিন্তু পারল না। তিন পা এগোবার আগেই ওকে জাপটে ধরল দু'জন স্বাস্থ্যবান সেনা। ধাক্কা দিয়ে একধারে সরে যেতে বাধ্য করা হলো বেন-হারকে।

'এই তো, এখানে সে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল একজন।

গলার আওয়াজটা খুবই চেনা। শরীর মুচড়ে সৈন্যদের হাত ছাড়ানোর ফাঁকে তাকাল বেন-হার। আনন্দে, স্বস্তিতে জ্বলজ্বল করছে ওর দু'চোখ। মেসালার কণ্ঠস্বর!

মেসালা রোমান হলেও বেন-হারের ছোটবেলার বন্ধু। ভাইয়ের মত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক দু'জনের। প্রায় প্রতিদিনই প্রাসাদে আসে মেসালা। ভাল বংশের ছেলে বলে মাত্র উনিশ বছর বয়সেই সেনাবাহিনীর উঁচু পদ পেয়েছে। এই বিপদে মেসালা নিশ্চয়ই সাহায্য করবে ওকে সন্দেহ নেই বেন-হারের। আকুল হয়ে বন্ধুকে ডাকল ও। হাত বাড়িয়ে দিল।

দেখেও দেখল না কোন জবাব দিল না মেসালা। শীতল, ঠাণ্ডা চোখে বেন-হারকে দেখল।

'এই কি খুনী?' জানতে চাইল মেসালার পাশে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী একজন অফিসার। এক নজর বেন-হারকে দেখে নিজেই আবার বলল 'এ তো একেবারেই বাচ্চা ছেলে!'

'খুনী হতে হলে কি বুড়ো হওয়া লাগে?' বলল মেসালা, ধরা পড়েছে সেটাই আসল কথা।' আঙুল তুলে বেন-হারের মা আর বোনকে দেখাল সে। ওই যে, ওরা ওর মা-বোন। পরিবারের সবকজন এখন তোমার হাতের মুঠোয়।

স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকল বেন-হার। বুঝতে পারেনি মেসালার বক্তব্য। বিশ্বাস করতে পারেনি।

'মেসালা! বাঁচাও!' ভাঙা গলায় বলল ও, 'আমার মা-বোনকে বাঁচাও, মেসালা! আমি ইচ্ছে করে···ব্যাপারটা দুর্ঘটনা, বিশ্বাস করো! দেয়ালে হাত রেখেছিলাম আমি···একটা টালি আলগা ছিল হঠাৎ পড়ে গেছে!'

টিটকারির হাসি হাসল মেসালা। যেন বেন-হারের কথা শুনতেই পায়নি এমন ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল। চারপাশে বিদ্রোহের অভ্যস, সৈন্যদের উদ্দেশে বলল সে দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এসব দমন করতে হবে। এদেরকে এমন শাস্তি দিতে হবে যেন সবার জন্যে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে। কথা শেষ করে একবারও বেন-হারের দিকে না তাকিয়ে গটগট করে চলে গেল মেসালা।

এতক্ষণে বেন-হার বুঝল মেসালার কাছে ওদের বন্ধুত্বের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। বন্ধুর জন্যে ঘাড় পাতা দূরে থাক, সামান্য সাহায্যটুকুও করবে না মেসালা। মন শক্ত করল বেন-হার। ঠিক করল নিজের যা হয় হোক, ভয় পাবে না ও, কিন্তু যত চিন্তা মা আর তিয়েরজাহকে নিয়ে। কি হবে ওদের?

'স্যার, দয়া করে আমার মা-বোনকে অন্তত ছেড়ে দিন,' সৈন্যদের হাত ছাড়িয়ে অফিসারের দিকে এগোনোর চেষ্টা করতে করতে বলল বেন-হার 'ওদের তো কোন দোষ নেই, ওরা তো কোন অপরাধ করেনি।'

বেন-হারের বিনীত অনুরোধে অফিসারের মনটা নরম হয়েছে বলে মনে হলো। 'মহিলাদের টাওয়ারে নিয়ে যাও,' সৈন্যদের নির্দেশ দিল সে। 'কোন কষ্ট দিয়ো না।'

কয়েকজন হুকুম তামিল করায় বেন-হারকে ধরে রাখা সেনাদের দিকে তাকাল অফিসার। একে হাত বেঁধে রাস্তায় নিয়ে যাও, কি সাজা দেয়া হবে এখনও ঠিক করা হয়নি।'

বেন-হার অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকল। ওর চোখের সামনেই প্রাসাদের সবাইকে সৈন্যরা টেনে-হিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে দিল। ওর মা ধস্তাধস্তি করছিলেন, তাঁকে কয়েকজন মিলে তুলে নিয়ে গেল। ভয়ের চোটে তিয়েরজাহ আর আপত্তি করল না, নীরবে অনুসরণ করে মায়ের পিছু পিছু গেল। শেষবারের মত একবার চোখ তুলে ওদের দেখেই মুখ নিচু করে ফেলল বেন-হার। তিক্ততায় ছেয়ে গেল ওর অন্তর। আবার যখন মাথা উঁচু করল, দু'চোখ জ্বলছে ওর অঙ্গারের মত। কঠোর চেহারা। ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে। বাস্তবের আকস্মিক আঘাতে মাত্র কয়েকটা মুহূর্তে কৈশোরকে পেছনে ফেলে পুরুষমানুষ হয়ে গেছে সতেরো বছরের বেন-হার। বাঁধতে সুবিধা হবে বলে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সে।

প্রাসাদ প্রাঙ্গণে একটা ট্রামপেট বেজে উঠল। হাত বেঁধে বেন-হারকে ছেঁচড়ে নিয়ে চলল সৈন্যরা। উত্তরের ভাঙা প্রাসাদ ফটকের দিকে যাচ্ছে, এমন সময়

কোত্থেকে যেন ছুটে এল অ্যামরাহ্, বসে পড়ে দু'হাতে বেন-হারের হাঁটু জড়িয়ে ধরল। কিছুতেই বেন-হারকে নিয়ে যেতে দেবে না সে। অবিরাম কাঁদছে, ধুলো ধুয়ে দু'গাল বেয়ে ঝর্নার মত নামছে চোখের পানি। উন্মাদিনীর মত অবস্থা। বেন-হারকে কি যেন বলতে চাইল, কথা ফুটল না ঠোঁটে।

ঈশ্বর তোমাকে সাহায্য করুন, অ্যামরাহ্,' শান্ত স্বরে বলল বেন-হার। 'যদি পারো, চলে যাও এখান থেকে। তোমাকে মা আর তিয়েরজাহ্র জন্যে বেঁচে থাকতে হবে। দেখো, ওরা ফিরে আসবে। তখন...' ধাক্কা মেরে বেন-হারকে চুপ করিয়ে দিল একজন পাহারাদার। তারপর অ্যামরাহ্কে ধরতে হাত বাড়াল। লাফ দিয়ে সরে গেল অ্যামরাহ্, ফটক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে রাস্তার ভীড়ে মিশে গেল।

যেতে দাও,' সময় নষ্ট হওয়ায় ধমকে উঠল অফিসার। খেতে না পেয়ে মরুকগে বুড়ি। তোমরা খুঁজে দেখো, এবাড়ির চারদেয়ালের ভেতর জীবিত কেউ যেন না থাকে।' কড়া চোখে বেন-হারের দিকে একবার তাকাল সে, তারপর বলল, 'কেউ যদি রোমান গভর্নরকে খুন করতে চায় হারদের পরিণতি দেখে এবার সাবধান হবার সুযোগ পাবে।'

খানিক পরে সৈন্যরা ফিরে আসায় এগোতে ইশারা করল অফিসার। রোমান দুর্গের সদর দফতরে, টাওয়ার অব অ্যান্টোনিয়ায় বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

পরদিন রোমান সৈন্যদের ছোট একটা দল এল পরিত্যক্ত হার প্রাসাদে। সিংহফটক মেরামত করল তারা। মোম গলিয়ে দরজার কোনাগুলোতে ঘষল। তারপর একধারে ল্যাটিন ভাষায় লেখা একটা নোটিস ঠুকে দিয়ে চলে গেল।

নোটিসটিতে লেখা:

এটি সম্রাটের সম্পত্তি।

দুই

তিনদিন পরে। প্রায় দুপুর হবে তখন। দেখা গেল দক্ষিণ দিক থেকে নাজারেথের দিকে দশজন অশ্বারোহী সৈনিক সহ আসছে রোমান একজন অফিসার। সঙ্গে একজন বন্দী আছে।

পাহাড়ের ঢালে জরাজীর্ণ, ছোট কয়েকটা ঘর-বাড়ি নিয়ে নাজারেথ গ্রাম। চারপাশ ঘিরে আছে বাগান আর গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর গাছ। সবে ধন নীল মণি রাস্তাটাকে পায়ে চলা মেঠো পথ বলাই ঠিক হবে। গরু-ভেড়ার খুরের ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত এবড়ো খেবড়ো অবস্থা।

এই নাজারেথ গ্রামে ট্রামপেট বাজিয়ে জানান দিয়ে সৈন্যরা ঢুকল। হুড়োহুড়ি পড়ে গেল গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলোর মধ্যে। কারা এসেছে দেখতে দৌড়ে এল তারা। কৌতূহলে চকচক করছে সবার চোখ মুখ।

বন্দীকে দেখে আঁতকে উঠল তারা। একি অবস্থা মানুষটার! রোমানরা

নিজেরা ঘোড়ায় চড়লেও হাঁটিয়ে এনেছে বন্দীকে। খালি পা, জখম হয়ে গেছে। হাতটা দড়ি দিয়ে বাঁধা, অন্যপ্রান্ত গোল করে একটা ঘোড়ার গলায় পরানো আছে। চলতে গিয়ে বারবার হোঁচট খেয়েছে বন্দী। সারা শরীর হলুদ ধুলোয় মাখানো। এখনও কি করে সজ্ঞান আছে ভেবে অবাক হতে হয়। অসাধারণ মনোবল আর সহ্য শক্তি তাকে টিকিয়ে রেখেছে। চেহারায় উদাস একটা ভাব আছে, তবে ব্যথা-বেদনা ক্লান্তির ছাপ নেই।

কুয়োর সামনে ঘোড়া থেকে নামল রোমানরা। মাটিতে, ধুলোর ওপর ধপ করে বসল লোকটা। গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসে কাছাকাছি দাঁড়াল, দেখল লোক নয়, অল্পবয়সী একটা ছেলেকে ধরে এনেছে। ওরা চাইল সান্ত্বনা দিতে, সাহায্য করতে, কিন্তু ভয়ে এগোল না কেউ।

তৃষ্ণার্ত রোমানরা যখন পানির পাত্র হাত-বদল করছে, তখন গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে এলেন এক বৃদ্ধ। শান্ত, ধীর পায়ে হাঁটছেন তিনি। হাতে কয়েকটা ব্যবহার্য জিনিস। পুরানো, ভারী একটা কুড়াল, করাত আর একটা ছুরি। ধূসর একটা আলখেল্লা পরেছেন। বুকের কাছটা ঢেকে আছে সাদা দাড়িতে। পাগড়ির তলা দিয়ে বেরিয়ে কাঁধে লুটাচ্ছে লম্বা সাদা চুলগুলো। তাঁর পেছনে হাঁটছে কুঠার হাতে এক তরুণ। চেহারা তার ভাল করে দেখা যায় না এক গোছা বাদামী চুল মুখের ওপর ছায়া ফেলেছে।

কুয়োর পাড়ে ভীড় দেখে এগিয়ে এসে থামল তারা।

'ওহ্, র‍্যাবাই জোসেফ!' বৃদ্ধকে দেখে দৌড়ে এল এক মহিলা। আঙুল তুলে বন্দীকে দেখাল। 'ওই ছেলেটা বন্দী! আপনি জানতে চাইলে সৈন্যরা বলবে কি দোষ করেছে ও। বলুন না, র‍্যাবাই, জিজ্ঞেস করুন কি শাস্তি হবে ওর।'

কয়েদিকে একপলক দেখে নিয়ে অফিসারটির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন র‍্যাবাই। গম্ভীর স্বরে বললেন, 'ঈশ্বর প্রদত্ত শান্তি সবসময় আপনাদের সঙ্গে থাকুক।'

'আপনারও তাই হোক' জবাব দিল অফিসার।

'আপনারা জেরুজালেম থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ।

'আপনার বন্দী একেবারেই বাচ্চা ছেলে। জানতে পারি কি করেছে ও?'

'ও একটা খুনী।'

খুনী! বিস্মিত স্বরে অফিসারের কথাটা আওড়াল গ্রামবাসীরা। অবাক চোখে কয়েদিকে দেখল।

'তোমরা হয়তো জেরুজালেমের প্রিন্স হারের নাম শুনেছ,' বলল অফিসার, 'বন্দী তারই ছেলে।

আবার বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল ভীড়ের মাঝে।

'কয়েকদিন আগে,' শুরু করল অফিসার জেরুজালেমের রাস্তায় মাথায় ঢিল ফেলে মহামতি গ্রেটাসকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল সে।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। এমন ভঙ্গিতে বেন-হারের দিকে তাকাল যেন বন্য

জন্তু দেখছে।

'খুন করতে পেরেছে?' র‍্যাবাই জানতে চাইলেন।

'না, পারেনি। তবু যুদ্ধ-জাহাজে যাবজ্জীবন দাঁড় টানার সাজা হয়েছে ওর।'

ছেলেটার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে আতঙ্কে শিউরে উঠল গ্রামের লোক। যুদ্ধ-জাহাজে যাদেরকে দাস হিসেবে দাঁড় টানতে পাঠানো হয়, তাদের বেশিরভাগই দু'এক বছরের বেশি বাঁচে না।

'ঈশ্বর ওকে সাহায্য করুন,' দুঃখিত চেহারায় বললেন ধর্মযাজক। সহানুভূতির দৃষ্টিতে বেন-হারকে দেখলেন।

তাঁর কথা শেষ হতেই পেছনে দাঁড়ানো তরুণটি হাতের কুঠার মাটিতে নামিয়ে রাখল। পাথরের দেয়াল ঘেরা কুয়োর পাড়ে চলে এল সে। একটা পাত্রে করে তুলে নিল টলটলে শীতল জল। এতই নিঃশব্দে নির্বিকারভাবে কাজটা সে করল যে রক্ষীরা বাধা দেয়ার কোন সুযোগ পেল না। তারা নড়ার আগেই বন্দীর মুখের সামনে পানি ভরা পাত্র ধরল তরুণ।

কাঁধে কারও স্পর্শ অনুভব করে মুখ তুলল বেন-হার। তাকাল। তরুণের চেহারাটা চিরদিনের জন্যে ওর মনে গেঁথে গেল। মায়াময় চোখ দুটো গাঢ় নীল মায়া-ভালবাসা-পবিত্রতার উজ্জ্বল স্বর্গীয় আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে দিব্য কান্তি দীপ্তিময় চেহারা থেকে।

চিরকৃতজ্ঞ হয়ে গেল বেন-হার। লম্বা চুমুক দিয়ে পাত্র খালি করে ফেলল। সবাই চুপ করে আছে। কাঁধ থেকে সরিয়ে পলকের তরে ওর মাথায় হাত রাখল তরুণ। প্রার্থনা করল ওর জন্যে। তারপর পাত্রটা কুয়োর পাড়ে রেখে কুঠার তুলে নিয়ে র‍্যাবাই জোসেফের কাছে ফিরে গেল। উপস্থিত সবকজনের চোখ অনুসরণ করল তাকে।

সৈন্য আর তাদের ঘোড়াগুলোর তৃষ্ণা মেটার পরে যাত্রার প্রস্তুতি নিল রোমান অফিসার। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে এবার অফিসার তার তরুণ বন্দীকে খানিকটা দয়া দেখাল। নিজে মাটিতে বসা বেন-হারকে উঠতে সাহায্য করল সে। একজন সৈন্যের পেছনে ওকে তুলে দিল।

রোমানরা চলে যেতেই যার যার ঘরে ফিরল গ্রামের লোক। কেউ জানল না বেন-হার আর কুমারী মা-মেরির ছেলে ভবিষ্যৎ রাসুল যীশুর সাক্ষাৎ হলো।

তিন

তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ নীল সাগরের বুক চিরে তরতর করে এগিয়ে চলেছে একটি রণতরী। ফেনা তুলে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ছে একের পর এক ঢেউ।

জাহাজটা লম্বা। চওড়া তেমন নয়। দ্রুত যাতে ছুটতে পারে, বাঁক নিতে পারে, সেজন্যে বিশেষভাবে তৈরি। পানির সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে ছুটছে ওটা। উঁচু

হয়ে আছে জাহাজের গলুই। গলুইয়ের নিচে, পানির তলায়, জাহাজের গায়ের সঙ্গে আটকে দেয়া আছে একটা লোহা মোড়ানো কাঠের ছুঁচাল দণ্ড। ওটা দিয়ে গুঁতো মেরে প্রতিপক্ষের জাহাজ ফুটো করে দেয়া হয়।

জাহাজের গায়ে তিন সারিতে দাঁড় টানার গর্ত। একেক পাশে ষাটটি করে একশো বিশটি দাঁড়, এক সঙ্গে উঠছে-নামছে, এতই ছন্দোবদ্ধ, দেখে মনে হয় একজন মানুষই দাঁড় টেনে চলেছে।

কুইনটাস এরিয়াস, রোমান ট্রিবিউন এবং রণতরীর কমান্ডার, কেবিনে তাঁর প্ল্যাটফর্মে রাজকীয় ভঙ্গিতে বসে আছেন। জাহাজের দোলার সঙ্গে দুলছে তাঁর চেয়ার। চিন্তায় তিনি মগ্ন।

কেবিনটা জাহাজের মাঝামাঝি জায়গায়। দৈর্ঘ্যে ষাট এবং প্রস্থে তিরিশ ফুট। চওড়া তিনটে হ্যাচওয়ে দিয়ে আলো আসছে এখানে। জাহাজের প্রাণকেন্দ্র বলা যায় কেবিনটাকে। এখানেই জাহাজের সবাই খাওয়া-দাওয়া সারে, ঘুমোয়, ডিউটি না থাকলে আড্ডা মারে, বিশ্রাম নেয়।

কেবিনের শেষ প্রান্তে আছে উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। ওখানে বসে আছে দাঁড়ীদের সর্দার। তার সামনে একটা ড্রাম, সেটায় হাতুড়ির বাড়ি দিয়ে তাল তুলছে সে।

সর্দারের পাটাতনের চেয়ে খানিক ওপরে আরেকটা পাটাতনে কুইনটাস এরিয়াসের আলাদা কোয়ার্টার। সোনালী রেলিঙে ঘেরা। সেখানেই বসে আছেন কুইনটাস। কোথায় কে কি করছে সবকিছু দেখা যায় এখান থেকে। কোয়ার্টারে একটা কাউচ, টেবিল আর একটা হাতলওয়ালা উঁচু পিঠের গদিমোড়া চেয়ার ছাড়া আর কিছু নেই।

কেবিনের দু'ধারে সারি সারি বেঞ্চ। ক্রীতদাস দাঁড়ীরা বসেছে ওখানে। ধ্যান ভঙ্গ হলো এরিয়াসের, সবার ওপর তিনি একবার করে চোখ বোলালেন। দুইশো পঞ্চাশ জন দাস বর্তমানে রয়েছে জাহাজে। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা যাতে দাঁড় চলে সেজন্যে প্রতি দু'ঘণ্টায় দাসদের পালাবদল হয়।

এই রণতরীতে এরিয়াস একেবারেই নতুন। ক্রুদের কাউকেই প্রায় চেনেন না। জানাশোনা নেই। তবে আগামী কয়েকটা দিন দক্ষ দাঁড়ীদের সাহায্য তাঁর প্রয়োজন হবে বুঝতে পারছেন এরিয়াস। তিনি ছাড়া জাহাজের আর কেউ জানে না কোথায় এবং কেন যাওয়া হচ্ছে, জানে না যে অব অ্যানটেমোনায় এসে জড় হয়েছে রোমানদের আরও একশোটি যুদ্ধ-জাহাজ। ওখানে পৌঁছে সবক'টা জাহাজের দায়িত্ব বুঝে নেবেন তিনি, জলদস্যুদের খুঁজে বের করবেন। ইজিয়ান সমুদ্রের তীরবর্তী প্রায় দশ-বারোটা শহর লুট করেছে এই জলদস্যুর দল। বদমাশগুলোর নেতা একজন গ্রীক। লোকটা চ্যালাচামুণ্ডাদের নিয়ে ভয়ানক অত্যাচার শুরু করেছে। তবে আর মাত্র কয়েকটা দিন, তারপর গ্রীক আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের শিক্ষা হয়ে যাবে। রোমান সাম্রাজ্য শুধু জায়গা দখলই করে না, সেসব জায়গায় দখল বজায়ও রাখে। ট্যাক্সের বিনিময়ে জনসাধারণের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও করে।

দাসদের ওপরে শ্যেনদৃষ্টি বোলাতে লাগলেন এরিয়াস। একের পর এক বেঞ্চ পার হয়ে তাঁর দৃষ্টি ষাট নম্বরের ওপর থামল। অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকল ওখানেই।

দাঁড়ীর বয়স খুবই অল্প, বড়জোর বিশ বছর। আর সবার মতই ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। দেখে বেশ লম্বা বলে মনে হয়। দাঁড় টানার ভঙ্গিটা অন্যান্যদের চেয়ে আলাদা। শান্ত, দক্ষ। হাত দুটো দৈর্ঘ্যে একটু বেশি, তবে শক্তিশালী। থোকা থোকা মাংসপেশী কিলবিল করছে চামড়ার নিচে। যুবক দেখতেও সুদর্শন। ব্যক্তিত্বে কি যেন একটা আছে, খুব পরিচিত। এরিয়াস কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

আরেক দল দাস যখন দাঁড়গুলোর দায়িত্ব বুঝে নিল, উঠে দাঁড়ালেন কুইনটাস। সামনে বেড়ে দাঁড়ীদের সর্দারকে ষাট নম্বর বেঞ্চ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওখান থেকে এই মাত্র যে-লোকটা উঠে গেল সে কে?'

ষাট নম্বরকে দেখে নিয়ে সর্দার জানাল, 'আমিও, স্যার, আপনার মতই এই জাহাজে নতুন। কাউকে তেমন চিনি না।'

'ওর বয়স খুবই কম,' চিন্তান্বিত স্বরে বললেন এরিয়াস।

'কিন্তু আমাদের সেরা মাল্লা,' বলল সর্দার। 'মাত্র একবারই ওর সঙ্গে কথা বলেছি আমি। আমাকে বলেছিল ডানধার থেকে ওকে সরিয়ে বামপাশে দিতে।'

'ও। কেন বলেছিল?'

'এতে করে ঝড়, ওয়শ, যুদ্ধে কোন কারণে যদি তাকে দিক বদলাতে হয় তাহলেও দাঁড় বাইতে নাকি তার অসুবিধা হবে না। অভ্যেস রাখতে চায়। তার ধারণা একদিকে বসে দাঁড় টানলে মাল্লারা কোন না কোন সময়ে বোঝা হিসেবে গণ্য হতে বাধ্য।'

সম্মতিসূচক মাথা ঝাঁকালেন এরিয়াস। বললেন, 'ধারণাটা অযৌক্তিক নয়। ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, কথা বলে দেখব।'

কিছুক্ষণ পর তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল যুবক দাস। মার্জিত স্বরে বলল, 'ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন এরিয়াস। 'সর্দারের কাছে শুনলাম তুমি নাকি তার সেরা লোক। কাজ করছ কতদিন হলো?'

'তিন বছর।'

বিস্মিত হয়ে গেলেন এরিয়াস। সামলে উঠে বললেন, 'অনেক জোয়ান লোকও একবছর টেকে না, আর তুমি তো একেবারেই ছেলেমানুষ!'

মনোবল থাকলে যেকোন অবস্থায় টেকা যায়।'

'তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি ইহুদী,' বললেন এরিয়াস। 'একসময় আমি জেরুজালেমের এক প্রিন্সকে চিনতাম। সওদাগর ছিলেন, সমুদ্রে বেরিয়ে পড়তেন। আমার বন্ধু ছিলেন তিনি– বড় ভাল মানুষ। তোমাকে দেখে আজ আমার তাঁর স্মৃতি মনে পড়ছে।'

'আমার বাবাও জেরুজালেমের প্রিন্স,' গর্বের সঙ্গে বলল ক্রীতদাস। 'তিনি সওদাগরও ছিলেন।'

'তার নাম?'

'হার বংশের রাজপুত্র তিনি। তাঁর নাম ইথামার।'

'তুমি হার বংশের ছেলে!' বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন এরিয়াস। 'আমি যে তোমার বাবার কথাই বলছি। তুমি এখানে কেন?'

এরিয়াসের চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে শান্ত স্বরে বেন-হার বলল, 'ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাসকে আমি খুন করতে চেয়েছি ধরে নিয়ে অভিযুক্ত করা হয়েছে আমাকে।'

'আমি ওই ঘটনার কথা শুনেছি,' আপনমনে বললেন এরিয়াস। 'ভেবেছিলাম পৃথিবীর বুক থেকে হারদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে।'

'আপনি যদি আমার মা আর বোনের ব্যাপারে কিছু জানেন, তাহলে দয়া করে বলুন,' অজান্তেই এক পা সামনে বাড়ল বেন-হার। উদগত অশ্রু চেপে বলল, 'ওরা যদি মরেও গিয়ে থাকে, তা-ও বলুন, আমি··· তিনবছর! ওদের সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। অথচ আমিই ওদের এই পরিণতির জন্যে দায়ী। আমি···'

'তাহলে তুমি তোমার অপরাধ স্বীকার করছ?' কঠোর স্বরে জানতে চাইলেন এরিয়াস।

হাত মুঠো পাকিয়ে গেল বেন- ারের। চোখে অনল জ্বলে উঠল। 'ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করে বলছি,' বলল সে, 'আমি নিরপরাধ।'

বেন-হারের চোখের দিকে তাকিয়ে এরিয়াসের মনে সন্দেহের ছিটেফোঁটাও রইল না যে যুবক সত্যি কথা বলছে। 'তোমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে বিচার হয়নি?' জানতে চাইলেন তিনি।

'না!'

বিস্মিত হলেন এরিয়াস। 'সাক্ষি নেই– বিচার হয়নি! কে তোমাকে শাস্তি দিয়েছে?'

'ওরা আমাকে হাত-পা বেঁধে টাওয়ারের ডানজনে নিয়ে ফেলে রেখেছিল,' বলল জুডাহ্। 'কাউকে আমি দেখিনি। এক সপ্তাহ পর আমাকে একটা যুদ্ধ-জাহাজে পাঠিয়ে দেয়া হলো। সেই থেকে আমি ক্রীতদাসের মতন দাঁড় বাইছি।'

'তোমাকে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণের সুযোগ দিয়ে বিচার কাজ করা হত, তাহলে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারতে?'

ওই সময়ে আমি ছেলেমানুষ ছিলাম, খুনী হওয়ার মত বয়স হয়নি। গ্রেটাসকে আমি চিনতামও না। তাছাড়া খুন করার ইচ্ছে থাকলে আমি সময় ও সুযোগ বেছে নিতাম। ঘটনাটা যখন ঘটে গ্রেটাস তখন দিনে দুপুরে সৈন্যসামন্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন। পুরো ব্যাপারটাই দুর্ঘটনা।'

এরিয়াসকে সেদিনের কথা সংক্ষেপে জানাল বেন-হার।

'তোমার মা তখন কোথায় ছিলেন?' জানতে চাইলেন ব্যথিত এরিয়াস।

'নিচের একটা ঘরে।'

'তাঁর ভাগ্যে কি ঘটেছে?'

'আমি জানি না। শুধু দেখেছি তাঁকে জোর করে নিয়ে গেছে ওরা।'

থমথম করছে এরিয়াসের চেহারা। খুব মনোযোগ দিয়ে বেন-হারের কথা শুনেছেন তিনি। হৃদয়ে মস্ত একটা ধাক্কা খেয়েছেন আজ। ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠতে হয়, নির্দোষ নিরপরাধ এক তরুণের জীবন কিভাবে আমূল পালটে দিয়েছে অন্ধ-বিচারকের অন্যায় ক্রোধ! দুর্ঘটনার প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে একটা গোটা পরিবারকে ধ্বংস করে দিয়ে!

জীবনে এই প্রথম ভাষা খুঁজে পেলেন না এরিয়াস। বেন-হারকে বিশ্বাস করেছেন তিনি। বুঝেছেন, নিরপরাধ না হলেও বন্ধুপুত্রকে সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন। তবু নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। মনে মনে বললেন, তাড়াহুড়োর আপাতত দরকার নেই। সামনের যুদ্ধে বেন-হারকে তাঁর প্রয়োজন।

মুখে বললেন, 'তুমি এখন যেতে পারো।'

মাথা নুইয়ে ছোট্ট করে কুর্নিশ করল বেন-হার। খানিক পরে আবার গিয়ে বসল নিজের বেঞ্চে। দাঁড় টানতে লাগল। অন্ধের মত অজানা গন্তব্যে জাহাজটাকে নিয়ে চলেছে ওরা।

চার

ছদিন পর, সূর্যাস্তের খানিক আগে, লেমনোস দ্বীপের ছোট টিলাগুলোর চূড়ায় জড় হলো দ্বীপবাসীরা। রোমান জাহাজ দেখছে তারা। একশো যুদ্ধ-জাহাজ সার বেঁধে উত্তর দিকে মুখ করে দ্বীপ থেকে একটু দূরে সমুদ্রে ভাসছে।

রোমান নৌবহরের নেতৃত্ব দিচ্ছে অ্যাসট্রোইয়া জাহাজ। ওই জাহাজের মাস্তুলে উড়ছে কুইনটাস এরিয়াসের পতাকা।

ডেকের নিচে বসে দাঁড় টানছে বেন-হার। জাহাজের দিক পরিবর্তন টের পেল, কিন্তু কেন জাহাজের মুখ ঘোরানো হয়েছে জানে না ও। জানে না এতগুলো জাহাজ আছে ওদের আশেপাশে। কোথায় কি উদ্দেশ্যে চলেছে সে সম্বন্ধেও ধারণা নেই ওর।

রাত নামল। এখনও উত্তরদিকে চলেছে নৌবহর। অ্যাসট্রোইয়ার সিঁড়িতে ঝোলানো লণ্ঠনগুলো জ্বেলে দেয়া হলো। ডেক থেকে নেমে নিচে এলেন এরিয়াস। তাঁর নির্দেশে সৈন্যরা বর্ম পরে নিল। এক জায়গায় জড় করা হলো বান্ডিল বান্ডিল বর্শা আর তীর। তেলের পিপে, আগুনে-গোলা ইত্যাদি শেষবারের মত পরীক্ষা করে প্রধান সিঁড়ির কাছে রাখা হলো।

কৌতূহলী চোখে চারপাশের কর্মকাণ্ড দেখল বেন-হার। যখন এরিয়াসও বর্ম এবং শিরোস্ত্রাণ পরে তৈরি হলেন, তখন এত প্রস্তুতির অর্থ বুঝতে ওর বাকি থাকল না। যুদ্ধে যাচ্ছে ওদের জাহাজ। এখন কি ঘটবে সেটাও ওর অজানা নেই।

দাসদের প্রত্যেকের বেঞ্চের সঙ্গে লাগানো আছে একটা করে মোটা শেকলে বাঁধা লোহার বেড়ি। সর্দার মাল্লা এবার দাসদের গোড়ালিতে বেড়ি আটকাতে শুরু

করল। এই বেড়ি আটকানোর ব্যাপারটাই দাসরা সবচেয়ে ঘৃণা আর ভয়ের চোখে দেখে, কারণ একবার জাহাজ ডুবে গেলে মুক্তির আর কোন উপায় থাকে না। লোহার মোটা শেকল ছেঁড়া অসম্ভব। জাহাজের সঙ্গেই দাসদের সলীল সমাধি ঘটে।

এরিয়াস চোখ বন্ধ করে তাঁর চেয়ারে বসে আছেন। উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছে বেন-হার, মনে মনে আশা করছে ওকে শেকল পরাতে এরিয়াস নিশ্চয়ই মানা করবেন। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন ও নির্দোষ, সত্যি কথা বলেছে। এখন শেকলের ব্যাপারটা থেকে ওর প্রতি তাঁর মনোভাব বোঝা যাবে।

শেকলের ঝন ঝন শব্দ কাছে চলে আসায় বেন-হার বুঝল এগিয়ে আসছে সর্দার মাল্লা। একদম কাছে শেকলের শব্দ। এসে গেছে ষাট নম্বরের পালা! হতাশ বেন-হার শান্তভাবে ভাগ্যকে মেনে নিল। কল্পনায় অনুভব করল শক্ত একটা হাত ওর গোড়ালি আঁকড়ে ধরেছে। পায়ে বেড়ির স্পর্শও যেন পেল ও।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন এরিয়াস, দাঁড়ীদের সর্দারকে ডাকলেন। লোকটা যাওয়ার পর একবার আঙুল তুলে ষাট নম্বর বন্দীকে দেখালেন এরিয়াস। বললেন, 'বেড়ি না পরালেও কাজ ছেড়ে ও পালাবে না। এখন থেকে আর কখনও ওকে বেড়ি পরিয়ো না।'

কি বলা হলো শুনতে পেল না বেন-হার। তবুও স্বস্তির শ্বাস ছাড়ল। শেকলটা বেঞ্চ থেকে ঝুলছে, ওর পায়ে বেড়ি পরানো হয়নি। নিজের আসনে ফিরে গেছে সর্দার। ঢাকের দ্রিম দ্রিম শব্দ বেন-হারের কাছে সুমধুর সঙ্গীতের মত মনে হলো। গায়ের জোরে দাঁড় বাইতে লাগল বেন-হার। এতই জোরে যে মনে হলো ভেঙে যাবে দাঁড়।

রাতের জমাট আঁধার ঠেলে দ্রুত এগিয়ে চলল ওদের জাহাজ।

ভোরে, সাগরের বুকে সূর্য মুখ তোলার একটু আগে ডেক থেকে উঠে এসে ঘুমন্ত এরিয়াসকে জাগাল একজন সৈনিক। দ্রুত তৈরি হয়ে নিলেন এরিয়াস। শিরোস্ত্রাণ-বর্ম পরে নিয়ে মুহূর্তে নেমে এলেন। নৌ সৈনিকদের ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়ালেন। হাতে তাঁর তলোয়ার। শান্তস্বরে বললেন, 'জলদস্যুরা কাছে চলে এসেছে। লড়াইয়ের জন্যে তোমরা প্রস্তুতি নাও!'

জাহাজের সবাই যেন এক সঙ্গে জেগে উঠল। শান্তভাবে অল্প কথায় আদেশ দেয়া হলো। সৈন্যরা অস্ত্র তুলে নিয়ে ডেকে চলে এল। বিশ্রামরত দাঁড়-বাইয়েদের সৈন্য প্রহরায় রাখা হলো সর্দার-মাল্লার হেফাজতে। পালা শেষ হয়েছে বলে বেন-হারও তাদের সঙ্গে ডেকের নিচে আশ্রয় পেল। ওপরে, ডেক থেকে ভেসে আসা আওয়াজ শুনল ও। যুদ্ধের সর্বশেষ প্রস্তুতি চলছে। পাল তুলছে সৈন্যরা। জাহাজের কিনারে ষাঁড়ের মোটা চামড়া টাঙাচ্ছে বর্শা আর তীরের আক্রমণ ঠেকাতে।

তারপর হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেল গোটা জাহাজ। পিনপতন নিঝুম নীরবতা। ভয় মেশানো প্রত্যাশা ভরা নিস্তব্ধতা। থমথম করছে চারপাশ। জাহাজের গায়ে ঢেউ বাড়ি খাওয়ার ছলাৎ ছলাৎ আর দাঁড় টানার শব্দ ছাড়া অন্য কোন আওয়াজ

নেই। তারপর ডেক থেকে নির্দেশ ভেসে এল। একসঙ্গে থেমে গেল সব ক'টা দাঁড়।

কেন হঠাৎ এই থেমে যাওয়া? শেকলে বাঁধা একশো বিশ জন বন্দী প্রত্যেকেই এই একই প্রশ্ন করল নিজেকে। যুদ্ধের আদিম উত্তেজনা তাদের রক্তে মোটেও দোলা জাগাচ্ছে না; সবাই শুধু ভাবছে, অনুভব করছে যে অন্ধের মত অসহায় ভাবে তারা বিপদে জড়িয়ে যাচ্ছে। জাহাজের ভাগ্যের সঙ্গে তাদের পরিণতি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জাহাজ যদি ডোবে বা আগুনে পুড়ে যায়, তারাও শেষ হয়ে যাবে সেই সঙ্গে।

যুদ্ধ-জাহাজের দাঁড় টানার শব্দ যেন শুনতে পেল বেন-হার। ওর মনোযোগ আকর্ষণ করল শব্দটা। অল্প অল্প দুলতে শুরু করল অ্যাসট্রোইয়া। প্রথমবারের মত বেন-হার টের পেল আশেপাশেই রয়েছে বড় একটা নৌবহর। এগিয়ে চলেছে সবাই। এগিয়ে চলেছে সম্ভবত প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করতে। বেন-হারের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হলো।

আবার নির্দেশ দেয়া হলো অ্যাসট্রোইয়ার ডেক থেকে। দাঁড়গুলো পানিতে ডুবে গেল, আবারও একবার সামনের অজানায় ছুটল জাহাজ। বৈঠার পানি কেটে এগোনোর শব্দ ছাড়া চারদিক নিঃশব্দ, তবুও প্রত্যেকে তৈরি হয়ে আছে ধাক্কা খাওয়ার জন্যে। জাহাজের পরিবেশ শিকারের ওপর লাফ দিতে উদ্যত বাঘের মত উত্তেজনায় টানটান।

একসঙ্গে বেজে উঠল অনেকগুলো শিঙা। তীক্ষ্ণ শব্দের দীর্ঘ আর্তনাদ। পাল্লা দিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল দামামার গর্জন। একটানা তাল ঠুকছে। দাঁড় টানার গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো। ছুটল অ্যাসট্রোইয়া। পেছন থেকে যোগ দিল আরও অনেকগুলো শিঙা। সামনে শোনা গেল অনেক লোকের চিৎকার চেঁচামেচি, গালিগালাজ, আর্তনাদ, আহতদের কান্না।

জলদস্যুরা অকস্মাৎ অজান্তে আক্রান্ত হয়েছে!

প্রচণ্ড জোরে জাহাজটা সম্মুখভাগ দিয়ে আঘাত করল কিছু একটাকে। দাঁড় ধরে নিজেদের সামলে নিল অনেকে। ছিটকে পড়ে গেল কয়েকজন। ধাক্কা খেয়ে পেছনে হটল অ্যাসট্রোইয়া। তারপর আগের চেয়ে দ্রুত এগোল। ভয়ের কাতর ধ্বনি আর আতঙ্কিত আর্তনাদ শিঙা এবং ঢাকের শব্দ ছাপিয়ে উঠল, কিন্তু চাপা পড়ে গেল জাহাজে জাহাজে ঘসটানি আর সংঘর্ষের শব্দে। বেন-হার টের পেল জলদস্যুদের একটা জাহাজের ওপর চড়াও হয়েছে ওরা। ডুবে যাচ্ছে জলদস্যুদের জাহাজটা। টুকরো টুকরো হয়ে তলিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রে। শুনতে পেল যোদ্ধারা বিজয়ের হুঙ্কার ছাড়ছে গলা ফাটিয়ে। ডেকের ওপর উল্লাসে মেতেছে সবাই। রোমানদের অ্যাসট্রোইয়ার লোহা মোড়ানো কাঠের শূল তার প্রথম শিকারকে হত্যা করেছে।

ক্রুদ্ধ হিংস্র জন্তুর মত এগিয়ে চলল ওদের জাহাজ। সেনারা ব্যস্ত। দৌড়াদৌড়ি করে চলেছে। তেলের পিপেয় তুলোর বল চুবিয়ে ওপরের সহকারীদের দিচ্ছে তারা। এবার যুদ্ধের অন্যান্য নৃশংসতার সঙ্গে যোগ হবে

আগুনে-গোলার ভয়াবহতা।

হঠাৎ অ্যাসট্রোইয়ার বো এত উঁচুতে উঠে গেল যে সামনের দাসদের বেঞ্চে বসে থাকাই দুষ্কর হয়ে দাঁড়াল। সমস্বরে আর্তচিৎকার ছাপিয়ে আবার সৈন্যদের বিজয়োল্লাস শোনা গেল। জলদস্যুদের আরেকটা জাহাজ দখল করা হয়েছে। অ্যাসট্রোইয়ার মাস্তুলের ক্রেন দিয়ে ডুবিয়ে দেয়ার জন্যে জাহাজটাকে উপরে তোলা হলো। আহত-নিহতদের নিয়ে ডুবে গেল জলদস্যুদের নৌযান।

বহুগুণ বেড়ে উঠল দু'পক্ষের চিৎকার। জাহাজের চারপাশে সংঘর্ষের, ভেঙে চুরমার হওয়ার শব্দ। প্রতিবার প্রবল সংঘর্ষের পর শোনা যায় আর্ত চিৎকার আর অভিশাপ। তারপর মুহূর্তের জন্যে হঠাৎ থম থম করে চারদিক। আরোহীদের নিয়ে ডুবে যায় একেকটা জাহাজ।

তবে লড়াই একেবারে একতরফা তা বলা যাবে না। মাঝে মাঝেই হ্যাচওয়ে দিয়ে আহত রোমান সৈন্যদের নিচে নামিয়ে আনা হচ্ছে। মারা যাচ্ছে অনেকেই, রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে থাকছে মেঝেতে।

কখনও কখনও ধোঁয়ার মেঘ ঢুকে পড়ছে অ্যাসট্রোইয়ার কেবিনে। দম আটকে আসছে। দু'হাতে নাক-মুখ চেপে কাশছে সবাই। ওরা জানে জ্বলন্ত জাহাজ পাশ কাটাচ্ছে। সেই জাহাজের দাসদের পায়ে বেড়ি পরানো আছে!

এগিয়ে চলেছে অ্যাসট্রোইয়া। হঠাৎ প্রচণ্ড সংঘর্ষে থরথর করে কেঁপে উঠল। থেমে গেল ধাক্কা খেয়ে। বেঞ্চ থেকে ছিটকে পড়ে গেল সব ক'জন দাস। ওদের হাত থেকে দাঁড় খসে পড়েছে। মাথার ওপর, জাহাজের ডেকে দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ। অ্যাসট্রোইয়ার খোলের পাশে ভয়ানক জোরে ঘর্ষণের, আঁচড়ের শব্দ হলো। এই প্রথমবারের মত ঢাকের দামামা তলিয়ে গেল লোকজনের চিৎকারে। ভয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ভেতরে। দু'একজন মেঝেতে শুয়ে পড়ল। লুকানোর জায়গা খুঁজতে ছুটোছুটি আরম্ভ করল অনেকে।

খোলা হ্যাচওয়ে দিয়ে বেন-হারের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ল একটা লাশ। অর্ধনগ্ন। দাড়িতে মুখ ঢেকে আছে। লোকটা রোমান নয়। মুহূর্তে বেন-হার বুঝে নিল অ্যাসট্রোইয়া আক্রান্ত হয়েছে, নিজেদের ডেকে এখন জান বাঁচাতে লড়ছে রোমান সেনারা। এরিয়াস যুদ্ধ করছেন, হয়তো কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। অন্তরে তাগিদ অনুভব করল বেন-হার। এরিয়াসকে বাঁচাতে হবে। এরিয়াস না বাঁচলে এই বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোন উপায় নেই!

চট করে একবার চারপাশটা দেখে নিল বেন-হার। কেউ তাকিয়ে নেই, কেবিনে চরম বিশৃঙ্খলতা দাসের দল শেকল ছেঁড়ার চেষ্টা করছে। দাসদের জীবন ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে ছুটছে প্রহরী সেনারা।

সামান্য একটু ফাঁক হয়ে আছে হ্যাচওয়ে। একলাফে হ্যাচওয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল বেন-হার। দ্রুত পায়ে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। দেখল আকাশ লাল হয়ে উঠেছে আগুনের প্রভায়। প্রায় সবগুলো জাহাজে আগুন জ্বলছে। আশেপাশে তাকালে সাগরের পানি চোখে পড়ে না, যুদ্ধ-জাহাজ আর সেগুলোর ধ্বংসস্তূপে চারদিক গিজগিজ করছে।

বেন-হার ডেকে প্রায় উঠে এসেছে এমন সময় জলদস্যুদের একটা জাহাজ পাশ থেকে ছুটে এসে অ্যাসট্রোইয়ার মাঝ বরাবর প্রচণ্ড আঘাত হানল। কাত হয়ে গেল অ্যাসট্রোইয়া। বেন-হারের পা সিঁড়ির শেষ ধাপে পিছলে গেল। নিচে আছড়ে পড়ল বেন-হার।

দু'ভাগ হয়ে গেল অ্যাসট্রোইয়া। উত্তাল ঢেউগুলো ফেনা তুলে পাক খেতে খেতে ছুটে এল। একটা বড় ঢেউ বেন-হারকে কাঁধে তুলে নিল, পৌঁছে দিল কেবিনে। ওকে সামলে ওঠার সুযোগ না দিয়ে সাগরের অতলে তলিয়ে গেল রোমান জাহাজ।

পাঁচ

ডুবে গেল অ্যাসট্রোইয়ার ভগ্নাবশেষ। শেষ মুহূর্তে বড় করে একবার দম নিল বেন-হার। যখন সে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে জঞ্জাল থেকে মুক্ত হলো তখন জাহাজটা প্রায় এক ফ্যাদম গভীরে চলে গেছে। প্রাণপণে সাঁতরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করল বেন-হার। অজান্তেই আঁকড়ে ধরল গায়ে সেঁটে আসা একখণ্ড বড়সড় তক্তা। ওটাকে জড়িয়ে ধরে উঠতে চেষ্টা করল সে। ওর মনে হলো একটা যুগ পার হয়ে যাচ্ছে, সাঁতরে চলেছে ও।

তারপর একসময় পানির ওপরে ওর মাথা ভেসে উঠল। ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে, বড় করে দম নিল বেন-হার। একটু সুস্থির হয়ে তক্তার ওপর উঠে বসল। চারপাশে তাকাল। দেখল, পানিতে ডুবে না মরলেও পানির ওপরে মৃত্যু এখনও ওকে ধাওয়া করছে।

চারপাশে যুদ্ধের উন্মাদনা। সমুদ্রের বুক চিরে ছুটছে জ্বলন্ত জাহাজ। নৌ যুদ্ধ থামেনি। একেকটা জাহাজ গুঁতো দিচ্ছে প্রতিপক্ষের খোলে। ধোঁয়ায় আকাশ কালো। বেন-হার বুঝল আসল বিপদ যুদ্ধ নয়, অ্যাসট্রোইয়া ডুবে যাবার পর যেসব সৈন্য এবং জলদস্যু তারই মত ভেসে উঠেছে, তারাই বিপদ ঘটাবে। লোকগুলো পানিতে পড়েও পরস্পর যুদ্ধ করছে। কেউ হাতাহাতি লড়ছে, কেউ বা বর্শা তলোয়ার নিয়ে। ভয়াবহ পরিবেশ। এখন ভেসে থাকার মত একটুকরো অবলম্বনের জন্যে লড়ছে সবাই। এ লড়াই বাঁচার লড়াই, শত্রু-মিত্রের বিভেদ নেই। যে যাকে পারছে খুন করে কাঠকুটো দখল করছে।

বেন-হার দেখল ওখানে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। সে নির্বিরোধী মানুষ, সশস্ত্র সৈন্য বা জলদস্যু যে কেউ সুযোগ পেলে যখন তখন তক্তা কেড়ে নিতে খুন করে ফেলবে ওকে। তক্তা ধরে সাঁতারের মত করে হাত-পা নেড়ে সরে গেল বেন-হার।

খানিক এগোনোর পরে হঠাৎ শুনল পানিতে দাঁড়ের ছপাৎ ছপাৎ শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সরাসরি ওর দিকে তেড়ে আসছে একটা জাহাজ। বিশাল কাঠামো

বিভীষিকার মত। এগিয়ে আসছে অতি দ্রুত। সামনে ছোটখাট কোন বাধা পড়লে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।

জাহাজটার পথ থেকে সরার জন্যে যতটা সম্ভব দ্রুত সাঁতরে চলল বেন-হার। হঠাৎ দেখল খুব কাছেই হাবুডুবু খাচ্ছে একজন লোক। মাথায় তার শিরোস্ত্রাণ। ভেসে থাকার চেষ্টা করছে লোকটা, কিন্তু পারছে না, ভারী পোশাক আর শিরোস্ত্রাণ-বর্মের অনেক বেশি ওজন, ডুবেই যাবে সে। বাঁচার শেষ আকুতি নিয়ে দু'হাত আকাশে ছুঁড়ে দিল লোকটা। চোখ বিস্ফারিত। মুখটা হাঁ হয়ে আছে, আওয়াজ বের হচ্ছে না। হাল ছেড়ে দিয়েছে, আসন্ন মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে।

ওর সাহায্য না পেলে মানুষটা মারা যাবে। সবকিছু ভুলে এগোল বেন-হার। এই মুহূর্তে ওর মনেই নেই যে এই রোমানকে বাঁচালে লোকটা ওকে আবার বন্দী জীবনে ফিরে যেতে বাধ্য করবে, জীবনটা পার করতে হবে জাহাজে জাহাজে দাঁড় টেনে। মা আর তিয়েরজাহ্‌কে খুঁজে বের করা হবে না কখনও আর।

ঢেউয়ের তলায় ডুবে যাওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে লোকটার শিরোস্ত্রাণের শেকল ধরে ফেলল বেন-হার। টান দিল গায়ের জোরে।

মুখটা দেখে চমকে উঠল চিনতে পেরে।

কুইনটাস এরিয়াস!!

বড় বড় বিপজ্জনক ঢেউ তুলে পাশ দিয়ে চলে গেল জলদস্যুদের যুদ্ধ-জাহাজটা। কোনরকমে ভেসে রইল বেন-হার। একটুর জন্যে দাঁড়গুলো ওকে আঘাত করল না।

লড়াই পেছনে ফেলে সরে এল বেন-হার। বহু কসরত করে কুইনটাস এরিয়াসের অচেতন দেহ তুলে আনল তক্তার ওপর। নিজে সে তক্তা ধরে ভাসছে।

সুদীর্ঘ একটা ঘণ্টা কেটে গেল। চিন্তিত হয়ে পড়ল বেন-হার। উদ্ধার পেতে দেরি হলে বাঁচবেন না কুইনটাস এরিয়াস। এখনও জ্ঞান ফেরেনি, এমনই মড়ার মত পড়ে আছেন যে মরেই গেছেন বলে ভয় হয়। তাঁর শিরোস্ত্রাণ আর বুকে বাঁধা লোহার পাত খুলে ফেলল বেন-হার। বুকে হাত রেখে দেখল এখনও হৃৎপিণ্ড চলছে। এরিয়াস হয়তো বাঁচবেন আশা জাগল ওর মনে। ভেসে চলল গভীর সাগরে একটুকরো কাঠ সম্বল করে। অপেক্ষা এবং প্রার্থনা করা ছাড়া করার আর কিছুই নেই ওর।

খানিক পরে জ্ঞান ফিরল এরিয়াসের। চোখ মেললেন তিনি। দৃষ্টি ঝাপসা, ঘোলাটে। ঘোর কাটেনি তাঁর। অবশ্য দ্রুতই সামলে নিলেন নিজেকে। জিজ্ঞেস করলেন তিনি কোথায় আছেন। বেন-হারের মুখে কি ঘটেছিল শোনার পর বললেন, 'যুদ্ধের ফলাফলের ওপর নির্ভর করছে আমরা উদ্ধার পাব কি পাব না। ভাগ্য যদি আমাদের সহায়তা করে তাহলে আমি ভুলব না যে তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। ...আসলেই কি তুমি প্রিন্স হারের ছেলে?'

'জী।'

'তিনি মহৎ লোক ছিলেন, বললেন এরিয়াস। 'আমি যদি বেঁচে থাকি,

তোমাকে আমি মুক্তি দেব। তুমি হবে আমার সন্তান এবং...' হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে থেমে গেলেন তিনি। তারপরই আঙুল তুললেন সাগরের দিকে। দেখো! ঈশ্বর! দেখো! ওটা জাহাজ না? কাদের? আমাদের না শত্রুর? দেখো ওটার মাস্তুলে কাদের পতাকা উড়ছে!' শেষ কথাটা তিনি বেন-হারকে উদ্দেশ করে বললেন।

'কই, আমি তো কিছুই দেখছি না।'

'ওটা নিশ্চয়ই শত্রুদের,' বিষণ্ন স্বরে বললেন এরিয়াস। 'বিজয়ী রোমানদের জাহাজ হলে সবগুলো পতাকা উড়িয়ে আসবে। বেন-হার, ওটা যদি শত্রু-জাহাজ হয় আমার তলা থেকে কাঠের টুকরো সরিয়ে নিয়ো যাতে আমি ডুবে মরে যাই। রোমের ওরা জানুক কুইনটাস এরিয়াস তার জাহাজের সঙ্গে চিরনিদ্রায় চলে গেছে।'

পানির ওপর যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে তাকাল বেন-হার। এবার দেখতে পেল একটা আগুয়ান জাহাজের মাস্তুল। 'আপনি কি নিশ্চিত জাহাজটা শত্রুপক্ষের?' জানতে চাইল সে।

'যদি বিজয়ী রোমান জাহাজ হয় মাস্তুলের মাথায় একটা শিরোস্ত্রাণ বসানো থাকবে।'

আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বেন-হার। 'ওই তো মাস্তুলের ওপরে শিরোস্ত্রাণ!'

'ঠিক দেখেছ তুমি? হ্যাঁ, তাই তো! আমিও দেখতে পাচ্ছি!' উঠে বসলেন এরিয়াস। দু'চোখ চকচক করছে তাঁর। বললেন, 'তারমানে আমরা জিতেছি! বাঁচব আমরা! হাত নাড়ো...ডাকো ওদের...আসতে বলো। চেঁচাও!'

তক্তার ওপর উঠে দাঁড়াল বেন-হার। চিৎকার করে হাত নাড়তে লাগল। খানিকপরে ওদের দিকে ঘুরে গেল জাহাজের মুখ। দেখতে পেয়েছে। দ্রুত এগিয়ে এল, তুলে নিল ওদের।

খুবই সম্মানের সঙ্গে এরিয়াসকে গ্রহণ করা হলো। ডেকে একটা সোফা এনে তাঁকে বসতে দেয়া হলো। সেখানে বসে যুদ্ধের বিবরণ শুনলেন তিনি। জলদস্যুদের বিশটা জাহাজ দখল করে নেয়া হয়েছে। বাকিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে বা পালিয়েছে। যুদ্ধে জয় হয়েছে রোমানদের।

বিজয়ের এই আনন্দঘন মুহূর্তেও এরিয়াস বেন-হারকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা ভোলেননি। বেন-হারকে তিনি কাছে ডাকলেন। সস্নেহে তার কাঁধে হাত রেখে উপস্থিত রোমান অফিসারদের উদ্দেশে বললেন, 'এ আমার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। আমি আশা করব, তোমরা আমাকে যেমন ভালবাসো ওকেও তেমনি ভালবাসবে।'

একমাস পরে বেন-হারকে নিয়ে এরিয়াস পা রাখলেন রোমে। দত্তক নেয়ার ব্যাপারে আইনগত ঝামেলা সম্পন্ন করলেন। আবার মুক্ত হলো বেন-হার। এখন সে আর দাস নয়, সম্মানিত একজন ক্ষমতাশালী রোমান সেনাপতির একমাত্র পুত্র।

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধ নেবার ক্ষমতাও অর্জন করেছে বেন-হার

যারা ওর প্রতি, 'মা আর তিয়েরজাহ্‌র প্রতি অন্যায় করেছিল এবার তাদের দেখে নেবে সে। প্রয়োজনে তুচ্ছজ্ঞান করবে মহাপরাক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্যকে।

ছয়

পুবের সবচেয়ে সমৃদ্ধ নগরী অ্যান্টিয়োক। ঐশ্বর্যে, অস্ত্রবলে গোটা বিশ্বে রোমের পরেই এশহরের স্থান।

উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের এক সকালে শহরের সেরা ধনী সিমোনাইড্‌স্ বণিকের গুদামের সামনে এসে দাঁড়াল এক যুবক।

সিমোনাইড্‌সের গুদামটা ধূসর পাথরে তৈরি সেলুশিয়ান পুলের নিচে। দরজার সামনেই নদীর ঘাট। নদীতে সার বেঁধে আছে জাহাজের বহর। সবগুলোর মাস্তুলে উড়ছে সিমোনাইড্‌সের হলুদ পতাকা।

দৃঢ়পায়ে গুদামে ঢুকল যুবক। ভেতরে স্তূপ করে রাখা আছে হরেক রকম পণ্য সামগ্রী। একদল দাস ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে। তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে অপরিচিত যুবককে জিজ্ঞেস করল, 'জানতে পারি কেন এসেছেন আপনি?'

'আমি সিমোনাইড্‌সের সঙ্গে দেখা করতে চাই। রোম থেকে এসেছি।'

'আমার সঙ্গে আসুন,' পথ দেখাল দাস।

পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে থাকা মালপত্রের ভেতর দিয়ে সরু একটা পথে দাসের পেছন পেছন এগোল যুবক। গুদামের শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটা সিঁড়ি বেয়ে উঠল। ছাদে উঠে দেখল পুলের গা ঘেঁষে ছোট একটা পাথরের বাড়ি। চারপাশে অনেক যত্নে কেউ বাগান করেছে। অজস্র ফুল ফুটে আছে। মাঝখান দিয়ে একটা পথ বাড়ি পর্যন্ত চলে গেছে।

যুবককে নিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল দাস। অন্ধকার একটা প্যাসেজের শেষ মাথায় পর্দা টাঙানো আছে। ওখানে থামল সে। পর্দার বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, 'একজন আগন্তুক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, প্রভু।'

আসতে বলো,' ভেতর থেকে জবাব এল।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল যুবক। একটা উঁচু পিঠওয়ালা আসনে বসে আছে একজন লোক। রুগ্ন শরীর তার। দেখে মনে হয় দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে গেছে পা দুটো। কিন্তু চোখের দৃষ্টি শান দেয়া তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ। তার পাশে বসে আছে অষ্টাদশী এক তরুণী। মাথা ঝুঁকিয়ে দু'জনকেই সম্মান দেখাল যুবক।

যুবকের চেহারা দেখে মুহূর্তের জন্যে চমকে উঠেছিল বৃদ্ধ, খুব দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। মেয়েটা টের পেয়ে বৃদ্ধের কাঁধে হাত রাখল।

'আমিই বণিক সিমোনাইড্‌স, গভীর, গম্ভীর গলায় বলল বৃদ্ধ। তাকিয়ে আছে যুবকের দিকে।

'আমি জুডাহ্, ইথামারের ছেলে,' জানাল যুবক, 'ইথামার ছিলেন জেরুজালেমের প্রিন্স, হার বংশের প্রধান।'

শীর্ণ একটা হাত চাদরের বাইরে ছিল, যুবকের কথা শুনে চাদরটা খামচে ধরল বৃদ্ধ। 'আমার বাড়িতে স্বাগতম,' বলল সে। 'ইসথার, এঁর জন্যে বসার ব্যবস্থা করো।'

বেন-হারের সামনে ছোট একটা টুল নামিয়ে রাখল ইসথার। মেয়েটা দেখতে ছোটখাট। চালচলনে ভদ্র। কমনীয় চেহারা। মুখ দেখে বোঝা যায় মনটা আয়নার মত পরিষ্কার। অজস্র ভাবের খেলা সেখানে। 'আমি সিমোনাইডসের কন্যা ইসথার,' বেন-হারকে বলল সে।

মাথা ঝুঁকিয়ে আরেকবার মেয়েটাকে সম্মান দেখাল বেন-হার। টুলে বসল না।

'সিমোনাইড্স্,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে, 'আমার বাবা যখন মারা যান তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের ভার অ্যান্টিয়োকের এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন। আপনি কি সেই ভৃত্য নন?'

'সে প্রশ্নের জবাব দেবার আগে,' শীতল স্বরে বলল সিমোনাইড্স্, 'আমি প্রমাণ দেখতে চাই যে আপনি হার বংশের রাজপুত্র।'

ঠোঁট কামড়ে ধরল বেন-হার। এরকম পরিস্থিতি সে আশা করেনি। গত তিনবছরে ওর পরিচয়ের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে গেছে।

'আমি শুধু বলতে পারি কি ঘটেছিল আমার জীবনে,' অবশেষে বলল সে, 'অবশ্য যদি শোনার ধৈর্য আপনার থাকে।'

'বলুন,' মাথা ঝাঁকাল সিমোনাইড্স্। 'কিন্তু মনে রাখবেন আমি প্রমাণ চেয়েছি– একথা বলছি না যে আপনি হার বংশের ছেলে নন।'

নিচু গলায় সহজ সরলভাবে বেন-হার নিজের কথা বলে গেল। বলল বছরের পর বছর সে দাস ছিল, এরিয়াস ওকে সেই ভয়াবহ বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করেছেন।

'গত পাঁচ বছর,' বলে চলল সে, 'এরিয়াসের ছেলে পরিচয়ে আমি রোমে কাটিয়েছি। তাঁকে আমি বাবার মতই ভালবাসতাম। তিনিও আমাকে ছেলের চোখেই দেখতেন। তিনি চাইতেন না আমি জেরুজালেমে ফিরি। তবে আমি ভুলিনি যে আমি একজন ইহুদী, ভুলিনি রোমানরা আমার কতখানি ক্ষতি করেছে। এরিয়াস ছিলেন ধনী এবং ক্ষমতাবান। তাঁর মাধ্যমে আমি খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেছি আমার মা-বোনের ভাগ্যে কি ঘটেছে। তিনি তাঁর প্রভাব খাটিয়েও জানতে পারেননি কিছু। আমি গত পাঁচটা বছর নিজেকে গড়েছি। রোমান ক্যাম্পে থেকে আমি লড়তে শিখেছি। একদিন রুখে দাঁড়াতে হলে ওদের যুদ্ধবিদ্যা আমাদেরও শেখা দরকার। যোদ্ধা হিসেবে আমার প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। রোমে রথদৌড় প্রতিযোগিতায় কয়েকবার জিতেছি আমি।

'দু'মাস আগে এরিয়াস যখন মারা গেলেন, আমি ঠিক করলাম জেরুজালেমে ফিরব। রোম থেকে অ্যান্টিয়োকের দিকে রওনা হলাম। ভাগ্যক্রমে এক লোকের

সঙ্গে দেখা হলো। সে আমাকে আপনার জাহাজগুলো দেখিয়ে বলল আপনি ইথামারের ভৃত্য ছিলেন। আপনার সম্বন্ধে অনেক তথ্য সে দিয়েছে আমাকে...'

দম নিতে থামল বেন-হার। মুখ নিচু করে বসে আছে বৃদ্ধ, যেন চেহারা দেখাতে চায় না। 'আমি শুনছি, বলুন,' যুবক চুপ হয়ে যাওয়ায় জড়িত স্বরে বলল সে।

'আমাকে বলা হয়েছে যে হার প্রাসাদকে সম্রাটের সম্পত্তি ঘোষণার সময় গ্রেটাস আর মেসালা মিলে সমস্ত অস্থাবর সম্পদ লুট করেছে। বাড়ি ঘর, জমিও নিজেদের নামে লিখে নিয়েছে। তবে টাকার সন্ধান তারা পায়নি। গ্রেটাস আর মেসালা জানত প্রিন্সের ব্যবসাগুলো সিমোনাইড্‌স্ দেখাশোনা করে। তারা সিমোনাইড্‌স্‌কে বন্দী করে অকথ্য নির্যাতন করল, বিপুল টাকার হদিস পেল না। মুখ খুলল না সিমোনাইড্‌স্। শেষমেশ মুক্তি পেল সে। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সম্রাটের কাছ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করার ছাড়পত্র আদায় করল। এখন সে অ্যান্টিয়োকের সবচেয়ে ধনী সওদাগর।'

আবার থামল বেন-হার। সিমোনাইড্‌সের চোখের দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল। দেখল সে-মুখ পাথরের মত অভিব্যক্তিহীন। হতাশ হলো বেন-হার। 'আমি বোধহয় আপনাকে প্রভাবিত করতে পারিনি,' হতাশ সুরে বলল সে। 'রোমানদের কাছে আমার স্থান আছে...কিন্তু আমিই যে ইথামারের ছেলে তার কোন প্রমাণ নেই। প্রমাণ করতে পারব না আমি। তবে, সিমোনাইড্‌স, একটা কথা আপনার জানা থাকুক, বাবার সম্পত্তির জন্যে এখানে আসিনি আমি। ওই সম্পত্তি আমার দরকার নেই। আমার পালক বাবা কুইনটাস এরিয়াস যে সম্পদ রেখে গেছেন তা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি। এখানে আমি শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে এসেছি, আপনি কি জানেন, বলতে পারেন কোথায় আছে আমার মা...আমার বোন তিয়েরজাহ্?'

গালের একটা পেশীও নড়ল না, ভাবলেশহীন চেহারায় সিমোনাইড্‌স্ বলল, 'প্রিন্স ইথামারকে আমি চিনতাম। তাঁর মৃত্যুর পরে হারদের পারিবারিক বিপর্যয়ের খবরও শুনেছি। কয়েক বছর ধরে প্রিন্স ইথামারের স্ত্রী-কন্যাকে খুঁজেও কিছুই জানতে পারিনি। ধরে নিয়েছি ওরা চিরতরে হারিয়ে গেছে।'

'হতাশ হতে আমি তো অভ্যস্ত হয়ে গেছি,' ফিসফিস করে যেন নিজেকেই বলল বেন-হার। কান্না চাপতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল একবার। তারপর ফ্যাসফেসে কণ্ঠে বলল, 'আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।'

ধীর পায়ে পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। শুনল পেছন থেকে গম্ভীর স্বরে সিমোনাইড্‌স্ বলল, 'শান্তি আপনার সঙ্গে থাকুক।'

চলে গেল বেন-হার।

যুবক ঘরের বাইরে পা রাখতেই জোরে জোরে তালি বাজাল সিমোনাইড্‌স্। দেয়ালের গায়ে একটা গুপ্ত দরজা খুলে গেল তালি শুনে। কালো দাড়িওয়ালা লম্বা একজন লোক এসে দাঁড়াল সিমোনাইডসের সামনে। জ্বলজ্বলে চোখ লোকটার। বণিককে কুর্নিশ করে তাকিয়ে থাকল।

'শোনো, মাল্লুচ,' বলল সিমোনাইড্স্, 'তোমার জন্যে একটা কাজ ঠিক করেছি আমি। একটু আগেই এঘর থেকে একজন যুবক বেরিয়ে গেছে– তোমার সমানই লম্বা হবে, পরনে ইহুদীদের পোশাক। তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করবে তুমি। প্রত্যেক রাতে আমাকে জানাবে সে কোথায় যায়, কি করে, কাদের সঙ্গে মেশে। যুবক যদি শহর থেকে চলে যায় সঙ্গে যাবে তুমি। সম্ভব হলে বন্ধুত্ব পাতাবে, তাকে কিছুতেই জানতে দেয়া চলবে না যে তুমি আমার লোক। যাও এখন, জলদি!'

আরেকবার কুর্নিশ করে চলে গেল লোকটা। সে যাওয়ার পরে গলা ছেড়ে হাসল সিমোনাইড্স্। মেয়ের দিকে তাকাল। ইসথারের চেহারা চিন্তায় মগ্ন, বিষণ্ন দেখাচ্ছে।

'হারদের বিপুল সম্পদ নিয়ে আমি কি করব, ইসথার?' নাক উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে জানতে চাইল সিমোনাইড্স্।

'সেই সম্পদের মালিক কি একটু আগে হতাশ হয়ে ফিরে গেল না?' নিচু গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল ইসথার।

'শোনো তাহলে কেন হাসছিলাম,' বলল সিমোনাইড্স্। 'জুডাহ্ দেখতে একেবারেই ওর বাবার মত হয়েছে। ওকে দেখেই আমার ইচ্ছে হয়েছিল হাত দুটো ধরে বলি, "এতদিন তোমার বাবার সম্পদ পাহারা দিয়েছি। তোমার বাবা ইথামারের যেমন ছিলাম ঠিক তেমনি আমি তোমারও ভৃত্য হয়ে থাকব আজীবন।" তাই আমি বলতাম, ইসথার, কিন্তু দুটো বিষয় চিন্তা করে চুপ করে গেছি। প্রথমত আমাকে জানতে হবে জুডাহ্ কেমন মানুষ। দ্বিতীয়ত মেসালা আর গ্রেটাসের ওপর শোধ নিতে হবে, ওরা আমার প্রভুর ক্ষতি করেছে, আমাকে পঙ্গু বানিয়ে দিয়েছে। যখন শুনলাম বেন-হার যুদ্ধবিদ্যা শিখেছে বুঝতে পারলাম ওর হৃদয়ে জ্বলছে প্রতিশোধের লেলিহান শিখা। ইসথার, সে কারণেই আমি তখন হেসেছিলাম।'

'সেকি আর আসবে?' বাবার হাত ধরল ইসথার।

'আসবে। আমি প্রস্তুত হওয়ামাত্র মাল্লুচ ওকে নিয়ে আসবে।'

'কবে তুমি প্রস্তুত হবে?'

'অল্প কিছুদিন, আর অল্প কিছুদিন। ও ভেবেছে ওকে যারা চিনত তারা সবাই মারা গেছে। বেন-হার ভুল জানে। এখনও একজন বেঁচে আছে যে ওকে চেনে।'

'ওর মা?'

'না। সময় হলে সাক্ষিকে আমি ওর সামনে দাঁড় করাব। সবকিছু ঠিকঠাক চললে আমি আর বেন-হার দু'জনেই প্রতিশোধ নিতে পারব– একসঙ্গে!'

সাত

সিমোনাইড্‌সের বিশাল গুদাম থেকে বেরোনোর পর নিজেকে ভয়ানক একা লাগল ওর। লোকজন এড়িয়ে নদীর তীরে চলে এল বেন-হার। আনমনে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে লাগল। সংবিৎ ফিরে পেল, বাস্তবে ফিরে এল ও ঘণ্টাখানেক পরে, ট্রামপেটের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে।

চারপাশে একবার তাকাল বেন-হার। শব্দ লক্ষ্য করে পা বাড়াল। রাস্তাটা বাঁক নিয়ে নদীর তীর থেকে সরে এক ঝাড় সাইপ্রেস গাছের মাঝ দিয়ে গেছে। খানিক যাওয়ার পর ছায়ায় বিশ্রামরত একজন লোককে দেখল বেন-হার। ওকে দেখে এগিয়ে এল লোকটা।

'আপনাকে দেখে অ্যান্টিয়োকে নতুন মনে হচ্ছে।' হাসিখুশি দেখতে লোকটা। আবার বলল, 'আমার ধারণা আপনি স্টেডিয়াম খুঁজছেন। ধারণাটা যদি ঠিক হয়, চলুন আমার সঙ্গে, আমিও ওদিকেই যাচ্ছি। প্রতিযোগীদের জন্যে ট্রামপেট মাত্র বেজেছে, রথগুলো এখনই দৌড়ের মাঠে চলে আসবে।'

হঠাৎ করেই উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করে উঠল বেন-হারের চোখ। দু'হাতে লোকটার বাহু ধরে অনুরোধের সুরে বলল, 'আপনার সঙ্গে স্টেডিয়াম দেখতে গেলে ভাল লাগবে আমার। রোমে থাকতে আমি প্রায়ই বাবার রথ চালাতাম।'

'আমি মাল্লুচ, অ্যান্টিয়োকের বণিক,' পরিচয় দিল লোকটা। একটু যেন বিস্মিত দৃষ্টিতে বেন-হারকে দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি কিছু মনে না করলে একটা প্রশ্ন করি।' থামল সে, এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, 'আপনি বলছেন আপনার বাবা একজন রোমান। তাহলে আপনি ইহুদীদের পোশাক পরে আছেন কেন?'

'মহৎ এরিয়াস ছিলেন আমার পালক-বাবা,' বলল বেন-হার।

'আচ্ছা, তাই বলুন! চলুন, রথ দৌড়ের মহড়া দেখি গিয়ে।'

গাছের সারি পার হয়ে ওরা একটা মাঠে উপস্থিত হলো। মাঠের বিশেষ একটা জায়গা দড়ি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। দড়ি বাঁধায় খুঁটির বদলে ব্যবহৃত হয়েছে মাটিতে গাঁথা বর্শা। ভেতরের রথ দৌড়ের জমি অত্যন্ত মসৃণ, নরম—'বালি মেশানো। চারধারে দর্শকদের বসার আসন। নিচু থেকে ওপরে উঠেছে ধাপে ধাপে। এরকমই একটা ধাপে, হল্লারত মানুষের ভীড়ে ঢুকে নিজেদের জায়গা করে নিল বেন-হার আর মাল্লুচ।

চার ঘোড়ায় টানা প্রায় বারো চোদ্দটা রথ যথাসাধ্য দ্রুত ছুটছে। আটটা রথ বেন-হারের নজর কাড়ল। ওগুলো দক্ষ হাতে পরিচালিত হচ্ছে। নয় নম্বর রথটা যখন ওর সামনে গিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল, বিস্ময় চাপতে মাল্লুচের কাঁধ জড়িয়ে ধরল বেন-হার।

'আমি সম্রাটের আস্তাবলেও গিয়েছি,' অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল সে, সেখানেও এত ভাল ঘোড়া দেখিনি!'

কথাও শেষ করতে পারেনি বেন-হার, ঘোড়াগুলোর গতি কমে গেল।

দেখা দিল বিশৃঙ্খলতা। এদিক ওদিক দৌড়াতে চাইছে ঘোড়াগুলো। বেন-হার শুনতে পেল দর্শকদের মাঝে, পেছন থেকে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে চেচাচ্ছে একজন লোক। ঘাড় ফেরাল ও। একজন আরবকে দেখতে পেল। দু'হাত মুঠো করে উঁচিয়ে জ্বলজ্বলে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে লোকটা। লোকজন তার আস্ফালন দেখে হাসছে।

'লোকটা কে?' জানতে চাইল বেন-হার।

'শেখ ইলডেরিম, মোয়াবের ওপারের মরুভূমি থেকে এসেছে। ঘোড়াগুলো ওই লোকেরই, চাইছে ছ'দিন পরে ওগুলোকে প্রতিযোগিতায় নামাতে।'

এদিকে রথটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করল চালক। এলোপাতাড়ি চাবুক চালাল। হিতে বিপরীত হলো, আরও খেপে গেল ঘোড়াগুলো, সামনের দু'পা শূন্যে ছুঁড়ে পেছতে শুরু করল। একদম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে।

'রোমানের বাচ্চারা আস্ত কুত্তা! দু'হাত শূন্যে ছুঁড়ে গর্জন ছাড়ল শেখ। 'হারামজাদা বলেছিল ওদের সামলে নিতে পারবে। শুয়োরটার মাথায় অভিশাপ পড়ুক! কোথায় ঘোড়াগুলো ঈগলের মত উড়ে চলবে, তা না, ওদের দেখে মানুষ হাসছে!' আরব বোধহয় দেখতে পায়নি ঘোড়াগুলোকে চাবুক মারা হয়েছে, কারণ সে বলল, 'একবার যদি লোকটা আমার ঘোড়ার গায়ে চাবুক মারে ওর হৃৎপিণ্ড খিমচে ছিঁড়ে নেব আমি। ওহ্, কোন কুক্ষণে যে ওই রোমানটার ওপরে ভরসা করেছিলাম, গর্দভটার গাধা চালাবার দক্ষতাও নেই!'

এক নাগাড়ে অভিশাপ দিচ্ছে উত্তেজিত শেখ। বন্ধুরা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। শেখের দুঃখটা অন্তর দিয়ে অনুভব করল বেন-হার। ঘোড়াগুলো সত্যিই চমৎকার, ভাল চালকের হাতে পড়লে উড়েই চলবে। সাদা রঙ, চকচকে লম্বা লেজ বে ঘোড়াগুলোর। আহাজারির ফাঁকে শেখ বারবার বলছে ওগুলো অমূল্য। আসলেও তাই।

বেন-হার বুঝতে পারছে ঘোড়াগুলো শেখের কতখানি প্রিয়। সন্দেহ নেই তার চোখের সামনে বেড়ে উঠেছে ওরা। মরুভূমিতে ওগুলোকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে শেখ। ভেবেছে একদিন রোমানদের হারিয়ে দিয়ে তার ঘোড়া বিজয় ছিনিয়ে আনবে। কোন সন্দেহ ছিল না তার মনে যে ওরা জিতবে, কিন্তু অযোগ্য চালক সবকিছু ভণ্ডুল করে দিচ্ছে।

ছয়-সাতজন মিলে অবশেষে শেখের রথ থামাল। দৌড়ের মাঠের দিকে এগিয়ে এল আরেকটা রথ। ওটাকে দেখেই রোমান দর্শকরা উঠে দাঁড়াল। সবাই হাত নাড়ছে, খুশি হয়ে উঠেছে। দূরত্ব বেশি বলে চালকের চেহারা বেন-হার দেখতে পেল না। ঘোড়া চারটের মধ্যে দুটো সাদা দুটো কালো। রোমান রীতিতে ছোট করে লেজ ছাঁটা, কেশর বেঁধে রাখা হয়েছে উজ্জ্বল হলুদ-লাল ফিতে দিয়ে। রথটা অপূর্ব সুন্দর, তৈরিতে মুন্সিয়ানা আছে। চাকার হাবগুলো পালিশ করা

চকচকে ব্রোঞ্জের, স্পোকগুলো হাতির দাঁতের, অ্যাক্সেলের দু'মাথায় ঝকঝকে পিতলের তৈরি ক্রুদ্ধ বাঘের মুখ।

কে এই চালক?

এখনও বেন-হার রথ চালকের চেহারা দেখতে পাচ্ছে না, তবে কেন যেন লোকটার নড়াচড়া, ভাব-ভঙ্গি ওর পরিচিত ঠেকছে। মনে দোলা দিচ্ছে অস্পষ্ট স্মৃতি।

কে লোকটা?

কাছে চলে এল রথ। দৌড়াচ্ছে ঘোড়াগুলো। বেশির ভাগ রোমান দর্শক হাততালি দিচ্ছে, উৎফুল্ল চিৎকার করছে। লোকটা বোধহয় সম্ভাব্য বিজয়ী। হঠাৎ তাকে কাছ থেকে দেখার তাগিদ অনুভব করল বেন-হার। ভীড় ঠেলে একেবারে প্রাচীরের কাছে চলে এল সে। এখান থেকে রথের চালককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঋজু ভঙ্গিতে রথে দাঁড়িয়েছে লাল টিউনিক পরা লম্বা লোকটা। ডানহাতে উদ্যত চাবুক, বাম হাতে ধরে রেখেছে ঘোড়ার রাস।

রোমান দর্শকদের উল্লসিত হৈচৈ বেড়ে গেল। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে বেন-হার, একদৃষ্টিতে রথের চালককে দেখছে। লোকটাকে চিনতে পেরেছে সে।

মেসালা!

আট

দর্শকদের সামনে দিয়ে মেসালার রথ ছুটে যাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়াল বেন-হার। ঠিক সেই সময়ে মঞ্চের মত উঁচু একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে জোরাল কণ্ঠে একজন আরব বলে উঠল, পুব এবং পশ্চিম থেকে আসা দর্শকবৃন্দ, আপনারা শেখ ইলডেরিমের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। শেখ ইলডেরিম অ্যান্টিয়োকের সেরা ঘোড়াগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্যে এসেছেন। তিনি একজন চালক খুঁজছেন। কেউ এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলে তাকে যথোপযুক্ত পুরস্কার দেয়া হবে।'

আরবের ঘোষণায় দর্শকদের মাঝে গুঞ্জন উঠল। মনে দ্বিধা নিয়ে ভীড়ের মাঝে বেন-হার শেখ ইলডেরিমকে খুঁজছে, এমন সময় তার দিকে এগিয়ে এল মাল্লুচ। তার ধারণা বেন-হার প্রস্তাবটা লুফে নেবে। কিন্তু বেন-হার শুধু জিজ্ঞেস করল, 'এবার আমরা কোথায় যাব?'

'আমি আপনাকে ক্যাসটালিয়ার ফোয়ারা দেখাতে চাই। জায়গাটা এখান থেকে দূরে নয়। সৌন্দর্যের জন্যে সারা পৃথিবীতে এই ফোয়ারার নাম আছে।'

'বেশ।' কাঁধ ঝাঁকাল বেন-হার। নিরাসক্ত চেহারা।

মাল্লুচ বুঝল তার সঙ্গীর মন হঠাৎ করেই খারাপ হয়ে গেছে। চুপ করে ওর পাশে হাঁটছে বেন-হার। থমথম করছে মুখ। মেসালাকে দেখে সব মনে পড়ে গেছে ওর। মনে হচ্ছে এক ঘণ্টাও হয়নি মাকে, তিয়েরজাহ্‌কে ওর কাছ থেকে

সরিয়ে নিয়ে গেল রোমান সেনার দল, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো। তারপর নিঃসঙ্গ দাসের জীবন। দাঁড় টানার সময়টা বাদ দিলে পুরোটা সময়ে শুধু একটা চিন্তা– প্রতিশোধ নিতে হবে। প্রতিটা দুঃস্বপ্নে মেসালাকে দেখেছে ও। জেগে উঠে দাঁতে দাঁত চেপে শপথ করেছে, গ্রেটাসকে হয়তো ক্ষমা করা যায়, কিন্তু মেসালার ক্ষমা নেই। কক্ষনো না!

আবার দেখা হবে মেসালার সঙ্গে, ভাবছে বেন-হার, ভাবছে কখন দেখা হওয়া উচিত। কেমন ভাবে, কি অবস্থায় দেখা হলে সাক্ষাৎ সবচেয়ে স্মৃতিবহ হবে।

ক্যাসটালিয়ার বিখ্যাত ফোয়ারার চারপাশে অজস্র লোকের সমাগম হয়েছে। নোঙরা কাপড় পরা দাসী, অশ্বারোহী, পদচারী আছে সমান সংখ্যায়। মাঝে মাঝে গর্জন তুলে রথ আসছে যাচ্ছে। ভীড় ঠেলে এগোনোর সময় ওরা লক্ষ করল লোকজনের মাঝে হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে কারণ জানার চেষ্টা করল বেন-হার। প্রথমে সে অস্বাভাবিক উঁচু আর সাদা একটা উট দেখতে পেল, পথ করে উটটাকে দড়ি ধরে নিয়ে আসছে একজন অশ্বারোহী। টুঙটাঙ শব্দে বাজছে রূপোর ঘণ্টি। উটের পিঠে মস্ত একটা ক্রিমসন-সোনালী রঙের হাওদা। হাওদার নিচে বসে আছে এক বৃদ্ধ আর এক তরুণী। বৃদ্ধকে দেখে মনে হয় বয়সের গাছপাথর নেই, ঝুলঝুলে চামড়া, মমির মত রঙ। মাথায় বড়সড় একটা পাগড়ি মত পরেছে, গায়ে দামী শাল জড়ানো। তার পাশে বসে থাকা যুবতী অপূর্ব সুন্দরী। মসৃণ চামড়ার রঙ ধবধবে সাদা। কাজল কালো বড় বড় চোখে মায়াময় চাহনী। কমলার কোয়ার মত ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, মুক্তোর মত চমৎকার দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে। একেবারে দেবী প্রতিমা।

খানিক এগোনোর পর সামনে ঝুঁকে অশ্বারোহীকে কি যেন বলল যুবতী। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল বিশালদেহী নিগ্রো লোকটা। উটটাকে নিয়ে এল ফোয়ারার কাছে, হাঁটু মুড়ে বসতে বাধ্য করল সে। এরপর যুবতীর হাত থেকে একটা রূপোর পাত্র নিয়ে তাতে ফোয়ারার পানি ভরতে লাগল।

হঠাৎ ছুটন্ত ঘোড়ার শব্দ ভেসে এল। দ্রুত এদিকেই এগোচ্ছে একটা রথ। লোকজন চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করল, যে যেদিকে পারল ছিটকে সরে গেল।

বেন-হারের হাত চেপে ধরে উত্তেজিত মাল্লুচ বলল, 'সাবধান! রোমানটা আমাদের মাড়িয়ে যেতে চাইছে!'

ঝটিতে ঘুরে দাঁড়াল বেন-হার। দেখল ভীড় লক্ষ্য করে রথ চালিয়ে দিয়েছে মেসালা। হাসছে লোকজনকে আতঙ্কে ছুটতে দেখে। পর মুহূর্তে তার মুখোভাব পাল্টে গেল। ভীড় দু'ভাগ হয়ে যেতে হঠাৎ সে সরাসরি সামনে দেখতে পেল পথ রুদ্ধ করে বসে থাকা উটটাকে।

মেসালার রথটাকে ছুটে আসতে দেখে সরবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো যুবতী। বুড়োও দ্রুত নড়াচড়ার ক্ষমতা নেই বলে বসেই আছে। বুঝে গেছে বাঁচার কোন পথ নেই আর।

রথটা কাছে আসতেই বাঁ দিকের ঘোড়াগুলো লক্ষ্য করে ঝাপিয়ে পড়ল বেন-

হার। রাস আঁকড়ে ধরল। ভয় পেয়ে দু'পায়ে দাঁড়িয়ে পেছনে হঠল ঘোড়া দুটো, বাকি দুটো আচমকা টান পড়ায় ছুটন্ত অবস্থায় ঘুরে দাঁড়াল। উল্টাতে গিয়েও ঝাঁকি খেয়ে কোনমতে দাঁড়িয়ে গেল রথটা। ছিটকে পড়তে গিয়েও পড়ল না মেসালা।

নেমে এল সে রথ থেকে। বেন-হারকে একবার উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বৃদ্ধ আর তরুণীর উদ্দেশে বলল, 'আমাকে মাফ করুন। আপনাদের দু'জনের কাছে আমি ক্ষমা চাই। আমার নাম মেসালা। দেবতাদের নামে শপথ করে বলছি আগে থেকে আপনাদের বা উটটাকে আমি দেখতে পাইনি। লোকজনকে ভয় দেখিয়ে কৌতুক করছি মনে করেছিলাম, কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে এখন মনে হচ্ছে আমিই হাসির পাত্র!'

মেসালার বিনীত ভাষণ জনতার ক্ষোভ দূর করে দিল। প্রশংসা মাখা দৃষ্টিতে যুবতীকে দেখল মেসালা। নিজের সেরা হাসিটা উপহার দিল। বলল, 'আপনি অস্বাভাবিক রূপসী!' হাসিমুখ গম্ভীর করে চেহারা উদ্বিগ্ন করে তুলল সে, 'দয়া করে বলুন, আমি কি আপনার ক্ষমা পেয়েছি?'

মেসালাকে উপেক্ষা করে বেন-হারের দিকে তাকাল যুবতী, মিষ্টি করে হাসল। কোকিল কণ্ঠে বলল, 'আমার বাবা খুব তৃষ্ণার্ত, আপনি কি আমাদের পাত্রটা ভরে এনে দেবেন?'

মাথা নুইয়ে সম্মান দেখিয়ে বেন-হার বলল, 'আপনার নির্দেশ আমার জন্যে শিরোধার্য!'

ফোয়ারার দিকে এগোতে গিয়ে মেসালার মুখোমুখি হলো বেন-হার। দৃষ্টির লড়াই হলো ওদের। বেন-হারের দৃষ্টিতে স্পষ্ট বিদ্রোহ, মেসালার চোখে কৌতুক ঝলসে উঠছে।

যুবতীর দিকে তাকাল মেসালা। কণ্ঠে আবেগের মিশেল দিয়ে বলল, 'ওহ্, কি সুন্দর আপনি! কি নিষ্ঠুর! প্রার্থনা করি আবার যেন আমাদের দেখা হয়।' আরেকবার মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখিয়ে রথে চড়ে চলে গেল মেসালা। আগ্রহ ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল যুবতী, মনে হয় না কোন বিতৃষ্ণা জন্মেছে তার মনে।

বেন-হারের কাছ থেকে পাত্রটা নিয়ে বাবাকে পানি পান করাল যুবতী। নিজে অবশিষ্ট পানি শেষ করে পাত্রটা আবার বেন-হারের হাতে দিয়ে বলল, 'দয়া করে এটা গ্রহণ করুন! এই পাত্রের সঙ্গে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা আপনার হৃদয়ে স্থান পাক।'

হতবাক বেন-হার জবাব দেবার আগেই বুড়ো ভদ্রলোক হাওদা থেকে ঝুঁকে বললেন, 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি সাহায্য না করলে কি যে হত কে জানে! আমি বালথ্যাসার, একজন মিশরীয়। শেখ ইলডেরিমের অতিথি। ড্যাফনে গ্রামের খেজুর গাছ সমৃদ্ধ মরুদ্যানে তাঁবু গেড়েছেন তিনি। আমরাও ওখানেই থাকব। আসবেন আপনি। আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে পারলে কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

নিগ্রোর ইশারায় উঠে দাড়াল উট। পেছন থেকে তাকিয়ে থাকল বেন-হার। একপলকের জন্যে মেসালাকে দেখতে পেল। মেসালার ঠোঁটে টিটকারির হাসি,

দ্রুত রথ ছুটিয়ে চলেছে আবার।

মাল্লুচের বাহু ধরে ভীড় থেকে বেরিয়ে এল বেন-হার। বলল, 'মাল্লুচ, কোন মানুষ কি তার মাকে ভুলতে পারে?'

'না,' বলল মাল্লুচ, 'কোন ইহুদী কক্ষনো ভুলতে পারে না।' লক্ষ করে দেখল ক্রোধে বেন-হারের মুখ লাল হয়ে গেছে। ধক ধক করে জ্বলছে চোখ জোড়া।

'আমার ধারণা আপনাকে বিশ্বাস করা যায়,' বলল বেন-হার, 'আমি আপনাকে আমার জীবনের দুর্ঘটনার কথা বলতে চাই...'

আজ আরও একবার নিজের কাহিনী বলে গেল বেন-হার। দুর্ঘটনা, দাসত্ব, তারপর মুক্তি– সব শোনাল। তারপর মাল্লুচকে বলল, 'তখন থেকে আমার মা-বোনকে দেখিনি। এমনকি তারা কোথায় আছে, বেঁচে আছে কিনা, তাও জানি না। কিন্তু, মাল্লুচ, ওই রথ চালক রোমান জানে আমার মা-বোনের ভাগ্যে কি ঘটেছে। যদি ওরা মরে গিয়ে থাকে, সে আমাকে বলতে পারবে কোথায় ওদের মৃত্যু হয়েছে।'

'সে কি বলবে না?'

'না।'

'কেন?'

'কারণ আমি ইহুদী আর সে রোমান।'

'সেকি আপনাকে চিনতে পেরেছে?'

'না। ওর ধারণা আমি বহুদিন আগেই মারা গেছি।'

'অবাক লাগছে ভাবতে যে আপনি ওকে দেখামাত্র খুন করেননি,' বলল মাল্লুচ।

ভয়ানক নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি ফুটল বেন-হারের ঠোঁটে। 'খুন করলে ঋণ শোধ হবে না,' বলল সে, 'ওকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে মারতে হবে। এমন ভাবে, যাতে সে নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করে।' একমুহূর্ত থামল বেন-হার, তারপর বলল, 'আপনার পক্ষে আমাকে সাহায্য করা সম্ভব। করবেন সাহায্য?'

'লোকটা রোমান,' বলল মাল্লুচ, 'আর আমি ইহুদী। সুতরাং আমি আপনাকে সাহায্য করব।'

'আপনার হাতটা দিন।' মাল্লুচের সঙ্গে করমর্দন করল আবেগাপ্লুত বেন-হার। তারপর বলল, 'আপনি কি শেখ ইলডেরিমকে চেনেন?'

'হ্যাঁ।'

'যে মরুদ্যানে তিনি থেমেছেন সেটা এখান থেকে কতদূরে?'

'দ্রুতগামী উট পেলে আমরা একঘন্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাব।'

'ধন্যবাদ। এবার দয়া করে রথদৌড়ের ব্যাপারে বলুন।'

'কন্সাল ম্যাক্সেনটিয়াস এশহরে আসছেন। তাঁর সম্মানে এই রথদৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে। বিজয়ী রথচালক দশহাজার সেসটারটি পুরস্কার পাবে– সারা জীবনের জন্যে যথেষ্ট!'

'আর সার্কাস? আমি শুনেছি রোমের ম্যাক্সিমাসের পরেই অ্যান্টিয়োকের নাম আছে।'

'ম্যাক্সিমাসে দু'লাখ পঁচাত্তর হাজার লোক ধরে। আমাদেরটায় দু'লাখ। দুটোই মার্বেল পাথরে তৈরি, সুযোগ-সুবিধাও একই রকম।'

'নিয়ম কানুনও একই রকম?'

'না। রোমে চারটের বেশি রথ এক সঙ্গে দৌড়ায় না। এখানে ওসবের বালাই নেই।'

'কবে প্রতিযোগিতা হবে?'

'আজ থেকে ছদিন পরে।'

'হাতে সময় কম,' চিন্তিতভাবে বলল বেন-হার, 'তবে যথেষ্ট। মেসালা যদি রথ নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে, আমিও থাকব।'

'মেসালা থাকবেন,' বলল মাল্লুচ। হাসছে বেন-হারের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে। সে-ও চায় সবার সামনে রোমানরা অপদস্থ হোক।

ধন্যবাদ, মাল্লুচ,' বলল বেন-হার। 'আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন। এবার তাহলে আমাকে শেখ ইলডেরিমের ওখানে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।'

'বেশ, কবে যাবেন?'

'আজই। কাল হয়তো অন্য চালককে তিনি ঘোড়ার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন। দেরি করা ঠিক হবে না।'

'চলুন।' বেন-হারের পাশে পাশে এগোল মাল্লুচ। বলল, 'আস্তাবল থেকে আমরা দ্রুতগামী দুটো উট ভাড়া করব। পৌঁছতে এক ঘণ্টার একটু বেশি লাগতে পারে।'

নয়

খেজুর গাছ ঘেরা মরুদ্যানে ওরা পৌঁছাবার পরে মাল্লুচ বেন-হারকে রেখে একাই তাঁবুতে ঢুকল শেখ ইলডেরিমের সঙ্গে কথা বলতে। বেন-হার খেজুর গাছের ছায়ায়, মনোরম একটা খালের পাড়ে বিশ্রাম নিতে বসল।

খানিক পরে কথা সেরে এসে মাল্লুচ তাকে বলল, 'আপনার কথা শেখকে বলেছি। সকালে তিনি আপনাকে পরীক্ষা করে দেখবেন। আপনাকে আজ রাতটা তার এখানে থাকতে বলেছেন। আমি জরুরী কাজে অ্যান্টিয়োকে ফিরে যাচ্ছি, কালকে আবার আসব। প্রতিযোগিতার আগে পর্যন্ত আপনার সঙ্গেই থাকব আমি।'

মাল্লুচকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল বেন-হার। ফিরতি পথ ধরল মাল্লুচ। শেখের ভৃত্যরা বেন-হারকে পথ দেখিয়ে প্রভুর তাঁবুতে নিয়ে গেল।

ক্রিমসন আর নীল কাপড়ের কুশন দেয়া মস্ত একটা ডিভানে বসে আছেন

শেখ ইলডেরিম। 'আসুন, আসুন বিশ্রাম নিন' আন্তরিক সুরে বেন-হারকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি। তাঁর ভৃত্যরা খাল থেকে পানি এনে বেন-হারের পা ধুইয়ে দিল। কাজ শেষ হলে ভৃত্যদের চলে যেতে ইশারা করলেন শেখ। তারা যাওয়ার পরে বললেন, 'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মালুচ আপনার ইতিহাস খানিকটা বলেছে আমাকে। আপনি আমার অতিথি, আপনার ব্যাপারে আরও জানার আগ্রহ হচ্ছে আমার।'

'প্রথমেই বলে নেয়া ভাল যে আমি রোমান নই,' কথা শুরু করল বেন-হার। 'আমি ইহুদী, এবং রোমানদের সবকিছুকে আমি ঘৃণা করি। শপথ করছি, আমাকে যদি আপনি প্রতিশোধ নেয়ার উপায় করে দেন তাহলে অর্থ এবং বিজয়ের সম্মান আপনার হবে। ওসব আমার চাই না।'

খুশি হলেন ইলডেরিম। এমন তেজবান যুবকই তো চাই। 'রথ চালানোয় আপনার দক্ষতা কতখানি?' জানতে চাইলেন তিনি। 'আগে রথদৌড়ে অংশ নিয়েছেন? আমার ঘোড়াগুলো দেখতে যেমন চমৎকার তেমনি শক্তিশালী আর দ্রুত। আপনি যদি বশ করতে পারেন ওরা জিতবেন।'

'আমি জানি ওরা জিতবে,' বলল বেন-হার। 'দুনিয়ার সেরা ঘোড়া ওগুলো। আমি রোমে শিক্ষকদের কাছে বেশ কিছু কলাকৌশল শিখেছি, তবে সেসব বলে আপনাকে প্রভাবিত করতে চাই না। কাল ট্রায়ালের সময় দেখবেন, যদি আমি ঘোড়াগুলোকে বশ করে নিতে পারি, আপনি পাবেন সম্মান আর পুরস্কারের অর্থ, আর আমি নেব আমার প্রতিশোধ।'

শেখ ইলডেরিম হাসলেন। বললেন, 'আপনি একেবারে আমার মনের কথা বলেছেন। কালকে সকালে তাহলে রথটা চালিয়ে দেখবেন।'

তাঁবুর পেছনদিকের পর্দা দুলে উঠল। ইলডেরিম বললেন, 'রাতের খাবার তৈরি। এই যে আমার বন্ধু বালথ্যাসারও এসে পড়েছেন। আজ আমি এমন একটা গল্প শোনাব যে গল্প অসংখ্যবার শুনেও কোন ইহুদী ক্লান্ত হবে না।'

ভৃত্যরা বৃদ্ধ মিশরীয়কে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করল। শেখ আর বেন-হার ডিভান থেকে উঠে, দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখাল। 'বন্ধু, আপনার ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক,' বললেন ইলডেরিম। বেন-হারের হাত ধরে বৃদ্ধকে বললেন, এই যুবক আজ আমাদের সঙ্গে খাবে। আমি কথা দিয়েছি, কাল সে আমার ঘোড়াগুলো বশ করতে পারে কিনা চেষ্টা করে দেখবে। যদি সব ঠিকঠাক চলে, তাহলে আগামী রথদৌড়ে আমার রথ চালাবে সে।'

বালথ্যাসার বেন-হারের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'আমার সঙ্গে যাতে দেখা হয় সেজন্যে নিশ্চয়ই ঈশ্বর আপনাকে আজ ফোয়ারার কাছে পাঠিয়েছিলেন।'

শেখ ইলডেরিমকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিকেলে ফোয়ারার কাছে বেন-হার কিভাবে তাঁকে বাঁচিয়েছে বললেন বৃদ্ধ মিশরীয়। শুনে খুবই খুশি হলেন শেখ। বেন-হারের খাতির যত্ন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। খাবার দেয়া হয়েছে মেঝেতে গালিচা বিছিয়ে। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল ওরা। শেখের ইশারায় স্থির

দাঁড়িয়ে থাকল ভৃত্যের দল। প্রার্থনা শুরু করলেন বালথ্যাসার। আবেগে গলা মৃদু মৃদু কাঁপছে তাঁর।

'সবার পিতা– ঈশ্বর! আজ আমরা যা পেয়েছি সবই তোমার। আমাদের ধন্যবাদ নাও এবং আমাদের আশীর্বাদ করো, যাতে আমরা তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে যেতে পারি।'

তিনজনই ক্ষুধার্ত। নিঃশব্দে খাওয়াদাওয়া চলছে।

হঠাৎ করেই চারপাশ আঁধার হয়ে সন্ধ্যা নামল। ভৃত্যরা পেতলের চারটে মোমদানী এনে টেবিলের চারকোনায় রাখল। মোমের হলুদ মোলায়েম আলোয় খাওয়ার পালা চুকিয়ে নিল ওরা। মরুদ্যানের সন্ধ্যা। চমৎকার পরিবেশ। গল্পগুজবে সময় কাটাতে মন চায়। বসল ওরা আয়েশ করে।

এমন একটা কাহিনী ইলডেরিম বললেন যে মনে মনে উত্তেজিত হয়ে উঠল বেন-হার। ওর ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ পাল্টে গেল।

অনেক বছর আগে শেখ ইলডেরিমের আস্তানায়, মরুভূমিতে এসেছিলেন তিনজন লোক। তাঁদের একজন ছিলেন বালথ্যাসার, একজন ছিলেন গ্রীক এবং অপরজন হিন্দু। সাদা রঙের বিশাল উটে চড়ে তাঁরা এসেছিলেন। এতবড় উট ইলডেরিম আগে কখনও দেখেননি। লোক তিনজনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তিনি, তাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরদিন তাঁরা ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনায় বসলেন। তাঁরা যেভাবে প্রার্থনা করলেন তেমনটা শেখ ইলডেরিম আগে কখনও দেখেননি কোথাও। প্রার্থনা করা হচ্ছিল ঈশ্বর এবং তাঁর পয়গম্বরের উদ্দেশ্যে। তাঁরা শেখ ইলডেরিমকে বললেন, তাঁরা প্রত্যেকেই উজ্জ্বল একটি নক্ষত্র দেখেছেন। শুনেছেন দৈববাণী। তাঁদের জেরুজালেমে গিয়ে ইহুদীদের শিশু রাজাকে খুঁজে খবর করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। জেরুজালেম থেকে একটি নক্ষত্র তাঁদের বেথলেহেমে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁরা এক পাহাড়ের গুহায় সদ্যজাত রাজার দেখা পান। সেই দেবশিশুকে মহামূল্য উপহার সামগ্রী দিয়ে তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হন রাজা হারোদের ভয়ে। হারোদ তাঁদের ধরতে পারলে খুন করে ফেলত। তিনজনই ফিরে এসে ইলডেরিমের আশ্রয়ে এক বছর লুকিয়ে থাকেন, তারপর যে যার নিজের পথে চলে যান।

উৎসুক হয়ে কাহিনীটা শুনল বেন-হার। ভেতরে ভেতরে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল ও। শৈশব থেকেই ও মাসিহার কথা শুনে আসছে। প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তিনি আসবেন। ইহুদীদের রোমান দাসত্ব থেকে মুক্ত করবেন। বিশ্বজয়ে তাদের নেতৃত্ব দেবেন। নিশ্চয়ই বালথ্যাসার যে শিশুকে খুঁজে পেয়েছিলেন তিনিই সেই মহাপুরুষ। এই নতুন নেতার কি যুদ্ধজয়ে লড়াকু মানুষের প্রয়োজন পড়বে না?

'কোথায় গেলে আমাদের রাজাকে পাব?' বালথ্যাসারের কাছে জানতে চাইল বেন-হার।

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'আমি যদি জানতাম,' বললেন তিনি, 'আমি এখনই তাঁর কাছে চলে যেতাম।'

'তাহলে নিশ্চয়ই তাঁকে আপনি খুঁজে দেখেছেন?' জানতে চাইল বেন-হার।

'একটা ব্যাপার আপনার জানা থাকা দরকার,' জবাব দিলেন মিশরীয়, 'হারোদ যখন জানল আমরা কেন বেথলেহেমে গেছি, সেখানকার সব শিশুকে হত্যা করে সে। ধরেই নেয়া হয় যে সেই শিশুও মারা গেছেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তিনি বেঁচে আছেন। যে কাজে তাঁকে পাঠানো হয়েছে সেটা শিশুর নয়, পুরুষের কাজ। আমাদের মতই তাঁকেও বড় হয়ে উঠতে হবে। সেজন্যে সময় দরকার। কোথাও না কোথাও আছেন তিনি। আমি মরার আগে তাঁকে খুঁজে বের করতে এসেছি। এখন তিনি যুবা, এখন থেকেই তাঁকে কাজ শুরু করতে হবে। তিনি জুডিয়ার কাছাকাছি কোথাও আছেন। আজ তিনিও সূর্যাস্ত দেখেছেন, নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন আরেকটা দিন কাছে এগিয়ে এল যেদিন তিনিই হবেন দুনিয়ার আলো।'

দীর্ঘ নীরবতা নামল তাঁবুতে। বালথ্যাসার ধরে নিলেন আলাপচারিতা শেষ হয়েছে। তিনি বললেন, 'আগামী কাল বা পরশু আমি একবার শহরে যাব, আমার মেয়ে খেলার উদযোগ দেখতে আগ্রহী। এবার বিদায় নিতে হয়। আপনাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। শুভরাত্রি।'

উঠে দাঁড়ালেন সবাই। পেছন থেকে বালথ্যাসারকে চলে যেতে দেখল বেন-হার আর শেখ ইলডেরিম। খানিক পরে বেন-হারকে ভৃত্যরা অতিথির তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

রাত হয়েছে। আকাশে জ্বলছে অজস্র নক্ষত্র। চারপাশ নীরব নিঝুম। থেকে থেকে বইছে শীতল স্নিগ্ধ হাওয়া। শান্ত পরিবেশ, কিন্তু অশান্ত হয়ে উঠেছে বেন-হারের মন। ভাবছে সে ভবিষ্যতের কথা।

ইহুদীদের রাজার জন্ম হয়েছে। তিনি সবাইকে রক্ষা করবেন। তারমানে তাঁকে এমন একজন যোদ্ধা হতে হবে যাঁর ক্ষমতার কাছে রোমানদের হার হয়ে যাবে, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে রোমান সাম্রাজ্য। খুব শিগগিরই ভয়াবহ সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হবে। অনেক অস্ত্র আর লোকবল প্রয়োজন। ইসরায়েলে গিয়ে সে নিজে উপদলগুলোকে যুদ্ধবিদ্যা শেখাবে, অস্ত্রসজ্জিত করে তুলবে। সবাইকে প্রস্তুত রাখবে যাতে বিজয়ের মহান দিনে কেউ থমকে না দাঁড়ায়।

ঘুমাবার আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল বেন-হার। মেসালার ওপর প্রতিশোধ নিয়েই সে জেরুজালেমে যাবে, মা আর তিয়েরজাহ্‌কে খুঁজে বের করবে, তৈরি হতে শুরু করবে যোদ্ধা রাজার হয়ে লড়ার জন্যে।

দশ

পরদিন সকালে নাস্তা সেরে শেখ ইলডেরিমের তাঁবুতে গেল বেন-হার। সাদা একটা টিউনিক পরেছে আজ ও।

শেখ বসে আছেন তাঁর ডিভানে। 'এখনই ঘোড়াগুলোকে সাজ পরাতে বলছি।' বেন-হারকে দেখে বললেন তিনি। 'আপনি বসুন।'

'আমি আসলে নিজের মত করে ওদের চিনতে চাই,' বলল বেন-হার। 'ভৃত্যদের ঘোড়ার সাজ নিয়ে আসতে বলুন, তবে আজ আমি রথ ব্যবহার করব না। তার বদলে যদি থাকে, আমাকে জিন ছাড়া দ্রুতগামী একটা ঘোড়া দিন।'

কৌতূহলী হয়ে উঠলেন শেখ ইলডেরিম। ভৃত্যকে ডেকে বললেন, 'ঘোড়া চারটের সাজ নিয়ে এসো। আর সাইরিয়াসের জন্যে লাগাম আনবে।'

উঠে দাঁড়ালেন শেখ। বেন-হারকে বললেন, 'গত কুড়িবছর ধরে সাইরিয়াস আমার সঙ্গী– যুদ্ধে, বাড়িতে, মরুভূমির ভয়াবহতায়। ও আমার বন্ধু। চলুন, ওকে দেখাই।'

বিশাল তাঁবুটার মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলছে। পর্দা সরিয়ে বেন-হারকে নিয়ে এপাশে এলেন শেখ। বেন-হার দেখল পাঁচটা ঘোড়া গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াগুলোর মধ্যে একটার মাথা অপেক্ষাকৃত ছোট। শেখকে দেখতে পেয়ে খুশিতে হ্রেসাধ্বনি করল সেটা।

ওটার বাদামী চোয়ালে হাত বুলিয়ে আদর করলেন ইলডেরিম। বেন-হারের দিকে ফিরে তাকালেন। 'এই হচ্ছে সাইরিয়াস,' বললেন তিনি। 'বাকি চারটের বাবা।' একে একে নাম বলে গেলেন। 'এ হচ্ছে রিজেল; এ হলো অ্যান্টারেস; ওটা অ্যালটেয়ার আর আপনি যেটার গায়ে হাত বোলাচ্ছেন ও হচ্ছে অ্যালডেব্যারান। অ্যালডেব্যারানের বয়স সবচেয়ে কম।'

'নক্ষত্রের নামে ওদের নাম রেখেছেন, তাই না?' ঘোড়াগুলোকে আদর করার ফাঁকে জানতে চাইল বেন-হার।

'হ্যাঁ। মরুভূমিতে, আমরা আরবরা পথ চলায় নক্ষত্রের ওপর নির্ভর করি। আর সাইরিয়াসের বাছারা নিজেদের গুণেই নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল।'

ঘোড়ার সাজ আসার পর নিজে ওদের সাজ পরাল বেন-হার। তাঁবু থেকে বের করে এনে লাগাম আটকাল। এরপর সে বলল সাইরিয়াসকে নিয়ে আসতে। সাইরিয়াসের খালি পিঠে আরবদের সাবলীলতায় চড়ে বসল সে। বাকি চারটে ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে শেখের উদ্দেশে বলল, 'আমি প্রস্তুত।'

শেখ ইলডেরিমের লোকজন এরইমধ্যে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে লেকের পশ্চিম পাড়ে। সবার মনেই কৌতূহল। উত্তেজনা।

ঘোড়াগুলোকে দৌড় শুরু করাতে কোন অসুবিধা বোধ করল না বেন-হার। ভয় পাচ্ছে না ওরা। নতুন চালকের সঙ্গে অতি দ্রুত সমঝোতা হয়ে গেছে ওদের। রথের বদলে সাইরিয়াসের পিঠে বসে দক্ষ হাতে ঘোড়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে বেন-হার।

প্রথমে ধীর কদমে ওগুলোকে সে সোজা ছোটাল। তারপর বাড়াল গতি। এখন বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে ছুটছে। তাড়া দিল বেন-হার। উড়ে চলল যেন আরবী ঘোড়া। হঠাৎ হঠাৎ বাঁক নিল, একবারের জন্যেও বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল

না। ঘণ্টাখানেক পর শেখ ইলডেরিমের সামনে এসে ওগুলোকে থামাল সে। বলল, 'কাজ হয়ে গেছে, এখন আমাদের দরকার অনুশীলন।' সাইরিয়াসের পিঠ থেকে নেমে ঘোড়া চারটের কাছে গিয়ে ওগুলোর শ্বাস পরীক্ষা করল বেন-হার। খুশি হয়ে বলল, 'শুরুর সময় যেমন ছিল, এখনও ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক তেমনি স্বাভাবিক কাছে। কোন সন্দেহ নেই, আমরাই জিতব।'

ভৃত্যদের পানি আনতে বললেন শেখ ইলডেরিম। নিজ হাতে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াল বেন-হার।

আরেকবার সাইরিয়াসের পিঠে চড়ল সে। এবারও ধীরে ধীরে গতি বাড়াল। একসময় ছুটতে শুরু করল পূর্ণগতিতে। রোদ পড়া আয়নার মত দক্ষতার ঝিলিক দেখাচ্ছে বেন-হার। শক্তিশালী ঘোড়াগুলো যেন নতুন উদ্যম ফিরে পেয়েছে। দ্রুত, অবলীলায় বিপজ্জনক বাঁক নিচ্ছে ওগুলো। উৎসব শুরু হয়ে গেল মরুদ্যানে। খুশিতে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে উল্লসিত আরবরা।

ঘোড়দৌড়ের মাঝেই মাল্লুচ এসে হাজির হলো। প্রথমেই শেখের কাছে গেল সে। বলল, 'সিমোনাইড্‌সের চিঠি এনেছি। তিনি অনুরোধ করেছেন আপনি যাতে দেরি না করে চিঠিটা পড়েন।'

চিঠির সিলমোহর ভেঙে পড়তে শুরু করলেন শেখ ইলডেরিম।

সিমোনাইড্‌সের কাছ থেকে শেখ ইলডেরিমের জন্যে

প্রিয় বন্ধু,

আপনার সঙ্গে একজন যুবক আছে। সে এরিয়াসের ছেলে বলে নিজের পরিচয় দেয়। আসলেও তাই; এরিয়াস তার পালক বাবা। যুবক আমার স্নেহের পাত্র। অবাক করা ঘটনা আছে ওর জীবনে। আজ বা আগামী কাল আপনি সময় করে যদি অ্যান্টিয়োকে আসেন শোনাতে পারি সে-ঘটনা। ইতিমধ্যে যুবকের জন্যে যথাসাধ্য করবেন। কোন দেনা-পাওনার উদ্ভব হলে আমি জামিন থাকলাম।

এবার আসি আপনার প্রসঙ্গে।

আজ কনসাল ম্যাক্সেনটিয়াস অ্যান্টিয়োকে আসবে। চরের মাধ্যমে জানতে পারলাম সে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষমতা এবং অনুমতি নিয়ে এসেছে। আপনার সম্পত্তি সে বাজেয়াপ্ত করতে পারে। সুতরাং সাবধানে থাকবেন। সতর্ক নজর রাখবেন।

দক্ষিণের রাস্তাগুলোয় আপনার বিশ্বস্ত যেক'জন অনুচর আছে তাদের সতর্ক করে দেবেন। বলবেন যাতে তারা ওই পথের যাত্রীদের তল্লাশী করে। কারও কাছে আপনার সম্পর্কিত চিঠিপত্র পাওয়া গেলে ব্যক্তিগতভাবে পড়ে দেখবেন। মনে কোন দ্বিধা রাখবেন না।

আপনার অতিথিদের আমার শুভেচ্ছা দেবেন। বালথ্যাসার আর তাঁর মেয়ে ইরাসকে আমার কথা বলবেন। আপনাদের সবার জন্যে আমি স্টেডিয়ামের টিকেট কেটে রেখেছি।

এই চিঠি পড়ার পর পুড়িয়ে ফেলবেন।

শুভেচ্ছা রইল,
সিমোনাইড্‌স্‌।

আরেকবার পুরোটা চিঠি পড়লেন ইলডেরিম। তারপর ভাঁজ করে বেল্টের ভেতরের অংশে গুঁজে রাখলেন।

আধঘণ্টা পর ঘোড়াগুলো নিয়ে শেখের সামনে থামল বেন-হার। বলল, 'আপনি অনুমতি দিলে এবার ঘোড়াগুলোকে তাঁবুতে নিয়ে যাই। বিকেলে আরেক দফা অনুশীলন করাব।'

'ধরে নিন এগুলো আপনারই ঘোড়া' জবাব দিলেন ইলডেরিম। 'রথ দৌড়ের প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত ওদের আপনার খুশিমত রাখুন। গত দু'ঘণ্টায় আপনি যা দেখিয়েছেন, ওই রোমান গাধাটা দু'সপ্তাহেও তা পারত না। ওই ব্যাটার হাড় থেকে শেয়ালে মাংস খুবলে নিক। আমরা বিজয়ী হব, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমরা নিশ্চয়ই জিতব।' একমুহূর্ত থেমে শেখ বললেন, 'শহরে কাজ আছে, আমি এখন সেখানে যাচ্ছি। আপনি ইচ্ছে করলে ওদেরকে তাঁবুতে নিয়ে যেতে পারেন।'

চলে গেলেন শেখ ইলডেরিম। ঘোড়া নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল বেন-হার। পানি খাওয়ানো এবং দলাইমলাই শেষে ওগুলোকে খানিক আদর করে বাইরে বেরিয়ে এল। মাল্লুচের সঙ্গে খেজুর গাছের ছায়ায় গিয়ে বসল সে। সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'আপনার সাহায্য দরকার আমার।'

'কি ব্যাপারে?' জানতে চাইল মাল্লুচ।

বেন-হার বলল, 'সেলুশিয়ান ব্রিজের পাশে একটা অতিথিশালায় আমার মালপত্র রেখেছি। যদি এনে দিতেন খুব উপকৃত হতাম।' একটু থেমে বলল, 'আরেকটা ব্যাপার, মেসালাকে তার রথের ব্যাপারে খুব গর্বিত দেখেছি। আপনি কি খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন রথটা ভারী না হালকা? রথের ওজন, আকার এবং মাটি থেকে ওটার অ্যাক্সেলের উচ্চতা আমার জানা থাকা জরুরী।'

'আসলে আপনি অক্ষদণ্ডের উচ্চতা জানতে চাইছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, ওটাই আসল।' উঠে দাঁড়াল বেন-হার। 'চলুন তাঁবুতে যাওয়া যাক।

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে শহরে ফিরে গেল মাল্লুচ। ওরা যখন গল্প করছিল তখন একজন আরব মরুদ্যান থেকে রওনা হয়ে গেছে। দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে সে শেখের নির্দেশ নিয়ে। সিমোনাইড্‌সের বার্তা গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন ইলডেরিম।

পরদিন সকালে শহর থেকে ফিরলেন শেখ ইলডেরিম। তিনি ঘোড়া থেকে মাত্র নেমেছেন এমন সময় একজন আরব তাঁর কাছে এগিয়ে এসে একটা চিঠি দিয়ে বলল, 'এই চিঠিটা আপনাকে দেরি না করে পড়তে অনুরোধ করা হয়েছে।'

তাকালেন শেখ চিঠির সিলমোহর ভাঙা। আগে কেউ পড়েছে। চোখ বোলালেন তিনি। খামের গায়ে ঠিকানার জায়গায় লেখা আছে: প্রতি ডায়োনিসিয়াস গ্রেটাস, সিজারিয়া। চিঠি খুলে শেখ অভিশাপ দিলেন। ল্যাটিন ভাষায় লেখা। গ্রীক বা আরবী হলে তিনি পড়তে পারতেন। পুরো পাতায় চোখ বুলিয়ে তিনি শুধু একটা শব্দই বুঝতে পারলেন। মোটা কালিতে স্বাক্ষর করেছে

পত্র লেখক– মেসালা।

'বেন-হার কোথায়? ভৃত্যের কাছে জানতে চাইলেন শেখ।

'ঘোড়াদের ব্যায়াম করাচ্ছে,' বলল লোকটা।

ঘোড়া নিয়ে বেন-হার আসার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন ঠিক করলেন ইলডেরিম। বেন-হার যখন অনুশীলন শেষে এল, শেখকে সে বলল, 'সাইরিয়াসকে আমার আর লাগবে না। এখন থেকে রথ ব্যবহার করব।'

'এত তাড়াতাড়ি?' ইলডেরিম জানতে চাইলেন।

'এমন ঘোড়ার জন্যে একদিনই যথেষ্ট, তবে একটা ব্যাপারে আমি চিন্তিত।'

'কি ব্যাপারে?'

'রথ দৌড়ে রোমানরা খুবই দক্ষ। সবরকম কূট কৌশল জানে। যাতে জিততে পারে সেজন্যে সেসব কৌশল তারা প্রয়োগও করবে। আপনি খেয়াল রাখবেন কোন আগন্তুক যেন ঘোড়াগুলোর ধারেকাছে ঘেঁষতে না পারে। সবচেয়ে ভাল হয় অস্ত্রধারী কেউ একজন যদি প্রতিযোগিতার আগে পর্যন্ত ওগুলোকে পাহারা দেয়।'

বেন-হারকে নিয়ে তাঁবুর দিকে পা বাড়িয়ে চিন্তিত চেহারায় দাড়িতে হাত বোলালেন শেখ ইলডেরিম। 'আজ রাত থেকে প্রহরা বসাব,' বললেন তিনি। ডিভানে বেন-হারকে বসতে ইশারা করে নিজেও বসলেন। বের করলেন মেসালার চিঠি। ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'চিঠিটা ল্যাটিনে লেখা। আপনি তো ল্যাটিন জানেন, দয়া করে একটু পড়ে মানে বুঝিয়ে দিন।'

চিঠিটা পড়তে শুরু করে গম্ভীর হয়ে উঠল বেন-হারের চেহারা।

গ্রেটাসের প্রতি, মেসালা

বন্ধু আমার,

আপনাকে এক আশ্চর্য ঘটনা জানাতে এ চিঠি লেখা।

আপনার কি জেরুজালেমের এক প্রিন্স, বেন-হারের কথা মনে আছে?

বেশ কয়েক বছর আগের ঘটনা। মনে না পড়লে মাথার জখমটার কথা ভাবুন, মনে পড়বে।

আপনাকে হত্যাপ্রচেষ্টার দায়ে তার পরিবারকে বন্দী করা হয়েছিল। সম্পত্তিগুলোও বাজেয়াপ্ত করা হয়। আপনিই ভাল জানবেন অপরাধীর মা-বোনকে নিয়ে কি করেছেন। এখন তাদের খবর জানতে চাওয়ায় আমার যদি অপরাধ হয় ক্ষমা করবেন। আসল অপরাধীকে যাবজ্জীবনের জন্যে যুদ্ধ-জাহাজে দাঁড় বাইতে পাঠানো হয়েছিল। এতদিনে তার মৃত্যু হওয়ার কথা। এতদিন সে-কথা ভেবে আপনি আর আমি তার সম্পত্তি নিজেদের মত করে ভোগ দখল করেছি।

কিন্তু গত রাতে রোম থেকে আসা কয়েকজনের সম্মানে দেয়া এক পার্টিতে মৃত ট্রিবিউন কুইনটাস এরিয়াসের ব্যাপারে অদ্ভুত একটা গল্প শুনলাম। এরিয়াস জলদস্যুদের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত লড়াই করে জয়ী হয়েছিলেন, মনে আছে তো? যুদ্ধে এরিয়াসের জাহাজডুবি হয়; মাত্র দু'জন বাঁচতে পেরেছিল। একজন এরিয়াস অপর জন এক যুবক; পরে সেই যুবককে এরিয়াস পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন

যে জাহাজ তাদের উদ্ধার করে সে জাহাজের অফিসাররা বলেছে যুবকের পরনে ছিল দাসের পোশাক। এই যুবকই সেই বেন-হার যাকে আমরা পাঁচ বছর আগেই মৃত বলে ধরে নিয়েছি। ফিরে এসেছে সে। অর্থ সম্পদ আর উঁচু পদমর্যাদা পেয়েছে। এখন সম্ভবত সে রোমান নাগরিক।

এতসব আমি কিভাবে জানলাম?

গত কাল সৌভাগ্যক্রমে এরিয়াসের সেই রহস্যময় ছেলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই যে সে-ই আমার বাল্যবন্ধু বেন-হার। সে যদি পুরুষমানুষ হয়ে থাকে, নিশ্চয়ই সে এখন আমাদের ওপর শোধ নেয়ার উপায় খুঁজছে!

ইহুদীটা এখন বিশ্বাসঘাতক ইলডেরিমের ডেরায় আছে। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বলছে ইলডেরিমকে জাহাজে তুলে রোমে পাঠিয়ে দিতে। সেটাই বোধহয় উচিত হবে।

আমি এই চিঠির দুটো অনুলিপি করছি। একটা জাহাজে, অন্যটা স্থলপথে পাঠাব, কারণ আপনার জানা জরুরী যে আমাদের পুরানো শত্রু কাছাকাছি এসে হাজির হয়েছে।

আপনার পরামর্শ এবং আদেশের অপেক্ষায় রইলাম। কি করা যায় আমাদের স্থির করতে হবে, কারণ এখন আমাদের নিজেদের জীবন বিপদাপন্ন।

আপনার প্রিয় বন্ধু,

মেসালা

এগারো

বেন-হারের চিঠি পড়া শেষ হতে দু'হাত মুঠো করে শূন্যে ছুঁড়লেন ক্রুদ্ধ শেখ। 'আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'রোমান কুত্তাটা আমাকে রোমে পাঠাতে চায়! ওফ্, শুধু যদি আরেকবার আমার বয়সটা কমে যেত!'

উত্তেজিত হয়ে উঠে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন। হাত দুটো প্রসারিত, আঙুলগুলো বেঁকে যাওয়ায় থাবার মত লাগছে। সাপের চোখের মত জ্বলজ্বল করছে তাঁর দু'চোখ। শক্ত হাতের মুঠোয় বেন-হারের কাঁধ আঁকড়ে ধরলেন তিনি। আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'তোমার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে সেটা আমার ওপর হলে আমি সুস্থির থাকতে পারতাম না। হারের সন্তান রোমানদের খুন করতে পারলে আনন্দিত হতাম। রাতে ঘুম হত না, প্রতিশোধের জন্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করতাম!'

নিষ্পলক চোখে শেখের দিকে চেয়ে রইল বেন-হার। তারপর জিজ্ঞেস করল, এই চিঠি কোথায় পেয়েছেন?'

আমার চর শহরগুলোয় যাতায়াতের পথে নজর রাখছে বললেন

ইলডেরিম। 'বার্তাবাহকের কাছ থেকে তারাই চিঠিটা কেড়ে নিয়েছে।'

'আপনি আমাকে হারের সন্তান বলে সম্বোধন করেছেন। আমার বাবার উপাধি যে হার তা জানলেন কেমন করে?'

'আমি তোমার পরিচয় জানি, খানিক ইতস্তত করে জবাব দিলেন ইলডেরিম। 'আপাতত এ প্রসঙ্গ থাক। আমাকে আবার একবার শহরে যেতে হবে। শহর থেকে ফিরে হয়তো আমরা এব্যাপারে আলাপ করতে পারব। চিঠিটা দাও, আমার যাবার সময় হলো।'

চিঠিটা নিলেন ইলডেরিম। তীক্ষ্ণ, কৌতূহলী দৃষ্টিতে বেন-হারকে দেখলেন। নড়ার কোন লক্ষণ নেই তাঁর আচরণে। বললেন, 'হারের পুত্র, তোমাকে বলেছি তোমার জায়গায় আমি হলে কি করতাম। তুমি তো কোন জবাব দিলে না।'

বেন-হারের দৃষ্টি ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মত ঝলসে উঠল, কিন্তু কথা বলল অস্বাভাবিক শান্ত গলায়। 'শেখ, আমি প্রতিশোধ নেব শপথ করেছি।' বলল সে, 'রোমানদের কাছে শিখেছি যুদ্ধ কৌশল। ওরাই আমার শত্রু। রোমান সাম্রাজ্য আমার যে ক্ষতি করেছে রোমানদের প্রাণের বিনিময়ে সেই ঋণ এখন থেকে শোধ দেবে।'

বেন-হারের কাঁধ চাপড়ে দিলেন ইলডেরিম। 'আমার যা কিছু আছে যুদ্ধের জন্যে তুমি সবই পাবে। শপথ করে বলছি, দশ হাজার সেনা, ঘোড়া, উট– ধরে নাও সব তোমার।' তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তিনি বললেন, 'আমি এখন যাচ্ছি। রাতের আগেই ফিরব বা খবর পাঠাব।'

গম্ভীর বেন-হার অনড় বসে রইল। অনেক ব্যাপারে ভাবছে ও। মেসালার চিঠিটা বিপদের আগাম বার্তা যেমন বয়ে এনেছে, তেমনি ওই চিঠি একই সঙ্গে অপরাধেরও স্বীকারোক্তি। শত্রুর দল যেহেতু চালাক এবং নিজেদের কাজে দক্ষ, বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তাছাড়া ওকে মেসালা এবং গ্রেটাস ভয় পাবে বলেও পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই, যেকোন সময়ে আততায়ী লেলিয়ে দেবে মেসালা। তবে সুযোগ সে-ও পাবে। প্রতিযোগিতার দিন মেসালাকে অন্তত অপদস্থ করার সুযোগ মিলবে। পুবের মানুষের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার এটা একটা সুযোগ। লোকে দেখবে পুবের মানুষও পশ্চিমাদের হারিয়ে দিতে পারে।

দুপুরে খাওয়ার পর রথ পরীক্ষা করতে বেরল বেন-হার। রথের প্রতিটা অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল সে। রোমানদের তৈরি রথের চেয়ে গ্রীক ছাঁদে তৈরি এই রথটা অনেক উন্নত। রথের দু'চাকার ব্যবধান অপেক্ষাকৃত বেশি। রোমান রথের চেয়ে একটু নিচু এবং ভারী হলেও ভারসাম্য খুবই ভাল। ওজন নিয়ে চিন্তা নেই, আরবী ঘোড়াগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী আর পরিশ্রমী।

এরপর বেন-হার ঘোড়াগুলোকে বের করে রথের সঙ্গে জুড়ল। বালি মেশানো রুক্ষ মাটিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দৌড় করাল ওগুলোকে। বিকেলে যখন থামল, আত্মবিশ্বাস পুরোপুরি ফিরে এসেছে ওর। বুঝে গেছে কেমন ওর জেতা উচিত।

সন্ধের পর তাঁবুতে বসে শেখ ইলডেরিমের ফেরার অপেক্ষা করতে লাগল

বেন-হার। অনেকক্ষণ পর শেখের বদলে সশব্দে ঘোড়া ছুটিয়ে এল মাল্লুচ। বাইরে থেকে সে চেঁচিয়ে বলল, 'এরিয়াসের পুত্র, আপনাকে শেখ ইলডেরিম শহরে যেতে অনুরোধ করেছেন। তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

কোন প্রশ্ন করল না বেন-হার। ভৃত্যদের কাছ থেকে একটা ঘোড়া চেয়ে নিয়ে মাল্লুচের সঙ্গে অ্যান্টিয়োকের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল। দ্রুত ছুটছে ঘোড়াগুলো। কথা হচ্ছে না ওদের দু'জনের মাঝে।

সিমোনাইড্‌সের গুদামের সামনে ঘোড়া থামাল মাল্লুচ। 'শেখ ইলডেরিম কোথায়?' জানতে চাইল বেন-হার।

'আমার সঙ্গে আসুন,' জবাবে ঘোড়া থেকে নেমে বলল মাল্লুচ। একজন প্রহরী এগিয়ে এসে ওদের ঘোড়া দুটোর দায়িত্ব বুঝে নিল।

গুদামের ছাদে উঠে আরেকবার সিমোনাইড্‌সের ব্যক্তিগত ঘরের সামনে দাঁড়াল বেন-হার। সঙ্গে সঙ্গে পর্দার ওপার থেকে ভেসে এল সিমোনাইড্‌সের কণ্ঠ, 'ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি, আপনি আসুন।'

মাল্লুচ রয়ে গেল পর্দার ওপারে। বেন-হার ভেতরে ঢুকল।

মাত্র তিনজন উপস্থিত আছে ঘরে। সিমোনাইড্‌স, ইসথার আর শেখ ইলডেরিম। সব ক'জন তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। প্রত্যেককে একবার করে দেখল বেন-হার। ও বুঝতে পারল না এরা শত্রু নাকি বন্ধু। তারপর ইসথারের মুখে ওর দৃষ্টি স্থির হলো। মুহূর্তে দ্বিধা দূর হয়ে গেল ওর। মেয়েটার মিষ্টি চেহারায় মায়া এবং আরও বাড়তি কিছু একটা যেন প্রকাশ পাচ্ছে।

'বেন-হার,' বলল সিমোনাইড্‌স, 'আমার বাড়িতে আপনাকে আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

মাথা ঝুঁকিয়ে ছোট্ট বো করল বেন-হার। মুহূর্তের জন্যে রুদ্ধ আবেগের বিস্ফোরণে বলার মত কিছু খুঁজে পেল না।

সিমোনাইড্‌স একটা হাত তুলে মেয়েকে নির্দেশ দিল, 'ইসথার, মনিবকে আসন এনে দাও।'

দ্রুত একটা আসন নিয়ে এল ইসথার। ওর হাত থেকে আলতো করে ওটা নিয়ে বসল বেন-হার সিমোনাইড্‌সের সামনে।

'ইসথার, বাছা, কাগজপত্রগুলো একটু এনে দাও,' সস্নেহে বলল বণিক।

দেয়ালের গোপন একটা খুপরি থেকে কাগজগুলো বের করে বাবাকে দিল ইসথার। সিমোনাইড্‌স কাগজের মোড়ক খুলতে খুলতে বলল, পরস্পরের কাছে আমাদের পরিষ্কার থাকা উচিত। আপনার বাবা আমার কাছে একশো বিশ ট্যালেন্ট রেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই মূলধন আমি ব্যবসায় খাটিয়েছি। এখন মূলধন দাঁড়িয়েছে ছয়শো তিয়াত্তর ট্যালেন্ট। এসবই আপনার– আপনি এখন দুনিয়ার সেরা ধনীদের একজন। বেন-হারের হাতে কাগজপত্রগুলো দিল বৃদ্ধ। 'এই যে, এখানে ব্যবসায়ের সমস্ত হিসাবপত্র আছে।'

আবেগাপ্লুত হয়ে চুপ করে বসে থাকল বেন-হার। খানিক পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাকে তিনি পরিত্যাগ করেননি।

কাগজগুলো আবার সিমোনাইড্‌সের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। বলল, 'এগুলো আপনার কাছেই থাকুক। আমি শুধু আমার বাবার দেয়া একশো কুড়ি ট্যালেন্ট ফেরত নেব। আর, একটা সাহায্য চাই, টাকা যাই লাগুক, আপনি আমার মা আর তিয়েরজাহকে খুঁজে বের করতে আমাকে সাহায্য করবেন।'

সিমোনাইড্‌স্ বেন-হারের সঙ্গে করমর্দন করে বলল, 'আমি চিরকাল আপনার ভৃত্য হয়েই থাকব।'

উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি শুরু করল বেন-হার। চেহারা দেখে মনে হলো খুব চিন্তিত। খানিক পরে হঠাৎ বলল, 'এরিয়াসের সম্পত্তি পাওয়ায় আমি আগেও ধনী ছিলাম ; এখন পেলাম এই বিপুল সম্পদ। কেন? নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য আছে। সাহায্য করুন, সিমোনাইড্‌স্, ভাল-মন্দ বিচার করতে আমাকে সাহায্য করুন।'

খুশি হলো সিমোনাইড্‌স্। 'বেন-হার,' বলল সে, 'সেদিন আপনি আমার ঘর থেকে হতাশ হয়ে চলে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন আপনার অধিকার আমি অস্বীকার করেছি। আসলে তা নয়– মাল্লুচ আপনাকে বলবে।'

'মাল্লুচ!'

হাসল সিমোনাইড্‌স্। বলল, 'আপনাকে দেখামাত্র চিনেছি। দেখতে একেবারেই বাবার মত হয়েছেন আপনি। কিন্তু আমি তখনও জানতাম না আপনি মানুষ হিসেবে কেমন। সুতরাং অনুসরণ করে নজর রাখতে মাল্লুচকে পাঠালাম। কর্তব্য পালন করল সে। ওর দোষ নেই। মাল্লুচই আমার চোখ-কান। আপনার ব্যাপারে ভাল ছাড়া খারাপ কোন খবর সে দেয়নি আমাকে।'

'আমি মাল্লুচের অপরাধ নিচ্ছি না,' আন্তরিক স্বরে বলল বেন-হার। 'আপনি জ্ঞানী ব্যক্তির মতই কাজ করেছেন।'

'আপনারই মত,' বলল বণিক, 'আমিও বিশ্বাস করি এই সম্পদ দানের পেছনে ঈশ্বরের কোন বিশেষ ইচ্ছা কাজ করছে। যে ব্যবসাই আমি ছুঁয়েছি সোনা ফলেছে। অন্যের জাহাজ যে ঝড়ে ডুবে গেছে সেই একই ঝড় আমার জাহাজের ক্ষতি করেনি। কারণটা জানতে নিজেকে আমি বারবার প্রশ্ন করেছি। শেষে বুঝেছি এসবে ঈশ্বরের হাত আছে। ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব পথে ঠিক সময়ে নিশ্চয়ই আমাকে একদিন সব জানাবেন। তারপর এতদিন পর, আজ, আমার বিশ্বাস তাঁর ইশারা আমি বুঝতে পেরেছি।'

বৃদ্ধের কথা আগ্রহভরে শুনছিল বেন-হার, সিমোনাইড্‌স্ তার দিকে তাকাল। বণিকের দু'চোখ অপার্থিব আভায় জ্বলজ্বল করছে। 'আপনি কি মিশরীয় বালথ্যাসারকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ,' বলল বেন-হার। 'তাঁর কাহিনীও শুনেছি।'

'আমিও শুনেছি,' আবার বলতে শুরু করল সিমোনাইড্‌স্ 'তাঁর কথা শুনেই আমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছি। রাজা যখন আসবেন, তিনি হবেন দরিদ্র এবং বাহুবহীন। তাঁর থাকবে না কোন সেনাবাহিনী বা শহর। থাকবে না দুর্গ। অথচ রোম সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে মুছে দিতে হবে। বুঝতে পারছেন, বেন-

হার? আপনি যুবক, যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী, এবং আপনার আর আমার রয়েছে বিপুল সম্পদ। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি আমাদের সুযোগ দিয়েছেন তাঁর কাজ করার।'

চুপ করে শুনল বেন-হার। ওর মনে হলো হঠাৎ করে একটা বন্ধ দরজা খুলে গেছে। আলোয় ভরে উঠছে অন্তর। 'আমি প্রস্তুত,' বলল সে। 'আমার যা কিছু আছে সবই রাজার জন্যে। কিন্তু তিনি আসার আগে পর্যন্ত কি অপেক্ষা করব? নাকি অপেক্ষা করব আমাকে তিনি ডেকে পাঠানোর আগে পর্যন্ত?'

'আমাদের অপেক্ষা করার উপায় নেই,' মেসালার চিঠিটা বের করে বলল সিমোনাইড্স্। 'এই চিঠিই আমাদের জন্যে সঙ্কেত। দেরিতে কাজে নামলে চলবে না। আমরা অপেক্ষায় থাকলে মেসালা আর গ্রেটাস আপনাকে হত্যা করবে। একটিবার ভেবে দেখুন ওরা আমার কি অবস্থা করেছে।'

ভয়াবহ পাশবিক অত্যাচারের স্মৃতি মনে পড়তে থরথর করে কেঁপে উঠল সিমোনাইড্স্। 'এখনই কাজ শুরু করতে হবে,' সামলে নিয়ে খানিক পরে বেন-হারকে বলল সে। 'সমস্ত দায়িত্ব আমি আপনার আর শেখ ইলডেরিমের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। আমি এখানে থেকেই ব্যবসা চালিয়ে যাব। আপনি যাবেন জেরুজালেম হয়ে মরুভূমিতে। ওখানে ইসরায়েলীদের প্রশিক্ষণ দেবেন। গোপন জায়গায় অস্ত্রাগার গড়বেন। মরুভূমিতে ইলডেরিম সবসময় আপনার কাছেপিঠে থাকবেন। তাঁর লোকজন রাস্তাঘাটে নজর রাখবে, কাজেই কোন খবরই আপনার জানতে বাকি থাকবে না। এছাড়াও অন্যান্য সব সহায়তাই ইলডেরিম করবেন। আপনি কি রাজি, বেন-হার?'

শেখের দিকে তাকাল বেন-হার।

'আমার যা কিছু আছে সবই তোমার,' জবাব দিলেন শেখ।

'আমি আপনাদের কথা অনুযায়ীই কাজ করব,' বলল বেন-হার। 'তবে আগে আমি সার্কাসে মেসালার সঙ্গে লড়তে চাই। গ্রেটাসের উত্তর পাওয়ার আগে মেসালা কিছু করে বসবে বলে মনে হয় না। সার্কাসে মেসালাকে মুখোমুখি পাওয়ার বিনিময়ে আমি যেকোন কিছু দিতে রাজি।'

কঠোর হয়ে উঠল বেন-হারের শান্ত চেহারা। চোখ দুটো ধকধক করে জ্বলছে।

বারো

প্রতিযোগিতার আগের দিন বিকেলে শেখ ইলডেরিমের ঘোড়দৌড়ের সমস্ত সরঞ্জাম শহরে নিয়ে আসা হলো। সঙ্গে এল বেন-হার আর শেখ। দু'জনেই উৎফুল্ল, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। নিশ্চিত যে কাল প্রতিযোগিতায় ওরাই বিজয়ী হবে।

পথে মাল্লুচ অপেক্ষা করছিল। দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে। শেখের হাতে একটা কাগজ দিয়ে সে বলল, 'এই যে খেলার সময়সূচী।' শেখ পড়ছেন, মাল্লুচ

তাকাল বেন-হারের দিকে। 'মেসালার রঙ লালচে-সোনালী আর আপনাকে দিয়েছে সাদা। রোমানরা মেসালার পক্ষে চড়া অঙ্কের বাজি ধরেছে,' বলল সে। 'মেসালা নিজে বাজি ধরেছে তার প্রায় সমস্ত সম্পদ। আপনি যদি জেতেন ফতুর হয়ে যাবে লোকটা।'

'ভাল,' বলল বেন-হার 'আমি ওকে ফতুরই করব। অসম্মানিত হবে মেসালা।'

'আরেকটা ব্যাপার,' নিচু গলায় বলল মাল্লুচ, 'নিজে আমি মেসালার রথের কাছে যেতে না পারলেও একজন লোক রথটা মেপে দেখে আমাকে বলেছে। আপনারটার তুলনায় তার রথের অ্যাক্সেল এক বিঘৎ উঁচুতে।'

'এতখানি!' খুশিতে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বেন-হার। মাল্লুচের দিকে ঝুঁকে বলল, 'বিজয়ীর দরজার কাছে গ্যালারিতে বসবেন। আমরা যখন বাঁক নেব তখন মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন কেন আমি মেসালার অ্যাক্সেলের মাপ জানতে চেয়েছিলাম।'

'এটা পড়ো,' গম্ভীর চেহারায় বেন-হারের দিকে অনুষ্ঠানসূচী এগিয়ে দিলেন ইলডেরিম।

কাগজে চোখ বোলাল বেন-হার। সমস্ত প্রতিযোগিতার বিবরণ লেখা আছে ওতে। দৌড়, কুস্তি লাফ, মুষ্টিযুদ্ধ পড়েও পড়ল না বেন-হার, ওর চোখ আটকে গেল শেষ প্রতিযোগিতা– রথদৌড়ে। ছ'জনের নাম লেখা আছে কাগজে। রোমান মেসালা, একজন করিনথিয়ান, একজন এথেনীয়, একজন বাইজানটাইনীয় এবং একজন সিডোনীয়। প্রত্যেকের রথ আর ঘোড়ার বিবরণও আছে। কে কোন পুরস্কার জিতেছে তা-ও বাদ যায়নি। সবশেষের নামটা ওর। লেখাটা পড়ে বেন-হার বুঝতে পারল কেন শেখ বিস্মিত হয়েছেন।

'ছয় নম্বর,' পড়ল বেন-হার। 'মরুভূমির শেখ ইলডেরিমের চারটি বে ঘোড়া। প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতন অংশগ্রহণ। চালক, ইহুদী বেন-হার। রঙ, সাদা।

বেন-হার, একজন ইহুদী চালক, কেন লিখেছে? কেন এরিয়াসের উপাধি লেখা হয়নি?

শেখ ইলডেরিমের সঙ্গে চোখে চোখে কথা হলো বেন-হারের। দু'জনেই বুঝতে পারল কারণটা।

অনুষ্ঠানসূচী এভাবে লেখার পেছনে মেসালার হাত আছে।

তেরো

পরদিন বিকেল তিনটের আগেই রথদৌড় ছাড়া সব ক'টা খেলা শেষ হয়ে গেল মাঠ ঠিকঠাক করার জন্যে শেষ প্রতিযোগিতার আগে বিরতি দেয়া হলো। বালুময় এরিনার চারপাশের গ্যালারিতে জড় হয়েছে দু'লাখ দর্শক। বেঞ্চে বসে তার

চিৎকার-চেঁচামেচি, গল্পগুজব করছে। দিনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, রথদৌড় শুরু হবার অপেক্ষায় আছে।

সিমোনাইড্‌স্ এবং তার সঙ্গীরাও এসে পৌঁছেছে। বিশাল স্টেডিয়ামের উত্তরদিকে নিজেদের সংরক্ষিত আসনে বসেছে তারা। সরাসরি নিচেই এরিনা। সিমোনাইড্‌সকে চারজন ভৃত্য চেয়ার সহ বয়ে এনেছে। তাকে আর শেখ ইলডেরিমকে চিনতে পেরে আশেপাশের কৌতূহলী জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। শুভেচ্ছা জানাল অনেকে; তবে বালথ্যাসার আর বোরখা পরা মহিলা দু'জনকে কেউ চিনতে পারল না। ইরাস আর ইসথারের মুখ দেখা যাচ্ছে না।

এরিনায় কাজ করছে কয়েকজন লোক। চক মাখানো রশি দিয়ে দৌড় আরম্ভের জায়গাটা চিহ্নিত করল তারা।

কয়েক মিনিট পর পোরটা পমপীর সুসজ্জিত পথে প্রবেশ করল ছ'জন লোক। পথের ধারেই উঁচু মঞ্চ মত একটা জায়গায় বসে আছেন রোমান কন্সাল, ম্যাক্সেনটিয়াস। পথের দু'ধারে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট দোকান আকৃতির খুপরি। সবক'টার দরজা বন্ধ। ছ'জন ছয়টা বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। ছ'জন প্রতিযোগীর যাকে যে রঙ বলে দেয়া হয়েছে সে রঙের পোশাক পরেছে তারা। দর্শকরা রঙ দেখে সহজেই বলতে পারবে তার প্রিয় রথী কোন্ খুপরিতে অপেক্ষা করছে।

'মেসালাকে তুমি কখনও দেখেছ?' ইসথারকে জিজ্ঞেস করল বালথ্যাসারের মেয়ে ইরাস।

'না।' জবাব দেয়ার সময় শিউরে উঠল ইসথার।

'দেবতা অ্যাপোলোর মত রূপবান,' বলল ইরাস। মেসালার ভাবনায় চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওর।

মাল্লুচ এসে উপস্থিত হলো। ইলডেরিমকে সে বলল, 'ঘোড়াগুলোকে দেখে এলাম, সব ঠিকঠাক আছে।'

'যদি ওরা হেরে যায়,' বললেন শেখ, 'আমি প্রার্থনা করি সে পরাজয় যেন মেসালার কাছে না হয়।'

কন্সাল যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে তীক্ষ্ণ সুরে ট্রামপেট বেজে উঠল। দর্শকদের হৈ হল্লা থেমে গিয়ে স্টেডিয়ামে নৈঃশব্দ্য নামল। সবার চোখ ছয়টা স্টলের বন্ধ দরজার দিকে।

আরেকবার ট্রামপেট বাজল। প্রহরীরা ছয়টা দরজাই খুলে দিল। মুহূর্তের জন্যে নীরবতা, তারপরই দর্শকরা ভূতগ্রস্ত ঘোড়ার খুর আর রথের শব্দ পেল। নিক্ষিপ্ত তীরের মত বেরিয়ে এল ছয়টা রথ। ওগুলোকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল সবাই, উল্লাসে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল।

'ওই যে ওখানে মেসালাকে দেখো!' খুশিতে ছটফট করে উঠল ইরাস।

'দেখেছি,' নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিল ইসথার। বেগ-হারের দিকে তাকিয়ে আছে।

রথগুলো বেরিয়ে এসেছে, তবে প্রতিযোগিতা এখনও আরম্ভ হয়নি। বেগ

দূরত্বে দেখা যায় চক মাখানো সেই দড়িটা। প্রতিযোগীদের আগে ওই দড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, তারপর শুরু হবে আসল প্রতিযোগিতা। সাতবার ওদের স্টেডিয়াম প্রদক্ষিণ করতে হবে।

দড়িটা রাখা হয়েছে যাতে সবাই একই জায়গা থেকে দৌড় শুরু করতে পারে। তবুও বিশেষ একটা সুবিধা লাভের আশায় প্রথম থেকেই ছুটছে রথীরা। ওরা জানে, ট্র্যাকের ভেতরের দিকে যে থাকতে পারবে, সাত পাক ঘুরতে তাকে অনেক কম দূরত্ব পেরোতে হবে। সবারই লক্ষ্য দড়ির ওই একই জায়গায় আগে পৌঁছনো। উন্মাদের মতন ছুটছে সব ক'জন। যেকোন মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে মারাত্মক দুর্ঘটনা। দর্শকরা উৎফুল্ল। উৎসাহ দিচ্ছে।

বেন-হার ছুটছে ট্র্যাকের বাঁ ধার দিয়ে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আলোর উজ্জ্বলতা আর দর্শকদের কানে তালা লাগানো চিৎকারে হকচকিয়ে গেল সে।

দড়ি কাছে চলে আসতেই মেসালা ছাড়া আর সবাই রথের গতি কমিয়ে আনল। দড়ির সামনে দাঁড়ানো একজন ট্রামপেট বাদক। দু'দিক থেকে দড়ি ধরে রেখেছেন দু'জন জাজ। দড়ি একদম সামনেই। মেসালা ছাড়া আর সবাই প্রায় দাঁড়িয়ে পড়েছে যার যার রথ নিয়ে। হঠাৎ শিঙা বেজে উঠল। হাত থেকে দড়ি ছেড়ে দিলেন জাজ দু'জন। ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল মেসালা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে চলে এল সুবিধাজনক জায়গায়। পাঁচিলের বাঁ দিকে।

মুহূর্তে বেন-হার বুঝে গেল শেষ সময়ে শিঙার ফুৎকার আর জাজ দু'জনের দড়ি ছেড়ে দেয়া পূর্ব পরিকল্পিত। মেসালা যাতে বিজয়ী হয় সেজন্যে কাজটা করেছে তারা। সময়মত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে বলেই তৎক্ষণাৎ গতি বাড়াল বেন-হার। ওর অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেছনে পড়ে গেল। শুধু মেসালা এগিয়ে আছে!

রশি পেরনোর আগে এথেনীয় রথীর সামনের সারির একটা ঘোড়ার গায়ে খোঁচা মেরে গেছে মেসালার রথ। অ্যাক্সেল থেকে বেরিয়ে থাকা বাঘের মুখটা ওটার সামনের পায়ে আঘাত করেছে। ফলে আঁতকে উঠেছে ঘোড়াটা। সঙ্গীদের গায়ে গিয়ে পড়েছে। ভয় পেয়ে পাগলামি শুরু করেছে ছুটন্ত ঘোড়াগুলো। যেকোন সময় রথটা উল্টে পড়তে পারে। শিউরে উঠে দম আটকে ফেলল হাজার হাজার দর্শক।

এথেনীয়কে বেসামাল হতে দেখে বিদ্রূপের হাসি হাসল মেসালা। দ্রুত চলে গেল ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভীত উন্মত্ত ঘোড়াগুলোকে শান্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করল এথেনীয়। দুর্ভাগ্য তার। পারল না। পেছনেই ছিল বাইজানটাইনের রথ। ওটার চাকা এথেনীয়র রথের পেছনদিকে আঘাত করল। ভারসাম্য হারাল হতভাগ্য এথেনীয়। পায়ের তলা থেকে রথ সরে গেল। আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল সে। প্রচণ্ড শব্দে উল্টে গেল তার রথ। ছিটকে নিজের ছুটন্ত ঘোড়াগুলোর খুরের তলায় পড়ল লোকটা। আঘাতে আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল।

শিউরে উঠে চোখের ওপর হাত চাপা দিল ইসখার। আবার যখন চোখ মেলার সাহস ফিরে পেল, দেখল কয়েকজন কর্মী আহত এথেনীয়কে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভাঙা রথ আর ভীত ঘোড়াগুলোকেও মাঠ থেকে সরানো হলো।

বেন-হারকে খুঁজতে শুরু করল ইসথারের দু'চোখ। সারা স্টেডিয়াম ভরা সাধারণ মানুষ বেন-হারের নাম জপছে। এথেনীয় রথের দুর্ঘটনা হবে বুঝতে পেরেই ডানদিকে সরে এসেছিল বেন-হার। ভাঙাচোরা রথটাকে এড়িয়ে যেতে পেরেছে সে, অন্য প্রতিযোগীদের মত সময় নষ্ট করেনি। মেসালার পাশেই ছুটছে ওর আরব ঘোড়া। মাঝে সামান্য ব্যবধান। তবে দৌড়ের মাঠের বাইরের অংশে আছে সে, দ্রুত ছুটলেও বেশি দূরত্ব পেরোতে হচ্ছে বলে এগিয়ে যেতে পারছে না। কাছে চলে এল প্রথম বাঁক।

ধনুকের মত সামনের পথ বেঁকে গেছে। দ্রুত এই বাঁক পেরনো যেকোন রথীর জন্যে মস্ত বড় দক্ষতার পরীক্ষা। পাশাপাশি ছুটছে বেন-হার আর মেসালা। রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে দর্শকরা। চারপাশ নিস্তব্ধ। শুধু শোনা যাচ্ছে রথ ছোটার ঘড়ঘড় আর অশ্বখুরের শব্দ। লোকজন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে ঘোড়াগুলো।

বাঁকের কাছাকাছি এসে বেন-হারকে দেখতে পেল মেসালা। চিনে ফেলল। মুহূর্তে যেন শয়তান ভর করল মেসালার মাথায়। চেঁচিয়ে গালি দিল সে। কেউ কখনও যা করে না তা-ই করে বসল। সাঁই করে চাবুক মারল সে বেন-হারের আরবী ঘোড়ার পিঠে।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সব ক'জন দর্শক। মুহূর্তের জন্যে থমথমে নীরবতা নামল গোটা স্টেডিয়ামে। তারপর চেঁচিয়ে উপহাস করল হাজার হাজার লোক।

ভয় পেয়ে উল্কার গতিতে ছুটতে শুরু করল আরবী ঘোড়াগুলো। চাবুকের নিষ্ঠুর আঘাত আর দর্শকের চিৎকারে দিশে হারিয়ে ফেলেছে ওগুলো, বিপজ্জনক দ্রুততায় তীক্ষ্ণ বাঁকের দিকে দৌড়াচ্ছে। রথের এক দিকের চাকা মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে গেল। যেকোন সময় উল্টে যেতে পারে।

এত বিপদেও বেন-হারের মুখে উত্তেজনার ছাপ নেই। দক্ষ হাতে রাস টেনে ধরে ঘোড়াগুলোকে বাগে আনল সে। গতি কমিয়ে বাঁক ঘুরল। লোকজনের চিৎকার থামার আগেই আবার চলে এল মেসালার পাশে। প্রথম চক্কর পূর্ণ করতে দ্রুত ছুটছে।

বেন-হারের দক্ষতা দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল স্টেডিয়াম ভরা দর্শক। উৎসাহ দিচ্ছে তারা। বেন-হারের নাম ধরে চেঁচাচ্ছে। তাদের মনোভাব এতই স্পষ্ট যে অন্তত এই একই কৌশল দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে মেসালাও সাহস পাবে না। বেশিরভাগ দর্শকই যে এখন বেন-হারের পক্ষে বুঝে গেছে সে।

সামনে দিয়ে ছুটে যাবার সময় ক্ষণিকের জন্যে বেন-হারের মুখটা দেখতে পেল ইসথার। চেহারাটা একটু ফ্যাকাসে দেখালেও বেন-হারকে শান্ত আর আত্মবিশ্বাসী দেখে নিশ্চিন্ত হলো সে।

তৃতীয় চক্কর শেষ হলো। এখনও গোলাকার পথের বাঁ ধার ঘেঁষে ছুটছে মেসালা। বেন-হারও পাশেই আছে। বাকিরা অনেক পেছনে। দেখে মনে হচ্ছে একই সঙ্গে দুটো প্রতিযোগিতা চলছে। একটা মেসালা আর বেন-হারের মাঝে,

অন্যটা বাকিদের মধ্যে।

পঞ্চম চক্করের সময় একবার বেন-হারের পাশে চলে এল সিডোনীয় রথী। কয়েকমুহূর্ত পর পিছিয়ে গেল আবার। তার ঘোড়াগুলো এত দ্রুত ছুটতে অভ্যস্ত নয়। হাঁপিয়ে গেছে।

ষষ্ঠ চক্কর শুরু হতেই গতি আরও বাড়াল সবাই। ওরা বুঝে গেছে কিছু একটা করতে হলে এটাই তার শেষ সময়। মনিবদের উত্তেজনা সংক্রমিত হয়েছে ঘোড়াগুলোর মাঝে। গতি বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে ওগুলো।

দর্শকদের চোখ মেসালা আর বেন-হারের ওপর সেঁটে আছে। সবাই জানে আসল প্রতিযোগিতা শুধু এই দু'জনের ভেতর। যে যার পছন্দের রথীকে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে তারা। আকাশ-বাতাস ফেটে পড়ছে 'বেন-হার! বেন-হার! মেসালা! মেসালা!' চিৎকারে।

একটু একটু করে এগিয়ে যেতে লাগল মেসালার রথ। মাথা নিচু করে তীরবেগে ছুটছে তার ঘোড়াগুলো। নাকের পা-টা ফুলে উঠেছে ওগুলোর। চোখ কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কতক্ষণ এই গতি ধরে রাখতে পারবে ওগুলো?

আবার বিপজ্জনক বাঁকের কাছে চলে এল ওরা। দুর্ঘটনা এড়াতে গতি কমাল বেন-হার। পথের ভেতর দিক ধরে মেসালা ছুটছে বলে বাঁক নেয়ায় সুবিধা পেল। পিছিয়ে গেল বেন-হার। আনন্দে চিৎকার করে উঠল রোমান দর্শকরা।

মেসালার পেছনে বেন-হারের রথ। দেখে মনে হলো বড় জোর দ্বিতীয় হতে পারবে সে।

সিমোনাইড্‌স্, শেখ ইলডেরিম, বালথ্যাসার আর ইসথার চোখে উৎকণ্ঠা নিয়ে চেয়ে রইল। হতাশায় মুখ নামাল বণিক। শেখ দাড়িতে হাত বোলানোর ফাঁকে সরু চোখ করে দেখছেন। খেয়াল করে না দেখলে বোঝা যায় না তাঁর চোখ খোলা। দম আটকে রেখেছে ইসথার। শুধু ইরাসকে খুশি খুশি দেখাচ্ছে।

বেন-হারের পথ আটকে রাখার জন্যে পাথুরে দেয়ালের একেবারে গা ঘেঁষে ঘোড়া ছুটিয়েছে মেসালা। একটু ভুলচুক হয়ে গেলেই দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে যাবে তার রথ।

বাঁক ঘুরে চোখের আড়ালে চলে গেল ওরা। আবার যখন দেখা গেল, সিমোনাইডসের হাত আঁকড়ে ধরে উত্তেজিত স্বরে শেখ ইলডেরিম বললেন, 'মেসালা এর চেয়ে বেশি জোরে ছুটতে পারবে না। কিন্তু আমার ঘোড়াগুলো দেখেছেন? একদম তরতাজা! ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকলে আমরাই জিতব। এবার দেখবেন ওদের দৌড়!'

সপ্তম এবং শেষ চক্কর শুরু হলো। রাগে হতাশায় সিডোনীয় চালক হঠাৎ তার ঘোড়াগুলোকে চাবুক মেরে বসল। ক্লান্ত ঘোড়াগুলো খানিকটা এগিয়ে এসেও পিছিয়ে পড়ল আবার। এ প্রতিযোগিতায় জেতা ওদের সাধ্যের বাইরে। একই ভাবে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো বাইজানটাইন আর করিনথিয়ান চালক। রোমান ছাড়া বাকি সবকজন দর্শক গলা ফাটিয়ে বেন-হারকে উৎসাহ দিল।

কেউ বলল, 'বেন-হার! বেন-হার!'

কেউ বা চেঁচাচ্ছে, 'দেয়ালের কাছে সরে এসো! আরও জোরে, আরও জোরে! দেখিয়ে দাও!'

প্রাচীরে পেট ঠেকিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখছে অনেক দর্শক। উন্মত্তের মত হাত ঝাঁকাচ্ছে। গলা ফাটিয়ে ফেলছে, ভাব দেখে মনে হয় তারা চিৎকার করলেই মেসালাকে বেন-হার পেছনে ফেলে দিতে পারবে।

দ্বিতীয় বাঁক পেরোল রথ দুটো। আধচক্কর ঘোরা শেষ, সমান দূরত্ব পেরোলেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়ে যাবে। এখনও বেন-হার মেসালার পেছনে।

তৃতীয় বাঁক নেয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে মেসালা। এগিয়ে আছে সে। ঠোঁটে বিজয়ীর হাসি।

হঠাৎ চাবুক তুলে নিল বেন-হার। বারবার ঝাঁকি খেল ওর হাত। সাপের মত হিসিয়ে উঠল চাবুক। একবারও ঘোড়াগুলোর পিঠ স্পর্শ করল না। বাতাসে শিস কাটছে। ভয় পেয়ে একসঙ্গে গতি বাড়াল চারটে ঘোড়া। মুহূর্তে চলে এল মেসালার পাশে। দর্শকদের চিৎকার শুনে ব্যাপারটা মেসালা টের পেল, কিন্তু দেয়ালের এত কাছ ঘেঁষে ছুটছে বলে তাকানোর সাহস পেল না।

বাঁক ঘুরছে মেসালা। বেন-হার বুঝল এটাই রোমানটাকে পেরিয়ে যাওয়ার শেষ সুযোগ।

দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে দেখছে পাশাপাশি ছুটে চলা রথ দুটোকে। কিন্তু কেউ বুঝল না বেন-হার লাগাম ধরার ভঙ্গি বদল করেছে। বাঁ দিকে একটু চেপে এল ওর রথ। লোহার চোখা অ্যাক্সেল ঢুকে গেল মেসালার রথের চাকার ভেতরে। পটাপট ভেঙে গেল রোমান রথের হাতির দাঁতের স্পোক। অ্যাক্সেলের সঙ্গে চাকার সংযোগ ছুটে যেতেই ডানপাশে কাত হয়ে গেল মেসালার রথ। দুটো চাকাই খুলে গেল।

ঝাঁকি খেয়ে শূন্যে উড়াল দিল মেসালার রথ। ঘোড়াগুলো তখনও ওটাকে টানছে।

মাটিতে পড়ে কয়েকবার ডিগবাজি খেল রথটা। প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এখন আর ওটাকে রথ বলে চেনা যায় না। ঘোড়ার লাগাম মেসালার শরীরে পেঁচানো। ওকে মাটিতে ছেঁচড়ে নিয়েই ছুটল ঘোড়াগুলো। দর্শকরা আতঙ্কে চেঁচাতে লাগল।

বেন-হার আর মেসালার পেছনেই ছিল সিডোনিয়ান রথী। মেসালার দুর্ঘটনা দেখতে পেল সে, কিন্তু থামতে বা সরে যেতে পারল না। ভাঙা রথের ওপর দিয়েই ছুটল সে। মেসালাকে চাপা দিয়ে আতঙ্কিত ঘোড়াগুলোর ওপরে আছড়ে পড়ল। মেসালা ধুলোয় শুয়ে আছে ক্ষত-বিক্ষত দেহে। সেদিকে না তাকিয়ে তালগোল পাকানো চূর্ণবিচূর্ণ রথ থেকে নিজেকে মুক্ত করে কোনমতে সরে দাঁড়াল সিডোনীয় চালক। দ্রুত তাকে পাশ কাটাল করিনথিয়ান আর বাইজানটাইন রথ। দর্শকরা চেয়ে চেয়ে দেখল পর পর দুটো রথের তলায় পিষ্ট হলো মেসালা। পড়ে

রইল অজ্ঞান হয়ে।

বাকিদের অনেক পেছনে ফেলে দৌড় শেষ করল বেন-হারের আরবী ঘোড়া শেষ সীমা পেরিয়ে রথ থামাল বেন-হার।

উল্লাসে আরেক দফা চেঁচাল সাধারণ দর্শকরা। কঙ্কাল উঠে দাঁড়ালেন বিচারক আসন থেকে মই বেয়ে নেমে এলেন। পাতার মুকুট পরিয়ে দিলেন বেন-হারের মাথায়।

সিমোনাইড্‌স যেখানে বসেছে সেদিকে তাকাল বেন-হার। দেখল ওরা সবাই হাত নাড়ছে। ইসথার এখনও বসেই আছে, কিন্তু ইরাস দাঁড়িয়ে, হাসছে ওর দিকে চেয়ে।

ধীরে ধীরে খালি হতে শুরু করেছে স্টেডিয়াম। সবাই জানে আজকের প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে।

চোদ্দ

সিমোনাইড্‌সের বাড়িতে অপেক্ষা করল শেখ ইলডেরিম আর বেন-হার। ঠিক হয়েছে মাঝরাতে ওরা রওয়ানা হবে। শেখের কারাভাঁ বেশ কয়েক ঘণ্টা আগেই রওয়ানা হয়ে গেছে।

খুবই খুশি হয়েছেন শেখ। বেন-হারকে তিনি অজস্র মূল্যবান উপহার দিতে চেয়েছিলেন, কিছুই নেয়নি বেন-হার। বলেছে তার পশ্চিমা শত্রুকে পুবের মানুষের সামনে হেয় করতে পেরেছে, এটাই ওর বড় প্রাপ্তি। আর কিছু দরকার নেই।

ওরা কথা বলছে, দু'জন লোক এল দেখা করতে। আগে ঘরে ঢুকল মাল্লুচ। ঢুকেই বলল এথেনীয় চালক মারা গেছে।'

'আর মেসালা?'

'বেঁচে আছে এখনও। ডাক্তাররা বলছে মেসালা বাঁচবে, কিন্তু কোনদিন আর হাঁটতে চলতে পারবে না।'

আকাশের দিকে মুখ তুলল বেন-হার। ওর চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল। সিমোনাইড্‌সের মত পঙ্গু হয়ে চেয়ারে বসে আছে মেসালা, সবখানে তাকে বয়ে নেয়া হচ্ছে। অসহায় একজন মানুষ, চূর্ণবিচূর্ণ গর্বটুকু ছাড়া যার আজ আর কিছুই নেই।

খুশিতে হেসে উঠলেন ইলডেরিম। দু'হাত ডলতে ডলতে বললেন, 'এবার তাহলে যাওয়া যায়। আমি ঘোড়াগুলোকে প্রস্তুত করতে বলি।'

'একটু অপেক্ষা করুন,' বলল মাল্লুচ। 'বাইরে আরেকজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। ভেতরে পাঠিয়ে দেব?'

'ওহ্‌হো, আমি তো ভুলেই গেছিলাম,' বলে উঠলেন শেখ। 'পাঠিয়ে দাও, পাঠিয়ে দাও তাকে।'

বছর পনেরো বয়সের একটা ছেলেকে নিয়ে ফিরে এল মাল্লুচ। হাঁটু মুড়ে বসে কুর্নিশ করল ছেলেটা। বলল, 'বালথ্যাসারের কন্যা ইরাস বিজয়ী হওয়ায় শেখকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।'

'ওঁর খুব দয়া,' জবাবে বললেন ইলডেরিম।

'তিনি অনুরোধ করেছেন,' বলে চলল ছেলেটা, 'যাতে আপনি বিজয়ী চালককে বলেন যে বাবাকে নিয়ে তিনি কয়েকদিন ইডারনী প্রাসাদে থাকবেন। বেন-হার আগামী কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি খুব খুশি হবেন। তিনি বেন-হারকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।'

বেন-হারের চেহারায় আনন্দের ছাপ দেখলেন শেখ। তবু জানতে চাইলেন, 'যাবে তুমি?'

'তাকে বোলো দুপুরে আমি হাজির থাকব,' জবাবে ছেলেটাকে বলল বেন-হার।

উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। আরেকবার কুর্নিশ করে বেরিয়ে গেল।

মাঝরাতে রওয়ানা হয়ে গেলেন শেখ। বেন-হারের জন্যে একজন পথপ্রদর্শক আর একটা ঘোড়া রেখে গেলেন। এদিকের কাজ চুকিয়ে জেরুজালেমের দিকে রওয়ানা হবে বেন-হার।

পরদিন দুপুরের খানিক আগে ইডারনী প্রাসাদে পৌঁছল বেন-হার। ধূসর পাথরে বিশাল বাড়িটা তৈরি। একেবারে শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে। খুঁজে নিতে অসুবিধা হয়নি ওর।

সদর দরজা দিয়ে ঢুকল সে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে দেখল দু'দুটো দরজা আগে থেকেই খুলে রাখা হয়েছে। দরজাগুলো পেরিয়ে সরু, লম্বা একটা বারান্দা দিয়ে এগোল বেন-হার। প্রতিটা মুহূর্তে আশা করছে কোন ভৃত্য ওর আগমন বার্তা প্রচার করবে। কিন্তু চারপাশে কাউকে দেখা গেল না।

বারান্দার শেষ মাথায় একটা বন্ধ দরজা। বেন-হার এগোতেই ধীরে ধীরে নিঃশব্দে খুলে গেল সেই দরজা। খোলা দরজা দিয়ে বিশাল একটা হলঘর দেখল বেন-হার। হলঘরটা রোমান কায়দায় সাজানো। ঢুকল বেন-হার। মনে মনে প্রাসাদ-মালিকের রুচির প্রশংসা করল। মেঝের মোজাইকে চমৎকার সব ছবি। ঝকঝকে আধুনিক কারুকার্য খচিত চেয়ার-টেবিল সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালের প্যানেলে দুর্লভ চিত্রকর্ম। ছাদটা গম্বুজের মত। চূড়ায় সোনালী খড়খড়ি। ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসছে।

অপেক্ষা করতে লাগল বেন-হার। দেরি হচ্ছে, তবে বিরক্ত নয় সে। অপরূপা ইরাসের জন্যে দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করতেও ওর আপত্তি নেই। তৈরি হয়ে, প্রসাধন শেষে নিশ্চয়ই ইরাস আসবে, না এলে নিশ্চয়ই ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ভৃত্য পাঠাবে!

বেশ কিছুক্ষণ পর অস্থির হয়ে উঠল বেন-হার। একবার একটা পিলারে হেলান দিয়ে খানিক দাঁড়াল, তারপরই আবার পায়চারি শুরু করল। মেঝের ছবিতে মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করল। এখনও আসছে না কেন ইরাস?

মৃত্যুপুরীর মত থমথমে নীরবতা বিরাজ করছে বিশাল এই প্রাসাদে।

'কোন ভুল হয়ে গেল না তো,' ভাবল বেন-হার, 'এটাই কি ইডারনী প্রাসাদ?'

পরমুহূর্তে ওর মনে পড়ল এই প্রাসাদে কাউকে দেখেনি ও। ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তাছাড়া এগোতেই দরজা খুলে গিয়েছিল, যেন কেউ শুধু ওরই জন্যে অধীর অপেক্ষায় আছে। ব্যাপার কি? দরজার দিকে তাকাল বেন-হার। চমকে উঠল। কখন যেন নিঃশব্দে আবার বন্ধ হয়ে গেছে হলঘরের সদর দরজা!

বিপদ আসছে, কে যেন বলল ওর মনের গভীর থেকে। দ্রুত হেঁটে দরজার কাছে পৌঁছল বেন-হার। হাতল ধরে টান দিল। অনড় রইল ভারী দরজা। বাইরে থেকে আটকে দিয়েছে কেউ। খুলল না। শিরায় শিরায় রক্তের গতি দ্রুত হচ্ছে, হঠাৎ টের পেল বেন-হার। ভাবার চেষ্টা করল। অ্যান্টিয়োক শহরে কে ওকে ফাঁদে ফেলতে পারে, কে ওর ক্ষতি চায়?

মন থেকে একটাই জবাব পেল বেন-হার।

মেসালা!

কিন্তু মেসালা পঙ্গু; ক্ষতি করার ক্ষমতা হারিয়েছে! মন থেকে চিন্তাটা জোর করে মুছে ফেলল সে। ঘরে আরও বেশ কয়েকটা দরজা আছে। সবক'টায় টান দিয়ে দেখল। একটাও খুলল না। বাইরে থেকে আটকে দেয়া হয়েছে।

ফাঁদে পড়েছে, বুঝে গেল বেন-হার। তাহলে সে এখন বন্দী!

কিন্তু কার?

আবারও মন থেকে মাত্র একটাই জবাব পেল বেন-হার। মেসালা শত্রুতা করছে আবারও। কাউকে দিয়ে প্রতিশোধ নেয়াতে চায়!

চারপাশটা একবার দেখে নিল বেন-হার। কঠোর চেহারায় বাঁকা হাসি ফুটল।

ঘরে অনেকগুলো মজবুত চেয়ার-টেবিল আছে। প্রয়োজনে পায়াগুলো ভেঙে নিয়ে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে ও।

থমথম করছে প্রাসাদ। হঠাৎ দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল। চমকে উঠে চট করে একটা পিলারের আড়ালে গা ঢাকা দিল বেন-হার। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল।

খুলে গেল কপাট। দু'জন লোক ফিসফিস করে কথা বলছে, শুনতে পেল ও। অবশেষে লোক দু'জনকে দেখতে পেল। দু'জনের চামড়ার রঙ একদম বিপরীত। একজনের রঙ চাপা, অপরজন ধবধবে ফরসা। কিন্তু দু'জনেই শক্তপোক্ত গড়নের। বিশেষ করে ফরসা লোকটার সঙ্গে দানবের তুলনা চলে।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগিয়ে এল লোক দু'জন। দাঁড়াল গম্বুজের চূড়া থেকে আসা আলোর নিচে। পরিষ্কার দেখতে পেল বেন-হার লোকগুলোর চেহারা। আঁতকে উঠল একজনকে চিনতে পেরে। বেতালা হয়ে গেল হৃৎপিণ্ডের গতি। ফরসা রোমান দানব রোমের একজন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা! অজেয়! মুখে কাটাকুটি আর ক্ষতচিহ্নের শেষ নেই, তবে আজ পর্যন্ত একবারও পরাজিত হয়নি লোকটা। ব্যায়ামপুষ্ট পেশী সর্বস্ব শরীরটা দেখার মত।

তার সঙ্গী একজন ইহুদী। বয়স কম হলেও চলনে বলনে বোঝা যায় ভাল প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

আততায়ী দু'জনের পরনে লড়াইয়ের খাটো পোশাক।

ওকে খুন করতেই এরা এসেছে, বুঝে ফেলল বেন-হার। মুহূর্তের জন্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করল, তারপরই মনস্থির করে গা থেকে আলখাল্লা খুলে ফেলল সে। ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক একটানে ছিঁড়ে ফেলে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। শত্রুদের মতই এখন ওর পরনেও আঁটো প্যান্ট।

দু'জনেই একইসঙ্গে ওর দিকে তাকাল। দৈত্যের মত লোকটা বিজাতীয় ভাষায় সঙ্গীকে কি যেন বলল, তারপর দু'জনেই পা বাড়াল বেন-হারের দিকে।

'কি চাও এখানে?' ল্যাটিন ভাষায় ধমকে উঠল বেন-হার। কর্তৃত্বের সুর চিনতে শত্রুদের ভুল হলো না, দশ-বারো ফুট দূরে থমকে দাঁড়াল তারা।

'কে তুমি?' গম্ভীর স্বরে জানতে চাইল দানবের মত লোকটা।

'একজন একাকী রোমান।'

'এমনকি দেবতাদেরও সাধ্য নেই কোন ইহুদীকে রোমান বানাবেন।' ব্যঙ্গের হাসি হাসল দানব। টিটকারিতে ঠোঁট বেঁকে গেল। সঙ্গীকে ইশারা করে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে এগোতে লাগল সে।

'দাঁড়াও!' চেঁচিয়ে বলল বেন-হার। 'আমার কথাটা শোনো।'

আবার থামল ওরা। দানবকে লক্ষ্য করে আঙুল তুলল বেন-হার। 'তুমি তো থর্ড দি নর্থম্যান,' বলল সে, 'রোমে থাকতে আমি তোমার ছাত্র ছিলাম।'

ভ্রূ কোঁচকাল নর্থম্যান। মাথা নেড়ে বলল, 'না, আমি কখনও কোন ইহুদীকে লড়তে শেখাইনি।'

'আমি প্রমাণ দিতে পারি,' বলল বেন-হার।

'কি করে?'

'তুমি আমাকে খুন করতে এখানে এসেছ?'

'হ্যা।' হাসছে নর্থম্যান।

'তোমার সঙ্গীকে একা লড়তে বলো, এখনই আমি হাতেনাতে প্রমাণ দিয়ে দেব।'

কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল দানবের চওড়া মুখে। পায়ের গোড়ালি বাধিয়ে একটা আরামকেদারা কাছে টেনে বসল সে। গম্ভীর স্বরে বলল, 'বেশ, শুরু করো।'

সতর্ক, আত্মবিশ্বাসী প্রতিদ্বন্দ্বীর ওপর চোখ রেখে সামনে বাড়ল বেন-হার। থমথমে শীতল কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল, 'নিজেকে রক্ষা কোরো।'

জবাবে ঝাড়া দিয়ে দু'হাত উঁচিয়ে ঘৃণার হাসি হাসল লোকটা।

বুঝে গেল বেন-হার, এ লড়াই শেষ হবে ওদের একজনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে।

ডান হাত উঠিয়ে ঘুসি মারার ভান করল বেন-হার। মুখ বাঁচাতে বাঁ হাত তুলে গার্ড নিল প্রতিপক্ষ। দ্রুত সামনে বাড়ল বেন-হার। চট করে ধরে ফেলল লোকটার কব্জি। প্রচণ্ড জোরে একটা মোচড় দিয়েই বিদ্যুৎগতিতে গায়ে সেঁটে গেল সে। এক হাতে কাঁধ পেঁচিয়ে নিয়ে গলায় চাপ দিয়ে লোকটার শ্বাস রুদ্ধ করে দিল। একই সঙ্গে গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়ে প্রতিপক্ষকে বাঁ দিকে ঘুরিয়ে

দিল। তারপর বাঁ হাতে কানের নিচে, গলায় বসাল মারাত্মক চপ। দ্বিতীয়বার আঘাত করতে হলো না। বেন-হার সরে দাঁড়াতেই ধপ করে মেঝেতে পড়ল লোকটা। অনড় পড়েই রইল। মারা গেছে।

দানবের দিকে তাকাল বেন-হার। বিস্মিত চেহারায় উঠে দাঁড়িয়েছে থর্ড দি নর্থম্যান। চোখ পিট পিট করে বেন-হারকে কিছুক্ষণ দেখে নিয়ে হঠাৎ হা-হা করে হাসতে শুরু করল সে। খানিক পরে বলল, 'আমিও তোমার চেয়ে ভাল পারতাম না। এটা আমারই কৌশল। দশ বছর ধরে এই কৌশল আমি রোমের স্কুলে শিখিয়েছি। তুমি তো তাহলে ইহুদী নও। কে তুমি?'

'কুইনটাস এরিয়াসকে চিনতে?'

'হ্যাঁ,' থর্ডের ক্ষত-বিক্ষত মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'তাঁর এক ছেলে ছিল। ইচ্ছে করলেই সে ছেলে দুনিয়ার সেরা গ্ল্যাডিয়েটর হতে পারত। তুমি যে কৌশলে এখন লড়লে, ওকে আমি সেই কৌশলই শিখিয়েছিলাম।'

'আমিই এরিয়াসের সেই ছেলে। এখন আর কোন সন্দেহ আছে তোমার?'

এগিয়ে এসে কাছ থেকে বেন-হারকে দেখল থর্ড। চিনতে পারল। পুরানো ছাত্রের দেখা পেয়ে খুশিতে চিকচিক করে উঠল দানবের দু'চোখ। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আর আমাকে সে বলেছিল এখানে একটা ইহুদী থাকবে!'

'কে বলেছিল?' করমর্দন করল বেন-হার।

'মেসালা। গতরাতে বিছানায় শুয়ে গোঙাতে গোঙাতে বলেছে।'

চিন্তিত চেহারায় মাথা ঝাঁকাল বেন-হার।

'আমাকে খুন করতে পারলে তোমাকে সে কত দেবে বলেছে?'

'এক হাজার সেসটারটি।'

'সেটা তো পাবেন, আমার কথা মত কাজ করলে আরও তিন হাজার বাড়তি পাবে।'

ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগল থর্ড। আপনমনে বলল, 'গত কাল আমি পাঁচ হাজার জিতেছি। মেসালা বলেছে এক হাজার দেবে। ছয় হাজার হলো। তুমি আমাকে চার হাজার দিয়ো। যা বলবে তা-ই করব। যদি বলো, মিথ্যেবাদী মেসালাকে খুন করে ফেলব। বেশি কিছু না, এই হাতটা ওর মুখের ওপর রাখলেই মরে যাবে হারামজাদা!'

'দশ হাজার সেসটারটি নিয়ে রোমে ফিরে তুমি মদের দোকান দিতে পারবে,' বলল বেন-হার। 'গ্রেট সার্কাসের কাছেই দোকানের জায়গা পাবে।'

মাথা ঝাঁকাল থর্ড। নিজের দোকানের কথা ভাবতে গিয়ে মুখ-চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'বেশ, চার হাজারই দেব,' বলল বেন-হার। আঙুল তুলে মেঝেয় পড়ে থাকা মৃতদেহটা দেখাল। হাসি মুখে জানতে চাইল, 'তোমার সঙ্গী প্রায় আমারই মত দেখতে, তাই না?'

মাথা দোলাল থর্ড। 'দেখে মনে হয় একই গাছের দুটো আপেল।'

'আমি যদি ওর সঙ্গে পোশাক পাল্টে নিয়ে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যাই? লাশটা

এখানেই থাকুক। কেউ টের পাবে না, মেসালা তোমার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবে, তাই না? তোমার শুধু মেসালাকে বোঝাতে হবে যে আমি মরে গেছি।'

হাসতে হাসতে পানি বেরিয়ে গেল থর্ডের চোখ থেকে। বলল সে, 'বেশ, তোমার কথানুযায়ী কাজ চালিয়ে নেব।'

আরেকবার দু'জন করমর্দন করল। মৃতদেহের সঙ্গে পোশাক বদলে নিল বেন-হার। আলোচনা করে ঠিক হলো সেই রাতেই একজন দূত থর্ড যে সরাইখানায় উঠেছে সেখানে চারহাজার সেসটারটি পৌঁছে দেবে।

বেন-হার তৈরি হয়ে নিতেই দরজায় টোকা দিল দানব। খুলে গেল দরজা। থর্ডের পাশে হাঁটতে হাঁটতে একবার মৃত মুষ্টিযোদ্ধাকে দেখল বেন-হার। ইহুদীর পোশাক পরা লোকটার সঙ্গে ওর চেহারা, আকার আকৃতিতে অনেক মিল আছে। থর্ড যদি ঠিক মত মিথ্যে বলতে পারে, কেউ কোনদিন প্রতারণাটুকু টের পাবে না।

সেরাতে ইডারনী প্রাসাদের সমস্ত ঘটনা সিমোনাইডসকে খুলে বলল বেন-হার। পরবর্তী কর্তব্য জানাল। একমত হলো বণিক। বলল, কয়েকদিন পর রহস্যময় ভাবে নিখোঁজ হওয়া এরিয়াসের ছেলেকে খুঁজতে শুরু করবে সে। তথ্য জানতে চাইবে। কেউ যদি কিছু জানাতে না পারে, তাহলে ধরে নেয়া যাবে যে মেসালা আর গ্রেটাসও বিশ্বাস করে মারা গেছে বেন-হার। সেক্ষেত্রে নিরাপদে জেরুজালেমে ফিরতে পারবে বেন-হার। মা-বোনকে খুঁজতে পারবে।

তখন মাঝরাত। এক আরব পথপ্রদর্শকের সঙ্গে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চেপে রওয়ানা হয়ে গেল বেন-হার।

প্রাসাদে পড়ে থাকা মৃতদেহটিকে কবর দেয়ার ব্যবস্থা করে গ্রেটাসের কাছে বার্তাবাহক পাঠাল মেসালা। বেন-হারের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে ছুটল লোকটা।

কয়েকমাস পরে রোমের ম্যাক্সিমাস সার্কাসের কাছেই নতুন একটা মদের দোকান খোলা হলো। দোকানের দরজার ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা:

থর্ড দি নর্থম্যান

পনেরো

বেন-হার অ্যান্টিয়োক ছাড়ার ঠিক একমাস পর ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাসকে জুডিয়ার গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করা হলো। তাঁর জায়গায় গভর্নর হলেন পনটিয়াস পাইলেট।

এসেই নতুন গভর্নর হিসেবে সুনাম অর্জন করার আশায় তিনি বেশ কিছু

আদেশ জারি করলেন। একটা আদেশ ছিল জুডিয়া কারাগার পরিদর্শন এবং বন্দীদের নামের তালিকা সংগ্রহ সংক্রান্ত। সে আদেশ রোমান সেনাদের দুর্গ, টাওয়ার অব অ্যান্টোনিয়াতেও পৌঁছল। টাওয়ার অব অ্যান্টোনিয়ার কারাগার মাটির তলায়। সেখানে শুধু বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন বিপজ্জনক কয়েদীদের রাখা হয়।

নির্দেশ পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে বন্দীদের তালিকা দুর্গের অধিনায়ক, ট্রিবিউনের দপ্তরে চলে এল। গভর্নরের কাছে পাঠানোর আগে ট্রিবিউন তালিকায় চোখ বোলাচ্ছেন, এমন সময় চাবির ভারী গোছা হাতে একজন কারারক্ষী দপ্তরে প্রবেশ করল। চাবি নেড়ে ঝন ঝন শব্দ করে ট্রিবিউনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে।

মুখ তুললেন ট্রিবিউন। লোকটাকে দেখে বললেন, 'ওহ্, জেসিয়াস! এসো।'

চিন্তিত চেহারায় এগিয়ে এল কারারক্ষী। দ্বিধান্বিত সুরে বলল, 'স্যার, একটা ব্যাপার আপনাকে জানানো খুব জরুরী।'

'বলে ফেলো তাহলে,' তাড়া দিলেন ট্রিবিউন।

'মানে, স্যার, ব্যাপারটা হলো– আট বছর আগে এ শহরের রাস্তায় ছোটখাটো একটা দাঙ্গা মত হয়েছিল। গ্রেটাসকে মাথায় আঘাত করে মেরে ফেলতে চেয়েছিল একজন ইহুদী। সেটা নিয়ে খানিকটা গোলমাল হয়। এর এক সপ্তাহ পরে গ্রেটাস আমাকে এই টাওয়ার অব অ্যান্টোনিয়ার কারারক্ষী পদে নিয়োগ দেন। আমাকে ডেকে নিয়ে তিনি এই চাবিগুলো দিয়েছিলেন।' হাতের চাবির গোছা দেখাল সে। 'আপনি যেখানে বসেছেন, সেদিন তিনি ঠিক সেখানেই বসে ছিলেন। তাঁর সামনে টেবিলে বিছানো ছিল পাতাল কারাগারের মানচিত্র। তিনি সেটা দেখিয়ে আমাকে বলেছিলেন, "জেসিয়াস, দেখো, এটা পাতাল কারাগারের সবচেয়ে নিচের তলার নকশা। এখানের এই কামরাটা দেখেছ– পাঁচ নম্বরটা? এটায় তিনজন বন্দী আছে। তারা রাষ্ট্রের গোপন তথ্য জেনে ফেলেছিল, এখন অতি কৌতূহলের প্রায়শ্চিত্ত করছে। মানুষগুলো অন্ধ-বোবা। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাদের এই কারাগারেই কাটাতে হবে। খাদ্য আর পানীয় ছাড়া অন্য কোন কিছু তাদের যেন দেয়া না হয়। দেয়ালে একটা ছোট গর্ত দেখতে পাবে, সেখান দিয়েই যতটুকু যা দেবার দেবে। এবার আসল কথা শোনো, জেসিয়াস," আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন গ্রেটাস, "কখনও কোনদিন এই ঘরের দরজা তুমি খুলবে না।"

' "কিন্তু ওরা যদি মারা যায়?" জানতে চেয়েছিলাম আমি।

'তিনি বলেছিলেন, "তাহলে ওই কামরাই হবে ওদের সমাধি। মরার জন্যেই ওদেরকে ওখানে রাখা হয়েছে। ওই সেলে কুষ্ঠ রোগের জীবাণু আছে, বুঝতে পেরেছ?" এরপর গ্রেটাস আমাকে চলে যেতে বলেন।'

কথা শেষ করে পোশাকের বুক পকেট থেকে দু'টুকরো পার্চমেন্ট বের করল জেসিয়াস। একটা টুকরো টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা স্যার, পাতালের সেই নকশা।'

ঝুঁকে তাকালেন ট্রিবিউন।

পাতাল পথ				
V	IV	III	III	I

'আচ্ছা!' ভুরু কুঁচকে নকশাটা ভালমতন দেখলেন ট্রিবিউন। 'বলে যাও। তোমাকে বলা হয়েছিল ওই কামরায় কুষ্ঠের জীবাণু আছে, তারপর?'

'জ্বি স্যার, উনি তাই বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর নকশায় ভুল ছিল। দেখুন, স্যার, নকশায় মাত্র পাঁচটা কামরা দেখানো হয়েছে। আসলে কিন্তু ঘর আছে ছয়টা।'

বিস্মিত হয়ে মুখ তুললেন ট্রিবিউন। 'ছয়টা?'

'জ্বি, স্যার। আমি সত্যিকার নকশাটা এঁকেছি। এই যে, স্যার।' পার্চমেন্টের দ্বিতীয় টুকরোটা টেবিলে রাখল জেসিয়াস।

পাতাল পথ				
V	IV	III	III	I
VI				

নকশা পরীক্ষা করে দেখলেন ট্রিবিউন। তারপর বললেন, 'ভাল কাজ দেখিয়েছ। কালকে সকালে এসেই আমি নতুন মানচিত্র তৈরি করিয়ে নেব।' লম্বা হাই তুলে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তিনি।

'স্যার, পুরো ঘটনা এখনও আপনাকে বলিনি,' তাড়াতাড়ি করে বলল জেসিয়াস।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন ট্রিবিউন।

'আজ সকালে,' বলতে শুরু করল জেসিয়াস, 'আপনার আদেশ অনুযায়ী সব ক'টা কামরায় আমি নিজে গেছি। গত আট বছরে পাঁচ নম্বর ঘর একবারও খোলা হয়নি, ফাঁক দিয়ে তিনজনের আন্দাজে খাবার আর পানি দেয়া হয়েছে শুধু। গতকাল কৌতূহল দমাতে না পেরে পাঁচ নম্বরের দরজা খুলেছিলাম। জানতে ইচ্ছে হয়েছিল কারা এতগুলো বছর ধরে এই নরকে বাস করছে। ভীষণ পরিশ্রম হয়েছে দরজা খুলতে। তালায় মরচে পড়ে গিয়েছিল, চাবি ঢুকছিল না। সে যাই হোক, অবশেষে আমরা দরজা খুললাম। ভেতরে ঢুকে দেখি মাত্র একজন বন্দী আছে। লোকটা বৃদ্ধ। অন্ধ এবং বোবা। পাখির থাবার মত করে হাত উঁচিয়ে আঙুল বাঁকা করে রেখেছিল সে। লোকটার চামড়ার রঙ এই পার্চমেন্টের মত হলুদ।' টেবিলে রাখা নকশা দেখাল জেসিয়াস। 'আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তার সঙ্গীরা কোথায়। জবাবে শুধু মাথা নাড়ল বৃদ্ধ। পুরো ঘর তল্লাশী করেছি আমরা। বাকিদের চিহ্নমাত্র নেই! হাড়গোড় কঙ্কাল কিছুই পাওয়া যায়নি। স্যার, ওই

কামরায় শুধু ওই বুড়ো লোকটাই আছে!'

কড়া চোখে কারারক্ষীকে একবার দেখে নিলেন ট্রিবিউন। তারপর শুষ্কস্বরে জানতে চাইলেন, 'কি বলতে চাইছ তুমি, গ্রেটাস মিথ্যে কথা বলেছিলেন?'

'তিনি মিথ্যে বলেছিলেন কিনা তা আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন,' জবাব দিল জেসিয়াস। 'সেই বৃদ্ধ আমার হাত ধরে কক্ষের পেছনদিকের দেয়ালের কাছে নিয়ে গেল। দেয়ালের গায়ে ছোট একটা ফোকর দেখতে পেলাম। ওরকম ফোকর দিয়েই আমরা খাবার আর পানি সরবরাহ করি। বৃদ্ধ ফোকরে মুখ রেখে অদ্ভুত একটা শব্দ করল। জবাবে দেয়ালের ওপাশ থেকে আবছা একটা জবাব শুনতে পেলাম। স্যার, বুঝতেই তো পারছেন আমার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। প্রায় চেঁচিয়ে উঠে জানতে চাইলাম, "কে ওখানে?" জবাব এল, "আমি একজন ইসরাইলী মহিলা। সঙ্গে আমার মেয়ে আছে। দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন, দেরি করলে আমরা মারা যাব।" তারপর আমি তাকে আশ্বস্ত করেই পাতালের একটা মানচিত্র এঁকে সরাসরি আপনার কাছে চলে এসেছি, স্যার।'

মানুষ হিসেবে ট্রিবিউন অত্যন্ত দয়ালু এবং সৎ একজন ভদ্রলোক। জেসিয়াসের কথা শুনে আঁতকে উঠলেন তিনি। লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'মহিলা?' বললেন অনুচ্চস্বরে, 'এও কি সম্ভব? তারমানে ভ্যালেরিয়াস গ্রেটাস একটা মিথ্যুক! এসো, জেসিয়াস, ওই মহিলাদের এক্ষুণি উদ্ধার করতে হবে!'

'আমাদের স্যার দেয়াল ভাঙতে হবে,' ট্রিবিউনের সহৃদয় ব্যবহারে খুশি হয়ে বলল জেসিয়াস। 'এক সময় ছয় নম্বর কামরাতেও দরজা ছিল। আমি চিহ্ন দেখেছি। পরে পাথর গেঁথে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'বেশ, যন্ত্রপাতি নিয়ে কয়েকজনকে আসতে বলো,' বললেন ট্রিবিউন। 'তাড়াতাড়ি যাও। আমি এই রহস্যের শেষ দেখে ছাড়ব।'

দশ মিনিট পরে ট্রিবিউন নিজে হামাগুড়ি দিয়ে ষষ্ঠ কক্ষের ফোকরে মুখ রেখে চেঁচালেন, 'আছ কেউ?'

'এই যে এখানে আমরা,' জবাব দিল একটা মহিলা কণ্ঠ। কেমন যেন অস্বাভাবিক সেই বলার ভঙ্গি। শুষ্ক, তীক্ষ্ণ, খানিকটা যেন ধাতব রেশ আছে গলার স্বরে।

'দেয়ালের কাছ থেকে সরে দাঁড়াও,' বললেন ট্রিবিউন। 'দেয়াল ভেঙে দরজা করতে হবে আমাদের।'

সৈন্যদের হাতে ধরা চারটে মশালের আলোয় ঝকঝকে হলুদ আলো চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। অপেক্ষমাণ মজুরদের ইশারা করলেন তিনি। কাজে লেগে গেল মজুরের দল। বদ্ধ কক্ষ ভরে উঠল ধাতব আঘাতের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে।

কয়েক মিনিট পরে প্রবল শব্দে কেঁপে উঠল কারাকক্ষের চারদেয়াল। চুন-সুড়কির বাঁধন খুলে খসে পড়ল একটা পাথর। ভারী হাতুড়ি দিয়ে একের পর এক আঘাত হানছে শ্রমিকের দল। খুলে গেল আরেকটা বড় পাথর। তারপরই ধসে

পড়ল দেয়ালের একটা অংশ, উন্মুক্ত হয়ে গেল ষষ্ঠ কারাকক্ষের দরজা।

'কাছে এসো না! আমাদের কাছে এসো না! কাছে এসো না!' বলে উঠল একটা মহিলা কণ্ঠ।

দু'তিনজন সৈন্য ঘরে ঢুকে পড়েছিল। একজনের হাতে লণ্ঠন। ট্রিবিউন ঢুকবেন বলে অপেক্ষা করছিল তারা। মহিলা সতর্ক করার সুরে কথাগুলো বলায় ছিটকে বেরিয়ে গেল সবাই। থমকে দাঁড়ালেন ট্রিবিউন। মানুষের কণ্ঠস্বর এত বিষাদময় বিপন্ন হতে পারে ভাবেননি তিনি কখনও।

মশালের আলোয় কয়েকফুট দূরে দাঁড়ানো মহিলা দু'জনের মুখ দেখতে পেলেন ট্রিবিউন। আতঙ্কে শিউরে উঠলেন তিনি। অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে এলেন।

বন্দিনী মহিলা দু'জনের চুল, ভ্রূ ধবধবে নয়, ফ্যাকাসে সাদা রঙের। সারা দেহে শ্বেতবর্ণের ক্ষত। কুষ্ঠ রোগের চিহ্ন বহন করছে। রোগের প্রকোপে গলে গেছে ঠোঁটগুলো। গালে দগদগে ঘা। চোখের পাতা খসে গিয়ে মণিগুলো অস্বাভাবিক বড় দেখাচ্ছে। হাতের চামড়া ফেটে জায়গায় জায়গায় মাংস ঝুলছে। জট পাকিয়ে গেছে লম্বা চুলগুলোয়।

'কে...কে তোমরা,' কোন রকমে বললেন ট্রিবিউন। মনের ওপর জোর খাটিয়ে পিছিয়ে যাওয়া রোধ করে বললেন, 'কি অপরাধে তোমাদের আটকে রাখা হয়েছে? কে বন্দী করেছে?'

কাঁপা কাঁপা হাত তুলল দু'জন মহিলার একজন। কর্কশ ফ্যাঁসফেঁসে স্বরে বলল, 'জেরুজালেমে অনেকদিন আগে হার নামের এক প্রিন্স ছিলেন। আমি তাঁর বিধবা পত্নী, এ আমার কন্যা। কেন এখানে আমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, জানেন? কারণ আমরা ধনী ছিলাম। গ্রেটাস বলতে পারবে কতদিন আমরা বিনা বিচারে বন্দী হয়ে আছি। কুষ্ঠ হয়েছে আমাদের। এবার অন্তত দয়া করুন...মুক্তি দিন।'

'তোমাদের মুক্তি দেয়া হবে।' করুণায় ভরে উঠল ট্রিবিউনের হৃদয়। বললেন, 'খাদ্য-পানীয় আর পোশাকও এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

ফুঁপিয়ে উঠলেন মহিলা। ফিসফিস করে বললেন, 'আপনার ওপর স্রষ্টার শান্তি বর্ষিত হোক।'

'আমার সঙ্গে তোমাদের আর দেখা হবে না' বললেন ট্রিবিউন 'আজ রাতেই তোমাদেরকে এই কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হবে। আইন তো তোমরা জানো। নিজেদের ব্যবস্থা তোমাদেরই করে নিতে হবে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন তিনি। তারপর একবারও পেছনে না তাকিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পর কয়েকজন ক্রীতদাস খাবার, পানি আর মহিলাদের জন্যে পোশাক নিয়ে এল। ওগুলো ঘরের মেঝেতে নামিয়ে রেখেই দেরি করল না তারা, দৌড়ে পালিয়ে গেল।

সেদিন রাতেই মহিলা দু'জনকে দুর্গের ফটকের সামনে ছেড়ে দেয়া হলো। তারা মুক্ত। কিন্তু আসলেই কি? কয়েক পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল মহিলা দু'জন।

ঘুরে তাকাল। অনিশ্চিত চোখে পরস্পরকে দেখল।

'দূর হও!' ফটকে প্রহরারত সৈন্য ধমকে উঠল। 'তোমরা তো আইন জানোই!'

হোঁচট খেতে খেতে এগোল তারা। হ্যাঁ, আইন ওদের জানা আছে। কুষ্ঠরুগীকে সবাই মৃত মানুষের সঙ্গে তুলনা করে। শহর থেকে তাদের দূর করে দেয়া হয়। মেলামেশা করতে পারে শুধু অন্যান্য রোগীদের সঙ্গে। কাপড়ে মুখ ঢেকে চলতে হয়। কান্নার সময় কারও মুখ থেকে কাপড় সরে গেলে সবাই আঁতকে ওঠে। 'অপবিত্র! অপবিত্র!' বলে সবাইকে সতর্ক করে পথ ছেড়ে সরে যেতে হয়। শহর থেকে দূরে বনে-জঙ্গলে থাকতে হয়। পরিত্যক্ত বাড়ি বা পুরানো সমাধিতে এই রোগীদের বাস। অদ্ভুত তাদের জীবন, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে সব জ্বালা যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি ঘটে।

আকাশের ঝকঝকে নক্ষত্রগুলোকে মুখ তুলে দেখল দু'জন। সব সেই আট বছর আগের মতই আছে, শুধু বদলে গেছে ওদের জীবন। নিজেকে ওরা প্রশ্ন করল, 'এবার? কোথায় যাব এখন? কোথায় মিলবে আশ্রয়?'

ষোলো

যেরাতে বেন-হারের মা-বোনকে মুক্তি দেয়া হলো সেরাতেই জেরুজালেম শহরে পৌঁছুল বেন-হার।

গত একটা মাস বেন-হার মরুভূমিতে শেখ ইলডেরিমের সঙ্গে কাটিয়েছে। তারপর সেখানে খবর এল গ্রেটাসকে সরিয়ে দিয়ে তার পদে পনটিয়াস পাইলেটকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আর দেরি করেনি, মা-বোনকে খুঁজে বের করতে চলে এসেছে বেন-হার। জেরিকো শহর পর্যন্ত একজন আরব পথপ্রদর্শক ওর সঙ্গে ছিল। তারপর একাই পায়ে হেঁটে এগিয়েছে বেন-হার। ঠিক হয়েছে মাল্লুচ জেরুজালেমে ওর সঙ্গে দেখা করবে।

সিমোনাইডসের কাছ থেকে বেন-হার জেনেছে যে ওদের মিশরীয় ভৃত্যা অ্যামরাহ্ এখনও বেঁচে আছে। এতকাল ধরে অ্যামরাহ্র প্রয়োজন মত সব সবকিছু জোগান দিয়েছে সিমোনাইড্স্। হার প্রাসাদেই লুকিয়ে বসবাস করে অ্যামরাহ্। বহু চেষ্টা করেছে গ্রেটাস প্রাসাদটা বিক্রি করতে, কিন্তু খদ্দেরের অভাবে পারেনি। লোকজন বলে হার প্রাসাদ ভূতুড়ে। কেউ কেউ অ্যামরাহ্কে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ছায়ামূর্তির মত ঘুরতে দেখায় গুজবটা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।

শহরে পৌঁছতে পৌঁছতে বেন-হারের রাত হয়ে গেল। ও ভেবেছিল কোন সরাইখানায় উঠবে, কিন্তু শহরে ঢোকার পর একটিবারের জন্যে হার প্রাসাদ দেখার ইচ্ছে ওর মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। অন্ধকার রাস্তা ধরে প্রাসাদের দিকে এগোল সে। রাত হয়েছে বলে পথে লোক চলাচল কম।

একসময় পৌঁছে গেল সে প্রাসাদের সামনে। উত্তরের ফটকে দাঁড়াল। দেখল একটা ফলকে বড় বড় করে লেখা রয়েছে:

সম্রাটের সম্পত্তি

সেই আগের মত করে দরজায় টোকা দেবে? অ্যামরাহ্ হয়তো শুনতে পাবে, উঁকি দেবে এদিকের কোন জানালা দিয়ে। একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে দরজায় তিনবার ঠুকল বেন-হার। ভোঁতা প্রতিধ্বনি ভেসে এল ভেতর থেকে। আর কোন শব্দ নেই। আবার পাথর ঠুকল বেন-হার। এবার আগের চেয়ে জোরে। জবাব দিল না কেউ। জমাট বাঁধা নীরবতা ওকে যেন উপহাস করছে।

প্রাসাদের পশ্চিম দিকে চলে এল বেন-হার। এদিকে চারটে জানালা আছে। অনেকক্ষণ জানালাগুলোর দিকে চেয়ে থাকল সে। অ্যামরাহ্ যদি প্রাসাদে থেকেও থাকে, কোন জবাব দিচ্ছে না। কোথাও অ্যামরাহ্র উপস্থিতির কোন চিহ্ন মাত্র নেই।

নিঃশব্দ পায়ে হাঁটতে লাগল বেন-হার। দক্ষিণের ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। উত্তরের ফটকের মত এই ফটকেও ঝুলছে সম্রাটের বিজ্ঞপ্তি। 'সম্রাটের সম্পত্তি।' প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কেঁপে উঠল বেন-হার। ফলকটা একটানে পেরেক সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। কান্না আসছে ওর। চাপ চাপ দুঃখ বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে দিচ্ছে। ধপ করে সিঁড়ির ওপর বসল বেন-হার। প্রার্থনা করল যাতে সৈনিক রাজা তাড়াতাড়ি আসেন, যেন চুরমার করে দেন গর্বিত রোমান সাম্রাজ্য।

নিজেও বলতে পারবে না, একসময় কখন যেন সিঁড়ির ওপরেই ঘুমে ঢলে পড়ল ক্লান্ত পরিশ্রান্ত বেন-হার।

বেন-হার ঘুমিয়ে পড়ার অনেক অনেকক্ষণ পরে টাওয়ারের দিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে এল ওর মা আর বোন। চন্দ্রালোকিত রাস্তার ধার দিয়ে পাঁচিল ঘেঁষে হাঁটছে তারা, যাতে কেউ চেহারা দেখতে না পায়। ভীরু পায়ে প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল তারা। বেন-হারের মা তিয়েরজাহ্কে বললেন, 'চুপ! সিঁড়ির ওপর কে যে শুয়ে আছে। ওকে পাশ কাটিয়ে এগোই চল।'

বেন-হারকে পাশ কাটাল তারা। ফটক পেরিয়ে এল। এখনও ঘুমাচ্ছে লোকটা। নড়াচড়া নেই।

'এখানেই দাঁড়া,' বললেন মা। 'আমি দেখি দরজাটা খুলতে পারি কিনা।'

নিঃশব্দে এগিয়ে দরজায় হাত রাখলেন তিনি। ঠিক সেসময় ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরল লোকটা। চাঁদের আলো পড়ল মুখে। নড়াচড়ার শব্দে ঝট করে ঘুরে তাকালেন মা। ছেলেকে চিনতে পারলেন। এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর দৌড়ে তিয়েরজাহ্র কাছে ফিরে এলেন। 'তিয়েরজাহ্,' ফিসফিস করে বললেন তিনি, 'ও তোর ভাই– বেন-হার!'

'বেন-হার!' খুশিতে ফুঁপিয়ে উঠল তিয়েরজাহ্।

'আয়!' বললেন মা, 'আয় একবার ওকে আমরা একসঙ্গে দেখি– মাত্র একবার– তারপর আমাদের চলে যেতে হবে।'

দ্রুত রাস্তা পেরোল দু'জন। নিজেদের ছায়া বেন-হারের ওপর পড়তেই থেমে দাঁড়াল। ঘুমাচ্ছে বেন-হার। একটা হাত ওদের দিকে বাড়ানো। তিয়েরজাহ্ হাঁটু মুড়ে বসে ওই হাতে চুমু খেতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে টেনে সরিয়ে দিলেন মা। অস্ফুট স্বরে বললেন, 'আমরা অপবিত্র, অশুচি!'

মনে পড়ে গেল তিয়েরজাহ্‌র। এত দ্রুত ঝট করে সরে গেল যেন কুষ্ঠ আসলে হয়েছে বেন-হারের। আরেকবার বিষণ্ণ তৃষিত চোখে বেন-হারকে দেখল ওরা। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। রাস্তা পেরিয়ে নিচু একটা দেয়ালের ওপাশে হাঁটু মুড়ে বসল আবার। আরেকটু অপেক্ষা করতে চাইছে দু'জনেই, দু'জনেরই ইচ্ছে শেষ বারের মত বেন-হারকে ভাল করে দেখে নেয়।

রাস্তা ধরে এগিয়ে এল আরেকজন মহিলা। ছোটখাট তার শরীরের গড়ন। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে গেছে। চাঁদের আলোয় মাথা ভরা পাকা চুল চিকচিক করছে। গায়ের রঙ কালো। হাতে একটা সব্জিভরা ঝুড়ি।

বেন-হারকে পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। ছিটকিনি খুলে ঝুড়িটা ভেতরে নামিয়ে রাখল। দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েও কৌতূহলের বশে ঢুকল না। এগিয়ে এল ঘুমন্ত মানুষটার চেহারা দেখতে।

বৃদ্ধাকে বিস্ময়ে চমকে উঠতে দেখল বেন-হারের মা আর বোন। হাঁটু মুড়ে বেন-হারের পাশে বসল বৃদ্ধা। দু'হাতে শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরল।

ঘুম ভেঙে গেল বেন-হারের। চমকে উঠে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইল সে। তারপর বৃদ্ধার ওপর চোখ পড়তেই অবাক হয়ে উঠে বসল। 'অ্যামরাহ্!' কোন মতে বলল বেন-হার, 'এ কি সত্যি তুমি?'

জবাব দিল না বৃদ্ধা। বেন-হারকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলল।

'আমার মা, অ্যামরাহ্– আমার বোন– কোথায় ওরা?'

মাথা নাড়ল অ্যামরাহ্। দু'গাল ভেসে গেল চোখের জলে।

'তুমি তাদের দেখেছ, অ্যামরাহ্। তুমি জানো ওরা কোথায়। একবার শুধু বলো ওরা বাসায় আছে!'

তিয়েরজাহ্ দেয়ালের আড়াল ছেড়ে ছুটে আসতে চাইছিল, কিন্তু মা তাকে ধরে রাখলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'যেতে পারবি না, তিয়েরজাহ্, আমরা যে কুষ্ঠ রোগী!' বুকটা ভেঙে যাচ্ছে তাঁর, কিন্তু কান্না চেপে রাখলেন তিনি। ছোঁয়া যাবে না, ওকে ছোঁয়া যাবে না! চান না বেন-হারও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হোক।

বেন-হার দেখতে পেল দরজার হুড়কো খোলা। 'তুমি কি ভেতরে যাচ্ছিলে?' বেন-হারকে জিজ্ঞেস করতে শুনল ওর মা-বোন। 'চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল বেন-হার। 'ঈশ্বর রোমানদের চিরজীবনের জন্যে অভিশপ্ত করে দিন! মিথ্যে বলেছে রোমানরা! এ প্রাসাদ আমার। ভেতরে চলো।'

প্রাসাদে প্রবেশ করল বেন-হার আর অ্যামরাহ্। অন্ধকার ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওদের চলে যেতে দেখল তিয়েরজাহ্ আর মা। শূন্য দৃষ্টিতে প্রাসাদ ফটকের দিকে

চেয়ে রইল। ওদের জন্যে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে ওই প্রাসাদের সমস্ত ফটক। আর কখনও বাড়ি ফিরবে না ওরা।

কিছুক্ষণ পর নির্জন রাস্তা ধরে অজানা গন্তব্যে পা বাড়াল ওরা। শহর ছেড়ে যাবার আগেই ভোর হলো। লোকজনের চোখে ধরা পড়ে গেল দু'জন। পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওদের বের করে দেয়া হলো শহর থেকে। ক্ষত-বিক্ষত দেহে হাঁটতে লাগল বেন-হারের মা আর বোন।

সতেরো

ইবলিশের টিলা জেরুজালেম শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। কুষ্ঠরোগীরা থাকে ওখানে। টিলাগুলোর মাথায় এবং গায়ে আছে অসংখ্য সমাধি গুহা– রোগীরা ওগুলোতেই বসবাস করে। সাধারণ সুস্থ মানুষ ভুলেও ওদিকে যায় না। মনে করা হয় জায়গাটা অভিশপ্ত।

বেন-হারের সঙ্গে দেখা হওয়ার দু'দিন পরে ভোর বেলায় শহর ছেড়ে বেরিয়ে এল অ্যামরাহ্। এন-রোজেলের কুয়োর সামনে এসে বসল সে। হাতের পানির পাত্র আর খাবার ভরা বাস্কেট পাশে নামিয়ে রাখল। এন-রোজেলের কুয়ো কুষ্ঠরোগীদের টিলার একদম কাছেই। টিলাগুলোর দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেই রইল অ্যামরাহ্। গম্ভীর চেহারায় ভাবতে লাগল বহুদিন আগের কথা, যখন হার প্রাসাদ লোকজনের আসা যাওয়ায় গমগম করত।

গতকাল বিকেলে বেন-হারের জন্যে মধু কিনতে বাজারে গিয়েছিল অ্যামরাহ্। সে-কথা মনে পড়ল ওর। বাজারে ঘুরছিল, এমন সময় একজন লোকের কথা কানে আসে, শোনার জন্যে থেমে পড়ে সে। লোকটা একজন রোমান সেনা। বেন-হারের মা-বোনকে দেয়াল ভেঙে যারা উদ্ধার করেছিল এ লোক তাদেরই একজন। উৎসাহী শ্রোতাদের কাছে সবিস্তারে গল্প করছিল লোকটা, এক পর্যায়ে বন্দিনীদের নামও উল্লেখ করে সে।

ভীষণ খুশি হয়েছিল অ্যামরাহ্। বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে ভেবেছিল মা-বোনের খোঁজ পেলে কতই না খুশি হবে বেন-হার। কিন্তু প্রাসাদে পৌঁছনোর আগেই নিষ্ঠুর সত্যটা উপলব্ধি করতে পেরে স্তব্ধ হয়ে গেল সে। বেন-হার যখন শুনবে ওর মা আর বোন কুষ্ঠ রোগী, মাথা ঠিক থাকবে ওর? ছুটে যেতে চাইবে না ইবলিশের টিলায়? গুহাগুলোয় ঢুকে ঢুকে মা-বোনকে খুঁজবে না? তারপর রোগীদের সংস্পর্শে এসে ওরও যদি কুষ্ঠ হয়? না, ঠিক করেছে অ্যামরাহ্, একথা কিছুতেই বেন-হারকে জানানো যাবে না।

চিন্তা করে করে কর্তব্য স্থির করেছে সে। আজ এন-রোজেল কুয়োর পাড়ে এসে বসে আছে শুধু সেজন্যেই। ও জানে, ভোরবেলায় কুষ্ঠরোগীরা এই কুয়ো থেকে পানি নিতে আসে।

আকাশের গায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সূর্য খানিকটা উঠতেই গুহাগুলো থেকে অনেক রোগী বেরিয়ে এল। ঘুম থেকে যারা দেরিতে উঠেছে গুহার সামনে থেকে পাথরের দরজা সরাতে লাগল তারা। অনেকেই ধীরে ধীরে কুয়োর দিকে এগিয়ে এল। কাঁধে পানির পাত্র বয়ে আনছে মহিলারা। বৃদ্ধরা লাঠি বা ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটছে। পচে গলে গেছে সবার শরীর। সুস্থ মানুষের ঘৃণা অবহেলা অবিচার সহ্য করে কাঁদার জন্যে শুধু হৃদয়টুকুই আজও অক্ষত আছে ওদের।

রোগীর দল একের পর এক এল, প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে ফিরে গেল। চুপ করে বসেই রইল অ্যামরাহ্। পেরিয়ে গেল সুদীর্ঘ একটা ঘণ্টা। তারপর মহিলা দু'জনকে দেখতে পেল সে। টিলার গোড়ার একটা গুহার পাথর সরিয়ে বেরিয়েছে এ দু'জন।

কিছুক্ষণ পাথরের পাশেই দাঁড়িয়ে রইল এরা। তারপর কুয়োর দিকে এগোল। অতি ধীরে হাঁটছে। বোঝা যায় হাঁটতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। রোগিণী দু'জনেরই চুল ধবধবে সাদা। দেখে মনে হয় বয়স একশো বছরের কম হবে না। এদিক ওদিক তাকাতে দেখে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে তারা এখানে নতুন। সঙ্গীদের সাহচার্যে ভয় পাচ্ছে। কিন্তু খেয়াল করল অ্যামরাহ্, দু'জন রোগিণীর পরনেই নতুন পোশাক।

অ্যামরাহ্র হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। পানির পাত্র আর খাবারের ঝুড়ি নিয়ে মহিলা দু'জনের দিকে এগোল সে। যতই এগোল মনে হতে লাগল ভুল করেছে ও। এরা ওর মনিবের মা-বোন নয়!

অ্যামরাহ্ ছ'সাত গজের মধ্যে চলে আসতেই থেমে দাঁড়াল কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত রোগিণী দু'জন। অ্যামরাহও থামল। নিশ্চিত হয়ে গেল বয়সের ভারে নুব্জ হতকুচ্ছিত এই বৃদ্ধারা ওর অপরিচিতা। শিউরে উঠল সে ওদের কাছ থেকে দেখে। চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়ে আপন মনে বলল, 'না, এরা নয়!'

'অ্যামরাহ্!' কুষ্ঠরোগীদের একজন হঠাৎ পেছন থেকে ডেকে বসল।

ঘুরে তাকাল অ্যামরাহ্। হাত থেকে পানির পাত্র আর খাবারের ঝুড়ি পড়ে গেল। কে ডাকল আমায়?' জানতে চাইল সে।

'তুমি যাদের খুঁজছ, আমরাই তারা,' বলল দু'জনের একজন।

ফুঁপিয়ে উঠে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল অ্যামরাহ্, কান্না জড়ানো স্বরে শুধু বলতে পারল, 'আপনি! তিয়েরজাহ্ কোথায়?'

'এই যে আমি। আমায় কি একটু পানি দেবে, অ্যামরাহ্?'

উঠে দাঁড়াল অ্যামরাহ্। ঝুড়িটা নিয়ে এসে তিয়েরজাহ্র সামনে রাখল। ওপরের কাপড়ের ঢাকনি সরিয়ে বলল, 'দেখুন, আপনাদের জন্যে রুটি আর মাংস নিয়ে এসেছি।'

'অনেক ধন্যবাদ, অ্যামরাহ্,' বললেন বেন-হারের মা। পাত্রটায় পানি ভরে এনে দেবে?'

দৌড়ে গিয়ে পানি নিয়ে এল অ্যামরাহ্। কথা বলতে পারছে না, দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

'ধন্যবাদ, অ্যামরাহ্,' বেন-হারের মা আবার বললেন। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

'আর কোন সাহায্য কি আমি করতে পারি না?' বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল অ্যামরাহ্।

খানিক চুপ করে রইলেন বেন-হারের মা, তারপর দৃঢ় স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, সাহায্য করতে পারো। আমি জানি জুডাহ্ বাড়ি ফিরেছে। দু'রাত আগে ওকে আমরা দেখেছি। ওকে তুমি বোলো না আমরা কোথায় আছি। এমনকি আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাও গোপন রাখবে।'

'কিন্তু সে আপনাদের খুঁজছে। আপনাদের খুঁজতেই ফিরে এসেছে।'

'বেন-হার যেন কিছুতেই আমাদের খুঁজে না পায়, বুঝেছ? আমি চাই না ওর অবস্থা আমাদের মত হোক। যদি চাও, আমাদের জন্যে প্রতিদিন তুমি খাবার বা দরকারী জিনিস আনতে পারো।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বেন-হারের মা। কান্না চেপে আবার বললেন, 'জুডাহ্‌র কথা বলো, অ্যামরাহ্। কেমন আছে ও, আগের মতই আছে? ওকে কিন্তু আমাদের কথা বোলো না।'

কাঁদতে লাগল অ্যামরাহ্। কিছু বলার মত ভাষা খুঁজে পেল না।

'এখন যাও, অ্যামরাহ্,' অবশেষে বললেন মা। 'কাল আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। বিদায়।'

ঝুড়ি আর পানির পাত্র নিয়ে ধীর পায়ে হাঁটতে লাগলেন বেন-হারের মা। তিয়েরজাহ্ পাশে পাশে এগোল। পেছন থেকে অশ্রু সজল চোখে নীরবে চেয়ে রইল অ্যামরাহ্। রোগিণীরা গুহায় ঢোকার পর ভগ্ন হৃদয়ে প্রাসাদে ফিরল সে।

এরপর থেকে প্রতিদিন খাবার নিয়ে মালকিনদের পৌঁছে দিতে লাগল অ্যামরাহ্। প্রতিদিনই ভাবে আর কতদিন সে বেন-হারের কাছে সত্য গোপন করতে পারবে।

কয়েকদিন পরে মাল্লুচ জেরুজালেমে এসে পৌঁছল। বেন-হারকে মা-বোনের অনুসন্ধানে সহায়তা করার জন্যে সিমোনাইডস্ পাঠিয়েছে তাকে। টাওয়ার অভ অ্যান্টোনিয়ায় খোঁজ লাগাল মাল্লুচ। দু'হাতে টাকা ছিটিয়ে বেন-হারের মা-বোনের খবর জানল সে। ফিরে এসে গম্ভীর বিষণ্ণ চেহারায় বেন-হারকে বলল সেখানে কি শুনেছে।

সব শুনে অনেকক্ষণ মৃতের মত ফ্যাকাসে মুখে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল বেন-হার। তারপর অস্ফুট স্বরে বলল, 'কুষ্ঠ! মা আর তিয়েরজাহ্ কুষ্ঠরোগী!' উঠে দাঁড়াল সে। 'ওদের খুঁজে বের করতে হবে,' বলল কর্কশ স্বরে, 'হয়তো ওরা মারা যাচ্ছে।'

'কিন্তু তাদের আপনি কোথায় খুঁজতে যাবেন?' জানতে চাইল মাল্লুচ।

'যাওয়ার তো আছেই মাত্র একটা জায়গা।'

দু'জনেই ওরা রোগিণীদের খোঁজ করতে ইবলিশের টিলার উল্টোদিকে শহরের ফটকের বাইরে গেল। এ জায়গা থেকেই শুরু হয়েছে কুষ্ঠরোগীদের বসতি। ভিক্ষা করতে এপর্যন্তই আসে তারা। বেন-হার আর মাল্লুচ সারাদিন

এখানেই কাটাল। রোগীদের ভিক্ষা দিল, নতুন দুই মহিলা রোগিণীদের খবর জানতে চাইল। লোভ দেখাল, রোগিণীদের সন্ধান জানাতে পারলে মূল্যবান পুরস্কার মিলবে। দুটো দীর্ঘ মাস তারা এই করেই কাটাল। পুরস্কারের আশায় রোগীর দল টিলার সবগুলো গুহায় খোঁজ লাগাল। কৌতূহলী রোগীরা বারেবারে তিয়েরজাহ্‌দের গুহায় এল, জিজ্ঞেস করল ওরাই হার বংশের হারানো সেই দুই মহিলা কি না। প্রতিবারই জবাবে 'না' বলে দিল ওরা।

বেন-হার শুধু এটুকুই জানতে পেল যে ওর মা-বোনকে পাথর মেরে শহর থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। এরপর তারা কোথায় গেছে, তাদের কি হয়েছে কিছুই জানা গেল না। মাসের পর মাস চলে গেল, হতাশ হয়ে পড়ল বেন-হার। যা কিছু রোমান সবতেই এখন ওর প্রবল ঘৃণা, সর্বক্ষণ দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে ওর বুকে।

শীতের আগে দিয়ে জেরুজালেম ছেড়ে গ্যালিলীর বুনো এলাকায় গেল সে। সেখানে প্রশিক্ষণ দিয়ে তিন লেজিয়ন যুবককে সৈনিকে পরিণত করল। ওর নেতৃত্বে মহাপরাক্রমশালী রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়তে তৈরি হয়ে গেল তিন দল যুবক। অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে তাদের সাহায্য করল সিমোনাইড্‌স্। ইলডেরিম চারপাশে নজর রাখার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মাধ্যমে নিয়মিত জানা যায় রোমান সেনাদের গতিবিধির খবর।

বেন-হারকে জুডাহ্ নামে চেনে দলের সবাই। নেতা এবং বিদ্রোহী যোদ্ধা হিসেবে সম্মান করে। বেন-হার তাদের প্রায়ই শোনায় অনাগত সেই রাজার কথা যিনি একদিন রোমানদের হাত থেকে মাতৃভূমি মুক্ত করবেন। বলে বিজ্ঞ বালথ্যাসারের কথা, যিনি রাজার আগমনের অপেক্ষায় এখনও অ্যান্টিয়োক শহরে রয়ে গেছেন। বিনা দ্বিধায় বেন-হারের কথা সবাই বিশ্বাস করে। ওরাও জানে, শুনেছে বহু পুরানো এই পৌরাণিক কাহিনী। একদিন আসবেন মাসিহা! ত্রাণকর্তা!

শীত শেষে এল বসন্ত। তৈরি হয়ে নিল ওরা। এখন শুধুই রাজার জন্যে অপেক্ষা, রাজ্য জয়ের জন্যে খাপমুক্ত তলোয়ারের অভাব আর নেই।

আঠারো

এক বিকেলে কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে সদরদপ্তরে, একটা গুহার সামনে বসে বেন-হার গল্প করছে, এমন সময় এল এক ঘোড়সওয়ার। লোকটা আরব। একটা চিঠি পৌঁছে দিল সে। সীলমোহর ভেঙে চিঠিটা জোরে জোরে পড়ল বেন-হার:

মরুভূমি থেকে একজন নবী এসেছেন। তিনি বলছেন তাঁর চেয়েও বড় একজন নবী শিগগিরই জেরুজালেম আসবেন। সেই নবীর জন্যে তিনি এখন জর্ডান নদীর পুব তীরে বেথাবারায় অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁকে দেখে এসেছি, তাঁর কথা শুনে নিশ্চিত হয়েছি যে তিনি যাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন সেই নবীই

আমাদের রাজা। চলে আসুন, নিজেই সত্যমিথ্যা যাচাই করে যান।

মাল্লুচ

বেন-হার যখন চোখ তুলে চাইল খুশিতে ওর মন ভরে উঠেছে। 'বন্ধুরা,' অনুচরদের বলল সে, 'আমাদের অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে। রাজা সত্যিই আসছেন কিনা দেখতে আমাকে একবার যেতেই হবে।'

যখন রাত নামল, আকাশের নক্ষত্রগুলো দিক নির্দেশ করল, একজন আরব পথ প্রদর্শককে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চেপে জর্ডান নদীর দিকে রওনা হলো বেন-হার।

তিনদিন পরে ওরা যখন পবিত্র জর্ডান নদীর পুব তীরে বিরান ভূমি পেরোচ্ছে, দেখল মরুভূমির ওপর দিয়ে কোনাকুনি ভাবে একটা উট আসছে। জন্তুটা অস্বাভাবিক বড়। গায়ের রঙ সাদা। ওটাকে দেখেই বেন-হারের হৃৎস্পন্দন দ্রুত হলো। ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষা করল সে। লম্বা লম্বা পায়ে এদিকেই আসছে উট।

ওর ঘোড়ার সামনে থামল উট। বেন-হার দেখল হাওদায় বালথ্যাসার আর ইরাস বসে আছে। অভিবাদন জানাল সে। বেন-হারকে দেখে ইরাসের আয়ত দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'বেন-হার, আমি জানি তুমি কেন এখানে এসেছ,' বললেন বালথ্যাসার। 'আমার মতই তুমি রাজার সাক্ষাৎ পেতে ছুটেছ। এবার বোধহয় দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা শেষ হবে।'

'আপনি বলতে চান ইনিই ইহুদীদের সেই রাজা?' জানতে চাইল বেন-হার।

'বোধহয়। গত কয়েক রাতে একটা দৈব কণ্ঠস্বর স্বপ্নে আমাকে নির্দেশ দিয়েছে। বলেছে, "তাড়াতাড়ি জেগে ওঠো– তাঁকে খুঁজে বের করো। তাঁর আগমন সমাসন্ন।" '

'তাহলে আমার সঙ্গে শেষবার আপনার যখন দেখা হয়, তার পরে তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু শোনেননি?'

'না, স্বপ্নের সেই বাণী ছাড়া আর কিছু শুনিনি।'

'তাহলে এই চিঠিটা পড়ুন, আপনার মন ভাল হয়ে যাবে।' মাল্লুচের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিটা বালথ্যাসারকে দিল বেন-হার। পড়ার সময় আবেগে বৃদ্ধের হাত কাঁপতে লাগল।

'কে এই নবী?' জানতে চাইল বেন-হার, 'ইনি নিশ্চয়ই আমাদের রাজার অগ্রদূত?'

স্বর্গীয় দীপ্তি ছড়াল বালথ্যাসারের দু'চোখে। বেন-হারকে তিনি বললেন, 'চলুন আমরা এক সঙ্গে যাই। তাড়াতাড়ি করুন। আমরা যাওয়ার আগেই হয়তো তিনি ওখানে পৌঁছে যাবেন!'

এক সঙ্গে এগোল ওরা। খানিক পরেই একটা নদীর পাড়ে পৌঁছল। এটাই জর্ডান নদী। তীরে অসংখ্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। জন্তুজানোয়ার চরছে। কিছুটা দূরে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটেছে। নবী ওখানে বাণী প্রচার করছেন বুঝতে পেরে চলার গতি দ্রুত করল ওরা। কিন্তু জনসমুদ্রে পৌঁছাতে পারল না। তার

আগেই জটলা ভেঙে গেল, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল মানুষগুলো। বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে ওদের এখানে পৌঁছতে, ভাবল বেন-হার। 'আমরা বরং এখানেই থামি,' মিশরীয় বৃদ্ধকে বলল সে। 'রাসুল হয়তো এপথেই আসবেন।'

মাটিতে নেমে জন্তুগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা। জনতার মিছিল ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে। খানিক পরেই শত শত লোকের ভীড়ে মিশে গেল ওরা। কেউ এই নবাগতদের লক্ষ করল না। সবাই নবীর মুখে কি শুনেছে বলাবলি করতে ব্যস্ত হয়ে আছে। জটলার বেশির ভাগ লোক ওদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। রাসুলকে এক নজর দেখার আশা ওরা ছেড়ে দিয়েছে এমন সময় দেখতে পেল একজন লোক তাদের দিকে হেঁটে আসছে। অদ্ভুত মানুষটা। চোখ আটকে গেল ওদের। ভুলে গেল দুনিয়ার আর সবকিছু।

শীর্ণ দেহ লোকটার। চামড়ার রঙ পুরানো পার্চমেন্টের মতন। কাঁধের ওপর লুটিয়ে আছে একরাশ চুল। দু'চোখ অঙ্গারের মত উজ্জ্বল। শরীরের ডানদিকে পোশাক নেই। পরনে উটের লোম দিয়ে তৈরি একটা জামা। জামাটা কোমরের কাছ থেকে শুরু হয়ে হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে। কোমরে চামড়ার মোটা ফিতে বাঁধা। খালি পা। হাঁটার সুবিধের জন্যে কাপড় জড়িয়ে নিয়েছে পায়ে। খানিক পর পরই চোখের ওপর থেকে চুলের গোছা সরাচ্ছে। কাকে যেন খুঁজছে চারপাশে তাকিয়ে।

ইনিই মরুভূমি থেকে আসা সেই প্রতিশ্রুত নবী, সন্দেহের তেমন কোন অবকাশ নেই। ইরাসকে অবহেলা আর বিরক্তি মিশ্রিত একটা শব্দ করতে শুনল বেন-হার।

'এই কি তোমাদের রাজার অগ্রদূত?' টিটকারির সুরে জানতে চাইল ইরাস।

'হ্যাঁ, ইনিই তিনি,' ইরাসের দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল বেন-হার। ও নিজেও এই বুনো জংলী লোকটাকে দেখে হতাশ। হতচকিত হয়ে গেছে ও, লজ্জা লাগতে শুরু করেছে।

নদীর তীরে পাথরের ওপর বসে ছিলেন একজন লোক। এবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নদীতীর ধরে হাঁটতে লাগলেন। এদিকেই আসছেন, যাবেন বালথ্যাসারের উটকে পাশ কাটিয়ে।

সেদিকে তাকালেন নবী। থমকে থেমে গেলেন। ভালমত দেখার জন্যে চোখের ওপর থেকে সরালেন চুলের গোছা। তারপরই দু'হাত তুলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। দাঁড়িয়ে গেল সবাই। পিনপতন নীরবতা নামল প্রান্তরে। হাতের লাঠি আগন্তুকের দিকে তাক করলেন নবী।

বালথ্যাসার আর বেন-হারও নবী নির্দেশিত লোকটার দিকে তাকাল। শান্ত, নিশ্চিত পদক্ষেপে হেঁটে আসছেন মানুষটা। চিকন পেটা দেহ, সাধারণের চেয়ে একটু বেশি লম্বা তিনি। ধুলোয় হলদে হয়ে যাওয়া একটা পোশাক পরে আছেন। পায়ে কম মূল্যের চটি। মুখটা তাঁর অপূর্ব, রাজকীয়। হৃদয়ের সরলতা তাঁর চোখ দেখে বোঝা যায়। উজ্জ্বল স্বর্গীয় বিভা সেই চোখে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন তিনি। মুহূর্তের জন্যেও বালথ্যাসারের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছেন না। আসছেন উটের দিকেই।

চারপাশ নীরব।

লাঠি তাক করেই রেখেছেন নবী, হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'দেখো, তোমরা ঈশ্বরের পয়গম্বরকে দেখো। ইনি দুনিয়ার পাপ ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবেন! আমি জানি, ইনি ঈশ্বরের পুত্র!'

যারাই নবীর কথা শুনতে পেল কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। তাঁর বক্তব্য বোধগম্য হয়নি কারও। গভীর একাগ্রতায় আগন্তুকের চেহারা দেখল বেন-হার। দেখে বোঝা যায় তিনি ভাবুক, বিনীত, দয়াময় এবং পবিত্র; কিন্তু তিনি কি সেই যোদ্ধা রাজা? বুঝতে পারছে না বেন-হার। মেলাতে পারছে না। যুদ্ধ এবং বিজয়ীর বেশ এই মানুষটার সঙ্গে কোথায় যেন ঠিক মেলে না।

বেন-হার যেমনই ভাবুক বালথ্যাসারের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই ভিন্ন। তিনি জানেন, মানুষ যা ভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছে সবসময় তেমন হয় না। বাচ্চা অবস্থায় এই রাসুলকে তিনি এক আস্তাবলে দেখেছিলেন, কাজেই রাজকীয় পোশাকে রাসুল আসবেন এমনটা তিনি কখনোই ভাবেননি। হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়লেন বালথ্যাসার। কাঁদতে কাঁদতে আনন্দে বলতে লাগলেন, 'ইনিই রাসুল! ইনিই রাসুল!' পরমুহূর্তে তিনি জ্ঞান হারালেন।

'কোথায় যেন এঁকে দেখেছি আমি,' ভ্রূ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল বেন-হার। খুব পরিচিত লাগছে রাসুলকে ওর। তারপর হঠাৎ মনে পড়ল। অনেকদিন আগে নাজারেথ গ্রামে দেখা হয়েছিল। তাকে তখন যুদ্ধ-জাহাজে দাস হিসেবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কুয়ো থেকে পানি তুলে ওকে···। আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠল বেন-হার। তৃষ্ণায় যখন মারা যাচ্ছে, ওকে বাঁচিয়েছিলেন উনি। এই মুখ ও ভুলবে কি করে।

রাসুলের দিকে এগোতে যাচ্ছিল বেন-হার, এমন সময় কাতর গলায় ইরাস বলল, 'কিছু একটা করো, আমার বাবা মারা যাচ্ছেন!'

বেন-হারের হাতে খালি একটা পানির পাত্র দিল ইরাস। নদীর তীরে পানি আনতে দৌড়ে গেল বেন-হার। যখন পানি নিয়ে ফিরল, রাসুল তখন চলে গেছেন। কোথাও তাঁকে দেখা গেল না।

বেশ খানিক পরে বালথ্যাসারের চেতনা ফিরল। হাত বাড়িয়ে তিনি দুর্বল স্বরে জানতে চাইলেন, 'কোথায় তিনি?'

'কে?' জানতে চাইল ইরাস।

'ঈশ্বরের পুত্র, যাঁকে আমি আজ আবার দেখলাম।'

'তুমিও এসব বিশ্বাস করো?' বাবা যাতে শুনতে না পায় সেজন্যে নিচু স্বরে বেন-হারকে জিজ্ঞেস করল ইরাস।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বেন-হার। এখনও ওর মন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে দুলছে।

পরদিন ওরা তিনজন অগ্রদূত নবীর ভাষণ শুনছে। নদীর ধারে জমায়েত হয়েছে সবাই। হঠাৎ ভাষণ থামিয়ে নবী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দেখো, ওই যে ঈশ্বরের নূর!'

নবীর কথা শুনে তাকাল সবাই। দেখল কালকের সেই হালকা পাতলা

আগন্তুকের দিকে নবী আঙুল তাক করে আছেন। আগন্তুকের চেহারা পবিত্র, খানিকটা যেন উদাস।

পাশে বসে থাকা লোকটাকে বেন-হার জিজ্ঞেস করল, 'কে ইনি?'

জবাবে ব্যঙ্গের হাসি হাসল লোকটা। বলল, ইনি? হাহ্ হাহ্ হাহ্! নাজারেথের এক সামান্য কাঠমিস্ত্রির ছেলে।'

উনিশ

'ইসথার,' ডাক দিল সিমোনাইড্স, 'ভৃত্যকে বলো আমার জন্যে এক পাত্র সুরা নিয়ে আসতে।'

জেরুজালেমে এসেছে বণিক। এখন বসে আছে হার-প্রাসাদের ছাদে। যীশু বেথেলবারায় ধর্ম প্রচার করেছেন সে-ও বেশ কয়েক মাস হয়ে গেছে। হার প্রাসাদ এখন আবার বেন-হারের সম্পত্তি। ওর পক্ষ হয়ে পনটিয়াস পাইলেটের কাছ থেকে প্রাসাদটা মাল্লুচ কিনে নিয়েছে। মেরামত কাজ শেষ। আরও সুন্দর করে নতুন ভাবে আসবাবপত্রে সাজানো হয়েছে আবার।

সম্পত্তির মালিক বলে নিজের পরিচয় বেন-হার কোথাও প্রকাশ করেনি। জানে, এখনও উপযুক্ত সময় আসেনি। নিজের বংশ পরিচয়ও সে গোপন রেখেছে। খুব কমই আসে জেরুজালেমে। বেশিরভাগ সময় গ্যালিলীতেই কাটায়, অনুচরদের যুদ্ধের কলাকৌশল শেখায়, আর পয়গম্বরের ইতিবাচক সঙ্কেতের জন্যে অপেক্ষা করে।

ইরাস এবং বালথ্যাসারকে হার প্রাসাদে বসবাস করার আমন্ত্রণ দেয়া হয়েছিল, সে আমন্ত্রণ তারা গ্রহণ করেছে। মাত্র কয়েক দিন হলো অ্যান্টিয়োক থেকে মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছে বালথ্যাসার। বিশাল প্রাসাদে মাত্র কয়েকজন মানুষ, খাঁ খাঁ করে চারপাশ।

বাবার কথা শুনে হেঁটে গিয়ে ছাদের প্রাচীরের সামনে দাঁড়াল ইসথার। উঠানে একজন ভৃত্যকে দেখে ডাক দিল। সিঁড়িতে শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল আরেকজন ভৃত্য ছাদে উঠে এসেছে। হাতে তার লিনেন কাপড়ে মোড়া একটা চিঠি। সীলমোহর অঙ্কিত চিঠিটা ইসথারের হাতে দিল সে। বলল, 'প্রভুর চিঠি।'

চিঠি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইসথার। শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল দ্রুত হলো ওর। দু'গালে পড়ল রক্তিম ছোপ। চিঠিটা বেন-হারের লেখা। প্রায় দৌড়ে বাবার কাছে ফিরে এল ইসথার।

সীলমোহর ভেঙে পার্চমেন্টের টুকরোটা মেয়ের হাতে দিয়ে সিমোনাইড্স বলল, 'পড়ে শোনাও।' কথা বলার সময় তার চোখ থাকল মেয়ের ওপর। মেয়ের দুঃখে কালো হয়ে গেল সিমোনাইড্সের মুখ। ইসথারকে ইতস্তত করতে দেখে ব্যথিত স্বরে সে বলল, 'তুমি তাহলে জেনে গেছ চিঠিটা কার লেখা।'

'জ্বী।' চোখ তুলে বাবার দিকে তাকাতে পারল না ইসথার।

'তুমি ওকে ভালবাসো– তাই না?'

'জ্বী।'

'কিন্তু সে তো মিশরীয় মেয়েটাকে ভালবাসে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে কোমল স্বরে বলল সিমোনাইড্‌স্, 'মেয়েটা অসম্ভব চতুর, কিন্তু অপরূপ সুন্দরী।'

'আমি জানি, বাবা,' গোপনে কান্না চেপে বলল ইসথার। বাবার সঙ্গে হঠাৎ আজ এধরনের অস্বস্তিকর আলোচনা করতে বাধছে তার। 'চিঠি পড়ি শোনো,' বলে তাড়াহুড়ো করে পড়তে লাগল ইসথার। মনে মনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

চিঠিটা সংক্ষেপে লেখা হয়েছে:

সিমোনাইড্‌সের প্রতি বেন-হার

গ্যালিলী হতে জেরুজালেমে যাবার পথে।

এমাসের নবম দিনে আমি জেরুমালেমে পৌঁছব। নাজারেথবাসীরাও রওয়ানা হয়ে গেছে। তাদের অজান্তেই আমি একদল দক্ষ সেনা নিয়ে আসছি। দ্বিতীয় আরেকটা দল তাদের অনুসরণ করবে। সবার পরনে থাকবে সাধারণ পথচারীদের মত স্বাভাবিক পোশাক।

আমাদের অপেক্ষার পালা এবার শেষ হতে চলেছে।

তাড়াহুড়োয় আছি বলে লেখা এখানেই শেষ করব।

আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, সিমোনাইড্‌স্।

বেন-হার।

চিঠিটা পড়া শেষে বাবার হাতে দিল ইসথার। মনে মনে ভীষণ দুঃখ পেয়েছে ও। নেই, চিঠিতে একটিবারের জন্যেও ওর নাম নেই! ওকে মনে রাখেনি বেন-হার! মনে রাখার প্রয়োজনও বোধ করেনি!

'আজই তো মাসের নবম দিন,' চিন্তিত হয়ে পড়ল সিমোনাইডস্। 'শিগ্‌গিরই চলে আসবে বেন-হার!'

সুরা নিয়ে এল একজন ভৃত্য। বেন-হার প্রসঙ্গে বাপ-মেয়ের মধ্যে আর একটা কথাও হলো না।

রাত নামল। নক্ষত্রগুলো আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো এতই কাছে যে হাত বাড়ালেই ছুঁয়ে দেয়া যাবে। মাঝে মাঝে মস্ত রূপোলী চাঁদটা ঢেকে যাচ্ছে দু'একটুকরো ঘন কালো মেঘে। দিগ্বিদিক্ দিশে হারিয়ে বইছে উন্মাতাল হাওয়া। সবই আছে, তবু ইসথারের মনে হচ্ছে কোথায় যেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়ে গেছে বিশাল এক অন্তহীন শূন্যতা।

বেশ রাত করে প্রাসাদে পৌঁছল বেন-হার। রাজকীয় হল ঘরে ওকে সম্বর্ধনা জানানো হলো। উপস্থিত থাকল সিমোনাইড্‌স্, ইসথার, বালথ্যাসার এবং তার অপরূপা কন্যা ইরাস।

শুভেচ্ছা বিনিময় শেষ হলে একটা টুল নিয়ে এল ইসথার। সেই টুলে বসল বেন-হার। মনোযোগ দিল সে সিমোনাইডস্ আর বালথ্যাসারের প্রতি। ও কি জানে না ইসথার ওকে কত ভালবাসে?

'নাজারেথ গ্রামের সেই মানুষদের ব্যাপারে আমার বহু কিছু বলার আছে,' আলোচনার শুরুতে বলল বেন-হার। 'রাসুলের সঙ্গে বারোজন শিষ্য আসছে। সবাই সাধারণ মানুষ। কেউ কৃষক, কেউ জেলে। পায়ে হেঁটে আসছে সবাই ঝড়-বৃষ্টি, ঠাণ্ডা-তাপ উপেক্ষা করে। আমিও তাদের অনুসরণ করেছি। রাসুলের ওপর নজর রেখে আমি বুঝেছি যে তিনিও আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, আবার একই সঙ্গে আরও বেশি কিছু।'

'বেশি কিছু?' ভ্রূ কোঁচকাল সিমোনাইড্স্।

'শুনুন তাহলে...' কথার মাঝেই অ্যামরাহ্ ঘরে ঢোকায় থেমে গেল বেন-হার। উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে বলল, 'এসো, অ্যামরাহ্, এসো তুমি।'

এগিয়ে এসে বেন-হারের হাতে চুমু খেল অ্যামরাহ্। বেন-হার জিজ্ঞেস করল, 'মা আর তিয়েরজাহ্র কোন খোঁজ পেয়েছ, অ্যামরাহ্?'

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে মাথা নাড়ল অ্যামরাহ্।

'এসো, আমার পাশে এসে বসো,' বলল বেন-হার। 'এই বিশ্বে এক চমৎকার মানুষের আগমন হয়েছে, সে-কথাই এখন বলছিলাম। বসো আমার পাশে।'

বেন-হারের পায়ের কাছে মেঝেতে বসল অ্যামরাহ্। বৃদ্ধাকে অনুরোধ উপরোধ করে কাজ হবে না বুঝে জোর করল না বেন-হার। বলতে শুরু করল, 'যে মানুষ পায়ের স্পর্শে পাথরকে সোনা বানাতে পারেন অথচ স্বেচ্ছায় দরিদ্রের জীবন বেছে নিয়েছেন তাঁকে আপনারা কি বলবেন?'

'এই লোকের সেই ক্ষমতা আছে?' আগ্রহী হয়ে উঠল ইরাস।

'তাঁকে আমি নিজের চোখে পানিকে সুরায় পরিণত করতে দেখেছি,' জবাবে বলল বেন-হার।

'অবাক কাণ্ড,' অস্ফুট স্বরে বলল সিমোনাইড্স্, তারপর জানতে চাইল, 'তারপরও তিনি কি আসলেই দরিদ্র?'

'হ্যাঁ। তাঁর নিজের বলতে কিছুই নেই। ধনীদের তিনি করুণার চোখে দেখেন। একবার তিনি দুটো মাছ আর সাতটা রুটি খাইয়ে পাঁচ হাজার লোকের খিদে দূর করেছেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি। এমন একজন মানুষ সম্পর্কে কি বলবেন আপনারা? কি ধারণা করবেন?'

'আপনি দেখেছেন?' জানতে চাইল সিমোনাইড্স্।

'হ্যাঁ। সেই রুটি আর মাছও খেয়েছি,' বলে চলল বেন-হার। 'ঘটনা শুধু এটুকুই নয়, জেরিকো ছেড়ে যাবার সময় পথে তাঁর সামনে দু'জন অন্ধ লোক পড়েছিল, তিনি শুধু হাতের স্পর্শে তাদের চোখ ভাল করে দিয়েছেন! আপনারা হয়তো ভাবছেন এসবের মধ্যে কোন চালাকি আছে, তাহলে আরেকবার ভাবুন-ঈশ্বরের অভিশাপ যে কুষ্ঠ সেই ভয়ানক রোগও তিনি স্পর্শ করলে সেরে যায়, ঘায়ের চিহ্ন পর্যন্ত থাকে না!'

বেন-হারের মুখে এ কথা শুনেই আগ্রহী হয়ে উঠল অ্যামরাহ্, পলকহীন চোখে ওকে দেখতে লাগল।

'গ্যালিলীতে এক কুষ্ঠরোগী রাসুলের কাছে এসেছিল, তাঁর কাছে সুস্থতা

কামনা করেছিল, রাসুল সেই রোগীর গা স্পর্শ করে বলেন, 'পরিছন্ন হও।'' সঙ্গে সঙ্গে লোকটা সুস্থ হয়ে ওঠে।'

কথার মাঝেই অ্যামরাহ্ উঠে দাঁড়াল। আগ্রহে, আশার আলোয় জ্বল জ্বল করছে তার চোখ মুখ।

'তারপর,' বলে চলল বেন-হার, 'আরেকদিন দশজন কুষ্ঠরোগীর একটা দল এসে তাঁর পায়ে পড়ে গেল। কাতর স্বরে তারা অনুরোধ করল, ''প্রভু, আপনি আমাদের দয়া করুন!'' আমি নিজের কানে শুনেছি তিনি জবাবে বললেন, 'পুরোহিতের কাছে যাও। সেটাই তো নিয়ম। যাওয়ার পথেই তোমরা সুস্থতা ফিরে পাবে।'' '

'তারপর সুস্থ হলো তারা?'

'হ্যাঁ। রাস্তা ধরে এগোতেই সেরে গেল সব ক'জন!'

'এমন ঘটনা তো কখনও শুনিনি আগে,' অবাক হয়ে বলল সিমোনাইড্স্।

বেন-হার সামনে ঝুঁকে এক এক করে সবার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'শুধু তাই নয়, আমার মত যদি আপনারাও নিজের চোখে কোন মৃতকে জীবিত হয়ে উঠতে দেখতেন তাহলে কি ভাবতেন? বেথানিতে রাসুল একজন মৃত লোককে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছেন। ল্যাজ্যারাস নামের এক লোকের মৃত্যু হলে কবর দেয়া হয়...'

এপর্যন্ত শুনেই নিঃশব্দে সবার অলক্ষে চলে গেল অ্যামরাহ্। সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে বেন-হারের কথা শুনছে, কেউ খেয়াল করল না। বিস্ময়কর, অভূতপূর্ব সব ঘটনা বেন-হার বলে যাচ্ছে একের পর এক...

পরদিন ভোরে সবার আগে শহর ছেড়ে বেরোল অ্যামরাহ্। হাতে তার খাবার ভরা ঝুড়ি। যতখানি পারছে দ্রুত হাঁটছে বৃদ্ধা। মাঝেমধ্যে হোঁচট খেয়েও সামলে নিচ্ছে। একটুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম নিতে একবার বসল, তারপর দম ফিরে পেয়ে আগের চেয়েও জোরে পা চালাল।

ইবলিশের টিলার কাছে সে যখন পৌঁছল পুব আকাশে সূর্য তখন উঁকি দিয়েছে। অ্যামরাহ্ দেখল এত সকালেও গুহার বাইরে বসে আছেন প্রভুর মা। তিয়েরজাহ্ তাঁর সঙ্গে নেই। গুহার ভেতরে ঘুমাচ্ছে। আজ বেন-হারের মা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখেননি। তিনি জানেন এত সকালে সুস্থ কেউ এদিকে আসবে না, আর এই টিলার বাসিন্দারা সবাই রোগী, কেউ তাঁকে দেখে ভয় পাবে না। সকালের তাজা বাতাস উপভোগ করছেন তিনি। তাঁর মুখে আরও প্রকট হয়েছে রোগের চিহ্ন। কাঁধের ওপর রূপোলী তারের মত লুটাচ্ছে তুষার শুভ্র রুক্ষ চুলগুলো। অযত্নে চুলে জট পড়তে শুরু করেছে। গলার কাছটা দগদগ করছে ছাই রঙা ঘায়ে। দুঃখে কষ্টে শরীর হয়ে গেছে কঙ্কালের মত হড্ডিসার। অ্যামরাহ্কে আসতে দেখে তাড়াহুড়ো করে উঠলেন তিনি। ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে সতর্ক করতে বললেন, 'অশুচি! অপবিত্র!'

বারণ শুনল না অ্যামরাহ, এগিয়ে এসে তাঁর কাপড় ধরে ফেলল। সরে যেতে

পারলেন না বেন-হারের মা। ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেল। 'একি করলে, অ্যামরাহ্!' চমকে উঠে আর্তকণ্ঠে বললেন তিনি, 'একি করলে! তুমি তো কখনও আর বেন-হারের কাছে ফিরে যেতে পারবে না। জেরুজালেমেও ফিরতে পারবে না। কি করলে তুমি!'

মায়ের চিৎকারে তিয়েরজাহ্‌র ঘুম ভেঙে গেল। গুহার বাইরে বেরিয়ে এল সে। হঠাৎ অন্ধকার থেকে আলোতে আসায় কিছুই প্রায় দেখতে পেল না। জিজ্ঞেস করল, 'কে এসেছে, মা? অ্যামরাহ্ এসেছে?'

'হ্যাঁ, আমি অ্যামরাহ্।' দৌড়ে তিয়েরজাহ্‌র কাছে গেল বৃদ্ধা। তারপর আবার তাকাল বেন-হারের মা'র দিকে। বলল, 'ভয় পাবেন না, দারুণ খবর নিয়ে এসেছি আমি।'

'কার খবর, জুডাহ্‌র খবর?' জানতে চাইলেন মা।

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। তিনি বলেছেন জেরুজালেমে একজন পয়গম্বর আসছেন। কুষ্ঠরোগ সারানোর ক্ষমতা আছে তাঁর। তিনি বললেই সবাই সুস্থ হয়ে যায়, মৃত মানুষ প্রাণ ফিরে পায়! আমি তাঁর কাছেই আপনাদের নিয়ে যেতে এসেছি।'

'বেচারী অ্যামরাহ্।' গুহায় ফেরার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল তিয়েরজাহ্। ওর ধারণা বৃদ্ধার মাথাটা গেছে।

'না, আমি পাগল নই,' বুঝতে পেরে বলল অ্যামরাহ্। 'আপনারা আমার সঙ্গে চলুন, নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই। আজই তিনি এপথে আসবেন। জলদি করুন, নাস্তা করে নিয়ে চলুন আমার সঙ্গে!'

এই ইবলিশের টিলাতে বসেও বেন-হারের মা সেই মহাপুরুষের কথা শুনেছেন। শুনেছেন কিভাবে রাসুলের কথায় রোগীরা সুস্থ হয়ে যায়। আগ্রহের সঙ্গে তিনি জানতে চাইলেন, 'কে এই মহাপুরুষ?'

'তিনি নাজারেথ গ্রামের লোক।'

'এঁর কথা জানাতে জুডাহ্ তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'না। তাঁর ধারণা আপনারা মৃত।'

'জুডাহ্ এই মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতার কথা কিভাবে জানল?'

'তিনি রাসুলের সঙ্গেই ছিলেন। নিজের চোখে দেখেছেন এক পলকে সেরে গেছে দশজন কুষ্ঠরোগী।'

চুপ করে রইলেন বেন-হারের মা। তাঁর শীর্ণ দু'হাত আবেগে শঙ্কায় থরথর করে কাঁপতে লাগল। বেন-হার যদি সত্যিই এই অলৌকিক ব্যাপার দেখেছে বলে থাকে তাহলে তো সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

'তাহলে এই মহাপুরুষই মাসিহা,' অবশেষে কম্পিত স্বরে বললেন তিনি। 'শুনেছিলাম তাঁর জন্ম হয়েছে। একটা সময়ে জেরুজালেম আর জুডিয়ার মানুষজনের মুখেমুখে তাঁর কথা ফিরত। এখন নিশ্চয়ই তিনি যুবক হয়েছেন। হ্যাঁ, আমরা তোমার সঙ্গে তাঁকে দেখতে যাব।'

বিশ

সেদিন সকালেই বেলা আরেকটু গড়ালে পরে জেরুজালেম শহর ছেড়ে রাসুলের সঙ্গে দেখা করতে রওয়ানা হলো বেন-হার। ও জানে, তিনি শহরের দিকেই আসছেন। পথে হাজার হাজার লোকের মিছিল দেখল বেন-হার। সবাই উৎফুল্ল। কেউ গান গাইছে, কেউ বা করছে গল্প। সবাই মনে মনে উদগ্রীব হয়ে আছে সেই মহাপুরুষকে দেখার জন্যে। তিনি আসার আগেই চারদিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

এলিভেট টিলা শহরের পুব প্রান্তে। সেদিকে এগোল বেন-হার। দেখল ওই পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে এসেছে আরও অনেক মানুষের বিশাল এক মিছিল। ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল বেন-হার, রাস্তা থেকে সরে ফাঁকা জায়গায় চলে এল। বসল সাদা রঙের একটা উঁচু পাথরে। ঠিক করেছে এখানে বসেই তাঁর আগমনের অপেক্ষা করবে।

একটু পরেই পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে এল সেই মিছিল। প্রত্যেকের হাতে একটা করে সদ্য কাটা তাজা খেজুর ডাল। নাচছে তারা, গান গাইছে, এগিয়ে চলেছে মনের আনন্দে। খুশিতে হর্ষধ্বনি করছে কেউ কেউ।

মিছিলের মাঝখানে, গাধার পিঠে চেপে আসছেন একজন। পরনে তাঁর ধবধবে সাদা জামা। খালি মাথায় রোদ পড়েছে, সেই রোদে ঝিকমিক করছে তাঁর কাঁধে লুটানো কোঁকড়ানো বাদামী চুল। ডানে বামে কোনদিকে তাকাচ্ছেন না তিনি। দেখে মনে হয় অনুসারীদের হৈ-হট্টগোলে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই, দুঃখিত চেহারায় ভাবছেন কি যেন। মনটা ভার হয়ে আছে।

মিছিলের প্রথম অংশটা দ্রুত বেন-হারকে পাশ কাটিয়ে গেল। পাথরের দিকে সরে এলেন গাধার আরোহী। শহরের দিক থেকে হঠাৎ শোরগোল শোনা গেল। ওদিক থেকেও আসছে জনস্রোত। আরোহীর সঙ্গের জনতা থেমে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে উঠল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। তারপর ক্ষণিকের জন্যে নীরবতা নামল।

সেই নীরবতার মুহূর্তেই সাদা পাথরের পেছন থেকে দু'জন মহিলাকে বেন-হার ছুটে বেরোতে দেখল। এক পলক দেখেই সে বুঝে ফেলল কারা ওরা। কুষ্ঠরোগী! বুঝতে পারল না, চিনতেই পারল না যে এরাই ওর মা-বোন। ও জানল না যে মহিলা দু'হাত সামনে বাড়িয়ে আর্তকণ্ঠে সাহায্য চাইছেন তিনিই ওর হারিয়ে যাওয়া মা।

জনতা ঘোমটা পরা মুখ দেখেই কুষ্ঠরোগী চিনতে পারল। আতঙ্কে ঘৃণায় থমকে দাঁড়াল সবাই। তারপরই হুড়োহুড়ি করে দূরে সরতে লাগল। চেঁচাতে লাগল অনেকে। ভয়ে চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল তিয়েরজাহ্।

'কুষ্ঠরোগী! কুষ্ঠরোগী! পাথর মেরে তাড়াও!'

'ঈশ্বরের অভিশপ্ত ওরা! খুন করে ফেলো!'

এই পর্যায়ে শান্ত ভঙ্গিতে হাত তুললেন গাধার পিঠে বসে থাকা মানুষটা। যেন যাদুমন্ত্র বলে হঠাৎ চুপ করে গেল সবাই। রোগিণীও থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর সামনে থামলেন রাসুল। বেন-হারের মা তাকিয়ে থাকলেন তাঁর চেহারার দিকে। শান্ত সমাহিত দয়ালু একটা অপূর্ব সুন্দর মুখ। বড় বড় আয়ত দু'চোখে ভালবাসা আর দয়ার ছাপ।

দু'হাত তুলে কেঁদে ফেললেন বেন-হারের মা, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'প্রভু! আপনি আমাদের চাহিদা জানেন। আপনি চাইলে আমরা এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পাব। প্রভু, দয়া করুন আমাদের। দয়া করুন।'

'তুমি কি বিশ্বাস করো আমি সত্যিই একাজ করতে পারব?' শান্ত স্বরে জানতে চাইলেন যীশু।

'জ্বি, প্রভু,' জবাব দিলেন মা। 'আপনিই তো মাসিহা। আপনার কথাই তো আগেও অনেক রাসুল বলে গেছেন!'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর চোখ। 'তোমাদের এই অগাধ বিশ্বাস সবসময় ধরে রেখো,' বললেন তিনি। 'যা বিশ্বাস করো তা-ই হবে।' এক মুহূর্ত সেখানেই অপেক্ষা করে আবার এগিয়ে যেতে শুরু করলেন।

আবার তাঁকে ঘিরে ধরল জনসমুদ্র। খেজুরের ডাল দুলিয়ে এগিয়ে চলল সবাই। পেছনে রেখে গেল রোগিণী দু'জনকে।

দৌড়ে গিয়ে তিয়েরজাহ্‌কে জড়িয়ে ধরে বেন-হারের মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন...মাসিহা আমাকে কথা দিয়েছেন। আমরা সুস্থ হয়ে যাব...সুস্থ হয়ে যাব!'

ধীরে ধীরে শেষ লোকটাও পাহাড় পেরিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল। পুরোটা সময় হাঁটু মুড়ে বসে রইলেন মা-মেয়ে। জনতার গানের শব্দ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার পরে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে শুরু করল।

প্রথমে রোগিণীদের হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল। ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত শরীরের শিরায় শিরায় দ্রুত হয়ে উঠল রক্ত চলাচল। চমৎকার একটা অনুভূতি দেহমন বিবশ করে দিল। ওরা বুঝতে পারছে সারিয়ে তোলা হচ্ছে ওদের। ব্যথা-জ্বালা-যন্ত্রণা মিলিয়ে যাচ্ছে, ফিরে আসছে শক্তি।

পুরো ব্যাপারটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দেখল বেন-হার লোকজন চলে যাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। তাছাড়া অলৌকিক ঘটনা দেখার লোভও ভেতরে কাজ করছিল।

জনতার মিছিলে পরিচিত অনেককে দেখেছে সে। ওরা তার সেনাবাহিনীর সদস্য। সাধারণ পোশাকে ভীড়ে মিশে আছে সবাই। প্রত্যেকের কোমরে লুকানো আছে একটা করে খাটো তলোয়ার। প্রয়োজনে ওরা লড়তে প্রস্তুত।

তাদেরই একজনকে ডাক দিল বেন-হার। মিছিল ছেড়ে আরব লোকটা ওর কাছে এসে দাঁড়াতেই বেন-হার বলল, 'তুমি এখানেই থাকো। আমার ঘোড়া পাহারা দাও।'

রাস্তা পেরিয়ে রোগিণীদের দিকে এগোল বেন-হার। অপরিচিতা মহিলা দু'জন সুস্থ হলো কিনা জানতে চায়। যদিও তাদের ক্ষত-বিক্ষত চেহারা সে দেখেছে, নিজের মা-বোন বলে চিনতে পারেনি। ঘুণাক্ষরেও এদের পরিচয় সম্বন্ধে ওর সন্দেহ হয়নি। আনমনে একবার সাদা পাথরটার দিকে তাকাল বেন-হার। ওখানে দাঁড়ানো বৃদ্ধা মহিলাকে দেখে চমকে উঠল। অ্যামরাহ্ এখানে কি করছে! মা-বোনকে না চিনেই পাশ কাটাল সে, অ্যামরাহ্র সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অ্যামরাহ্র যেন কোনদিকে খেয়াল নেই, একদৃষ্টিতে রোগিণীদের দিকে চেয়ে আছে।

'এখানে কি করছ, অ্যামরাহ্?' জানতে চাইল বেন-হার।

জবাবে অ্যামরাহ্ কোন কথা বলল না, শুধু হাত তুলে মহিলা দু'জনকে দেখাল। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে নিজেও তাকিয়ে আছে। রোগিণীদের দিকে ফিরল বেন-হার। দাঁড়িয়ে আছে মহিলা দু'জন। চিনতে পেরে চমকে উঠল ও। কোথায় সেই কদাকার রোগিণী, এরা তো একদম সুস্থ মানুষ। একজনকে দেখতে ওর মা'র মতন। চুলে একটু ধূসর ছোপ পড়েছে। ওটুকু বাদ দিলে এই মহিলা যেন সেদিনের সেই হারিয়ে যাওয়া মা। পাশেই তো দাঁড়িয়ে আছে তিয়েরজাহ্! বদলায়নি ও। আগের মতই সুন্দর দেখতে, এখন যুবতী হওয়ায় আরও অপরূপা হয়েছে।

নিষ্পলক চোখে স্তব্ধ বিস্ময়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল বেন-হার। অ্যামরাহ্ ওর হাত আঁকড়ে ধরে বলল, 'ওদের সঙ্গে কথা বলুন, প্রভু! কথা বলুন!'

ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল বেন-হার, আনন্দে ফুঁপিয়ে উঠল, 'মা! তিয়েরজাহ্! এই তো আমি।'

নীরবে কাঁদতে লাগল ওরা তিনজন।

একুশ

সেদিন দুপুরেই নগর প্রাচীরের বাইরে চমৎকার এক মাঠে বেন-হার দুটো তাঁবু পাতল। ওর নির্দেশে সেখানে সমস্ত আরাম আয়েশের ব্যবস্থা করা হলো যতদিন না পরীক্ষক পুরোহিত এসে নীরোগ বলে সনদ দেবে ততদিন এখানেই থাকবে বেন-হারের মা-বোন।

বেন-হার নিজেও তাদের সঙ্গে রয়ে গেল। বহুদিনের বিচ্ছেদে অনেক কথা জমে ছিল। সেসব বলল ওরা পরস্পরকে। ওর মা-বোনের প্রতি রোমানদের অত্যাচারের মাত্রা জানতে পেরে প্রতিশোধের স্পৃহা আরও বাড়ল বেন-হারের। এখন শুধু মহাপুরুষের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা। বিদ্রোহ করতে হলে, লড়তে হলে এখনই উপযুক্ত সময়। হাজার হাজার লোক এখন উৎসবে যোগ দিতে জেরুজালেমে ছুটে এসেছে। রাসুল নিশ্চয়ই শিগগিরই লড়াইয়ের ডাক দেবেন!

সর্বক্ষণ বেন-হার শুধু যুদ্ধের কথা ভাবে, মুক্তির কথা ভাবে, ভাবে কি করে রোমানদের নাগপাশ ছিঁড়ে দেশকে স্বাধীন করবে।

পরবর্তী কয়েকদিন বেন-হারের খোঁজে এল দুর্ধর্ষ চেহারার কিছু লোক। তাদের সঙ্গে বেন-হারকে গোপনে পরামর্শ করতে দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে বেন-হারের মা একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'এরা কারা আসে?'

বেন-হার বলল, 'ওরা আমার বন্ধু। গ্যালিলী থেকে এসেছে।'

এই অনুচরদের কাছ থেকেই বেন-হার রাসুলের গতিবিধির খোঁজখবর পায়। তারাই জানায় ইহুদী আর রোমানদের মধ্যে কারা মহাপুরুষের শত্রু। বেন-হার তাদের কাছেই জানতে পারল পয়গম্বরের জীবন বিপন্ন। অবশ্য খবরের সত্যতা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারল না, ভাবল, এই উৎসবে এত লোক সমাগমের মাঝে তাঁর ক্ষতি করার সাহস কারও হবে না।

উৎসবের আগের দিন বেন-হার শহরে গেল। একটা সরাইখানায় অনুচরদের জিম্মায় ঘোড়া রেখে পায়ে হেঁটে ওর প্রাসাদের দিকে এগোল। রাস্তায় লোক উপচে পড়ছে। ব্যস্ত হয়ে এদিক ওদিক ছুটছে মানুষ। হাসাহাসি করছে। গান গাইছে। দেখে মনে হচ্ছে সবাই সুখী। শহরের পরিবেশ উৎসবমুখর।

বেন-হার প্রাসাদের হলঘরে ঢুকতেই একজন ভৃত্য জানাল, সিমোনাইড্স্, ইসথার আর বালথ্যাসার উৎসব দেখতে গেছেন। শুধু ইরাস যায়নি, প্রাসাদেই আছে। ভৃত্যের কথাও শেষ হয়নি, নড়ে উঠল পরদা। ঘরে ঢুকল ইরাস। পরনে সাদা ধবধবে পোশাক। তুষার শুভ্র মেঘে জড়ানো পরীর মত লাগছে ওকে দেখতে।

ভৃত্য ওদের দু'জনকে একা রেখে চলে গেল।

গত কয়েক দিনের ব্যস্ততায় ইরাসের কথা খুব কমই মনে পড়েছে বেন-হারের। যখনই ভেবেছে, মনে হয়েছে অপেক্ষা করবে ইরাস, অপেক্ষা করছে। ভালবাসে ও ইরাসকে।

ইরাসের দিকে এগোতে গিয়েও থমকে গেল বেন-হার। তাকিয়ে থাকল। কোথায় কি যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইরাসের দৃষ্টিতে সেই উষ্ণতা আর নেই। হাসছে না ইরাস। শীতল চোখে মূর্তির মত চেয়ে আছে। মুখ উঁচু করে রেখেছে উদ্ধত ভঙ্গিতে। যেন টিটকারির হাসিতে সামান্য বেঁকে আছে কমলা কোয়ার মত দু'ঠোঁট।

'আমাকে বলো, হারের পুত্র,' শীতল স্বরে বলল ইরাস, 'বলো, জেরুজালেমের প্রিন্স, যার কাছে তোমাদের এত কিছু পাবার আশা সেই নাজারেথ গ্রামের কাঠমিস্ত্রি এখন কোথায়?'

'আমি কি করে জানব? আমি তো তাঁর প্রহরী নই!'

টিটকারির হাসি হাসল ইরাস, দু'চোখে বিদ্রূপের ঝলক তুলে বলল, 'আমি জানি তুমি তার প্রহরী নও। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি তার ডানহাত হবে, তার রাজ্যের অংশীদার হবে। তুমি রাজ্যের অংশ পেলে আমিও তার ভাগ পাব। কিন্তু আমার ধারণা ভুল ছিল, ভুল ভেবেছিলাম। কোথায় রাজ্য! তোমাদের রাজাকে

আমি গাধার পিঠে চেপে জেরুজালেম শহরে ঢুকতে দেখেছি! রাজা, তা-ও আবার গাধার পিঠে। ঈশ্বরের পুত্র! বিশ্বের ত্রাণকর্তা!' হাসিতে ফেটে পড়ল ইরাস।

বিরক্ত হয়ে ভ্রূ কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকল বেন-হার।

'কি?' কঠোর হয়ে উঠল ইরাসের চেহারা। 'তোমাদের মাসিহা কি রোম সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো করে ফেলেছে নাকি? সে কি তোমাকে বিশ্বের সেরা ব্যক্তিদের একজনে পরিণত করেছে? করেনি। পারেনি। তাহলে আমাকে বিয়ে করার উপযুক্ত বলা যায় তোমাকে? যায় না!'

'যথেষ্ট হয়েছে,' শান্ত স্বরে থেমে থেমে বলল বেন-হার, 'পরে তোমার মন যখন ভাল থাকবে তখন আবার আমরা এব্যাপারে কথা বলব।'

চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল বেন-হার।

'দাঁড়াও!' ধমকে উঠল ইরাস। বেন-হার তাকানোয় বলল, 'তোমার এই ফালতু আজগুবি স্বপ্ন দেখায় আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। ইহুদীদের তুলনায় রোমানদেরই আমি বেশি পছন্দ করি। তবুও তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি, আমার কথামত কাজ করলে হয়তো তোমাকে আমি দয়া করতেও পারি।'

'মানে? কি বলছ তুমি?' বিস্ময় কাটিয়ে উঠে জানতে চাইল বেন-হার।

ইরাসের আঙুলগুলো লকেটের রত্নটাকে নিয়ে খানিক খেলা করল। বেন-হারের দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকল ইরাস। তারপর বলল, 'কিছুদিন আগে জাহাজ থেকে পলাতক একজন দাস ইডারনী প্রাসাদে একজনকে খুন করেছে।'

চুপ করে থাকল বেন-হার।

ইরাস শীতল স্বরে আবার বলল, 'সেই একই ইহুদী রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গ্যালিলীতে সৈন্যবাহিনী গড়েছে। এব্যাপারে শেখ ইলডেরিম তাকে সাহায্য করছে। রোমানরা এসব শুনলে খুব খুশি হবে, তাই না?' বেন-হারের কাছে সরে এল ইরাস, চাপা গলায় হিসহিস করে বলল, 'কথা শুনে চললে তোমাকে আমি বাঁচাব। মনে পড়ে সেই বন্ধুর কথা যে বন্ধু থেকে শত্রু হয়ে গেছিল? তোমার প্রতি সে অন্যায় করেছিল। বহুবছর পর অ্যান্টিয়োকের রথদৌড়ে তার সঙ্গে আবার দেখা হয় তোমার।'

'মেসালা!'

'হ্যাঁ, মেসালা। সারাজীবন ওকে পঙ্গু হয়েই বেঁচে থাকতে হবে। রথদৌড়ে তোমাকে হারাতে পারবে ভেবে তার সমস্ত সম্পদ বাজি রেখেছিল, এখন সে প্রায় পথের ভিখারি। আমি চাই তুমি অতীত ভুলে ওকে আবার বন্ধু হিসেবে নাও। ওর টাকা-পয়সাও ফেরত দিতে হবে। তোমার কাছে এই সামান্য টাকার তেমন কোন মূল্য নেই, কিন্তু ওর জন্যে অনেক।'

ইরাসের কব্জি চেপে ধরল বেন-হার। শান্ত স্বরে বলল, 'এসব বলতে মেসালা তোমাকে পাঠিয়েছে?'

জবাব দিল না ইরাস, কিন্তু তার চোখের ভাষা পড়তে অসুবিধা হলো না বেন-হারের। ওর অনুমানই সত্যি। বুঝল অ্যান্টিয়োকে মেসালার সঙ্গে ইরাস দেখা

করেছে, ভালবাসে মেসালাকে। মেসালার শত্রুদের প্রচণ্ড ঘৃণা করে মেয়েটা।

রাগে শরীরে রক্ত টগবগ করে ফুটতে লাগল ওর। 'মেসালাকে গিয়ে বোলো,' ফ্যাঁসফেঁসে কর্কশ স্বরে বলল বেন-হার, 'অসহায় মানুষের ওপর যে অত্যাচার সে করেছে ওই পঙ্গু শরীর ঈশ্বরের সেই অভিশাপেরই ফল। ওকে বোলো আমি ওকে মুখেই শুধু অভিশাপ দিচ্ছি না, বরং আমার চিরস্থায়ী ঘৃণার নিদর্শন হিসেবে এমন একজনকে পাঠাচ্ছি যে সব অভিশাপকে ছাড়িয়ে যাবে। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে এ কথা যখন শুনবে ওর রোমান চাতুর্য ওকে বুঝিয়ে দেবে আমি কি বলতে চেয়েছি।'

কথা শেষ করেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বেন-হার। ঘৃণা ঝরা চোখে তাকিয়ে থাকল ইরাস ওর গমনপথের দিকে।

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে উৎফুল্ল পথচারীদের মাঝে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হেঁটে চলল বেন-হার। খানিক এগিয়ে দূরে হঠাৎ মশাল মিছিল দেখতে পেল। লণ্ঠনও আছে কারও কারও হাতে। তাদের অনুসরণ করছে কৌতূহলী জনতা। ধোঁয়া আর আগুনের আলোর মাঝে রোমান সৈন্যদের দেখতে পেল বেন-হার। বর্শার মাথা আর শিরোস্ত্রাণে আলো ঠিকরে ঝকঝক করছে। কৌতূহলী হয়ে দাঁড়াল বেন-হার। জনস্রোত এগিয়ে আসতেই দেখতে পেল লণ্ঠন আর মশালগুলো বইছে ভৃত্যরা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মোটা লাঠি। তাদের পেছনে হাঁটছে একদল পুরোহিত আর ইহুদী ধর্মযাজক। লম্বা লম্বা তাদের দাড়ি। হাঁটার তালে তালে নড়ছে। মোটা ভ্রূগুলো কুঁচকে রেখেছে। নাকগুলো আকাশের গায়ে গুঁতো মারার ভঙ্গিতে উঁচু করে ভাবগম্ভীর চেহারায় যাচ্ছে। সবার পেছনে আছে একদল রোমান সৈন্য।

পাশ দিয়েই যাচ্ছে মানুষগুলো, হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল বেন-হার। মিছিলের মাঝখানে একসঙ্গে হাঁটছে তিনজন লোক। দু'জনকে চেনে ও। বামদিকের লোকটা মন্দিরের প্রধান প্রহরী, ডানদিকের জন পুরোহিত। মাঝখানের লোকটা দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে মাথা নিচু করে হাঁটছে। মুখটা দেখা না গেলেও তাকে বেন-হারের পরিচিত বলে মনে হলো। মনে হলো ওর, লোকটাকে অত্যাচার করতে অথবা হত্যা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেজন্যেই এই মশাল মিছিলের আয়োজন।

হঠাৎ মুখ তুলল লোকটা। মশালের হলদে আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল তাকে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। কেমন যেন হতাশা মাখা। ক্লান্ত মুখে ভয়ের ছাপ। কোটরে বসা দু'চোখে দিশেহারা ভাব। মহাপুরুষকে অনুসরণ করে জেরুজালেমে আসার পথে তাঁর শিষ্যদেরও খেয়াল করে দেখেছে বেন-হার। এ লোকটাকে দেখেই চিনতে পারল সে। অবাক হয়ে ডাক দিয়ে বসল। 'ইসক্যারিয়ট!'

ঘাড় ফেরাল লোকটা, কিছু যেন বলতে ঠোঁট ফাঁক হলো, কিন্তু কিছু বলতে পারল না। তার আগেই বেন-হারের বুকে ধাক্কা মেরে বসল পুরোহিত। ধমকে উঠল, 'কে তুমি? দূর হও এখান থেকে!'

দুর্ব্যবহার গায়ে মাখল না বেন-হার। মিছিলের পেছনে এগিয়ে চলল। কি

হচ্ছে জানতে চায় ও। কি অপরাধে জুডাস ইসক্যারিয়টকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

শহর পেরিয়ে অলিভ টিলাসারির দিকে এগোল মিছিল। পূর্ণিমা চাঁদের গলা-রূপো রঙা আলোয় দূর থেকেই অলিভ টিলাসারি দেখা যাচ্ছে। পুলের ওপর দিয়ে গভীর একটা খাদ পেরোল সবাই। পাহাড় সারির কাছাকাছি চলে এল। আর খানিক এগিয়ে জনতা মোড় নিল বামে। পৌঁছে গেল প্রাচীরে ঘেরা একটা জলপাই বাগানের সামনে।

আরও এগোত, কিন্তু একটা দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল মিছিল। সামনের দিকে আর্তনাদ করে উঠেছে কয়েকজন। ভয়টা সংক্রামিত হলো সবার মাঝে। এ ওর পেছনে মুখ লুকানোর প্রতিযোগিতায় নামল বেন-হার আর সৈন্যরা ছাড়া বাকি সবাই। হুমড়ি খেয়ে পড়ল একে অপরের ঘাড়ে। হৈ-হুলস্থূল পড়ে গেল।

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে মিছিলের সামনে চলে এল বেন-হার। তারপর সে-ও অন্যদের মতই, হতবাক হয়ে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সামনে বাগানের দরজাহীন প্রবেশ পথ। পাঁচিলের মাঝখানে ছোট একটা ফাঁক। সেই প্রবেশ পথের সামনে সাদা পোশাক পরা একজন লোক বুকে দু'হাত ভাঁজ করে অসীম ধৈর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কাঁধে লুটাচ্ছে তাঁর ঈষৎ কোঁকড়ানো বাদামী চুলের ঘন গোছা।

ইনিই তো আল্লাহর সেই প্রতিশ্রুত রাসুল!

তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে অনুসারীর দল। প্রভু শান্ত ভাবে চেয়ে আছেন, কিন্তু অনুসারীরা খুবই উত্তেজিত। কোন উত্তেজনা যেন ছুঁচ্ছে না তাঁকে, যীশু বড় শান্ত, বড় দয়ালু! যেন সবাইকে করুণা করছেন।

তার সামনে থেমে দাঁড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের দল। বড় বড় চোখ করে ভয়-ভীতি-শ্রদ্ধা মেশানো দৃষ্টিতে চুপ করে দেখছে তাঁকে। এখন যদি তিনি ধমক দেন, ঘুরে দৌড় দেবে সবাই। তাঁর দিক থেকে জনতার দিকে তাকাল বেন-হার। তারপর দেখল জনতার মাঝখানে দাঁড়ানো জুডাসকে। মুহূর্তে বুঝে গেল যা বোঝার। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে জুডাস! পুরোহিতরা সৈন্য নিয়ে এসেছে যীশুকে বন্দী করে নিয়ে যেতে!

বেন-হার এতদিন ধরে এধরনের জরুরী পরিস্থিতির জন্যেই প্রস্তুতি নিয়েছে, তবুও এখন চুপ করে থাকল সে। প্রভুর শান্ত সমাহিত ভাব যেন তাকেও আচ্ছন্ন করেছে। প্রভুই জীবনের মালিক; ইচ্ছে করলেই তিনি মৃতকে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন; তারমানে জীবিতকেও মৃত করে দিতে পারবেন। এখন তিনি অলৌকিক শক্তি কোন কাজে কিভাবে ব্যবহার করবেন? বেন-হার বিশ্বাস করে দৈব কোন ঘটনা ঘটবেই, সে বিশ্বাসেই সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

এক মুহূর্ত পরে যীশুর স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনল জনতা।

'কাকে খুঁজছ তোমরা?'

'নাজারেথ গ্রামের যীশুকে,' কঠোর স্বরে জবাব দিল একজন পুরোহিত।

'আমিই সে।'

প্রায় নির্লিপ্ত ভাবে কথা বললেন যীশু। স্বরে কোন উত্থানপতন নেই, ভয় বা উত্তেজনার প্রকাশ নেই। তবু জনতার বুকে কাঁপ ধরে গেল, কয়েক পা পেছাল তারা। হয়তো ভয়ে ভয়ে ফিরেই যেত, যদি না জুডাস গিয়ে দাঁড়াত যীশুর সামনে। 'কেমন আছেন, প্রভু!' বলেই যীশুর হাতে চুম্বন করল জুডাস।

'জুডাস,' বিষণ্ন স্বরে বললেন যীশু, 'চুমু দিয়ে ঈশ্বরের মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে? কোথা থেকে এলে তোমরা?'

মুখ নিচু করে মাটির দিকে তাকাল জুডাস, কোন জবাব দিল না। যীশু আবার ভীড়ের দিকে তাকালেন।

'কাকে খুঁজছ তোমরা?'

'নাজারেথ গ্রামের যীশুকে।'

'আগেই বলেছি আমিই সে। তোমরা তো আমাকেই খুঁজছ, তাহলে এদের যেতে দাও।' কথা বলার সময় শিষ্যদের দিকে তাকালেন যীশু।

কয়েকজন ইহুদী পুরোহিত যীশুর দিকে এগোতেই শিষ্যরা বাধা দিতে সামনে বাড়ল। হুড়োহুড়ির মধ্যে হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল একজন। লণ্ঠনের আলোয় তলোয়ারের ঝিলিক দেখা গেল। গোঙাতে গোঙাতে পিছিয়ে গেল একজন লোক। তলোয়ারের কোপে তার একটা কান কাটা পড়েছে।

যীশু আহত লোকটার দিকে ফিরে তাকে স্পর্শ করলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'তোমার ব্যথা দূর হোক।'

শত্রু মিত্র, দু'পক্ষের কেউই ভাবেনি এরকম সঙ্কটময় একটা মুহূর্তে তিনি এধরনের কাজ করতে পারবেন। হতবুদ্ধি হয়ে গেল সবাই।

'তিনি নিশ্চয়ই এদের হাতে বন্দী হতে রাজী হবেন না, অলৌকিক ভাবে মুক্ত থাকবেন,' ভাবল উদ্বিগ্ন বেন-হার।

'তোমার তলোয়ার খাপে পুরে রাখো,' আক্রমণোদ্যত শিষ্যকে বললেন যীশু। 'ঈশ্বর যা ঠিক করে রেখেছেন তা-ই হবে।'

তাঁর কথায় বিপক্ষের লোকদের সাহস ফিরে এল। যীশুকে ঘিরে দাঁড়াল তারা। বেন-হার চারপাশে তাকিয়ে প্রভুর শিষ্যদের খুঁজল। কাউকে দেখল না। একজনও নেই।

বেন-হার তখনও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে। যীশুকে ঘিরে থাকা লোকগুলো মহাব্যস্ত। ভীড়, মশালের লাঠি আর ধোঁয়ার ফাঁকে মুহূর্তের জন্যে তাঁকে দেখতে পেল বেন-হার। অবাক হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করল ও, কেন তিনি ওদেরকে বাঁধতে দিচ্ছেন? তাঁর তো আত্মরক্ষার ক্ষমতা আছে! নিঃশ্বাস ফেলার আগেই তিনি শত্রুদের খতম করে দিতে পারেন, কিন্তু তা করছেন না। কেন? ঈশ্বর তাঁর জন্যে কি নিয়তি ঠিক করে রেখেছেন? একের পর এক প্রশ্ন বেন-হারের মনে আসছে, কিন্তু একটারও জবাব ওর জানা নেই।

যীশুকে নিয়ে শহরের দিকে ফিরতি পথ ধরল মিছিল। এবার সৈন্যরা আগে আগে চলেছে। বেন-হারও দলটাকে অনুসরণ করছে। নিজের আচরণে সন্তুষ্ট নয় ও। সিদ্ধান্ত নিল প্রভুর সঙ্গে যে করেই হোক কথা বলবে। ভীড় ঠেলে সামনে

বাড়ল সে। চলে এল যীশুর পেছনে দড়ি ধরে যাচ্ছে যে লোকটা তার পাশে।

মুখ নিচু করে ধীর পদক্ষেপে হাঁটছেন যীশু। তাঁর দু'হাত পিছমোড়া করে বেঁধেছে ওরা। উদাস ভাবে চলেছেন তিনি, চারপাশে কি ঘটছে সেদিকে যেন বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর কয়েক পা আগে হাঁটছে পুরোহিত আর ইহুদী ধর্মযাজকরা। উত্তেজিত স্বরে কথা বলছে, মাঝে মাঝে ফিরে বন্দীকে দেখে নিচ্ছে তারা।

যীশুর পাশে চলে এল বেন-হার। 'প্রভু,' বলল সে, 'আমি আপনার অনুসারী। দয়া করে বলুন, প্রভু, আমি যদি আপনাকে মুক্ত করতে চাই, আপনি কি তাতে অনুমতি দেবেন?'

যীশু যেন তাকালেনও না, হতচকিত বিষণ্ণ নিঃস্ব লাগছে তাঁকে দেখতে। কোন কিছুতে আর আগ্রহ নেই, তিনি যেন আগেই বিশ্বের মানুষদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিয়েছেন।

বেন-হারের কথা শুনতে পেয়েছে লোকগুলো। ছয়-সাতজন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। ভীড়ের মধ্যে অনেকে চেঁচাতে লাগল। 'এই লোকটা ওদের একজন! ধরো এটাকে! সঙ্গে নিয়ে চলো! বাঁধো! খুন করে ফেলো!'

প্রচণ্ড এক ঝটকা দিয়ে লোকগুলোকে শরীরের ওপর থেকে ছিটকে ফেলে দিল বেন-হার। লাফ দিয়ে ওকে ঘিরে এগিয়ে আসা লোকদের বুহ্য ভেদ করে মুহূর্তে অন্ধকারে মিশে গেল।

একঘণ্টা অপেক্ষা করে শহরে ঢুকল বেন-হার। সরাইখানা থেকে ঘোড়াটা নিয়ে ফিরে চলল ওর তাঁবু দুটোর দিকে। ওখানে ওর জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে মা আর তিয়েরজাহ্।

সীসের মত ভারী হয়ে আছে বেন-হারের মন। আপন গতিতে ছুটছে ঘোড়াটা। বেন-হার সিদ্ধান্ত নিল কাল যে করেই হোক প্রভুর সঙ্গে একবারের জন্যে হলেও দেখা করবে। ও জানে না, আজ রাতেই যীশুকে হানাস প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে, আজই তাঁর ওপর অন্যায় বিচার চাপিয়ে দেবে পুরোহিত আর ইহুদী ধর্মযাজকরা।

বাইশ

পরদিন সকালে বেলা একটু গড়ালে পরে পাগলের মত ঘোড়া ছুটিয়ে বেন-হারের তাঁবুর সামনে এসে থামল দু'জন লোক। দু'জনই বেন-হারের গ্যালিলীয়ান সেনাবাহিনীর বিশ্বস্ত অফিসার। দেরি না করে ভৃত্যরা তাদের তাঁবুর ভেতরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

'এসো, বসো,' আসন দেখিয়ে অভ্যর্থনা জানাল বেন-হার।

'না,' দ্রুত বলল দু'জনের একজন, 'এখানে বসে এখন সময় নষ্ট করা মানে

প্রভুকে মরতে দেয়া।'

অবাক হয়ে অফিসারটির দিকে তাকিয়ে রইল বেন-হার।

'গত রাতে ওরা তাঁর বিচার করেছে,' বলল লোকটা। 'ভোরে তাঁকে গভর্নর পাইলেটের কাছে নিয়ে যায়। দু'বার পাইলেট তাঁকে নির্দোষ ঘোষণা করেছে, মৃত্যুদণ্ড দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু চাপের মুখে লোকটা শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। বলে, তোমাদের ওপর সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলাম। জবাবে ওরা বলল...'

'কারা বলল?'

'পুরোহিত, র‍্যাবাই আর তাদের চেলারা। ওরা বলল যীশুকে হত্যা করলে যদি কোন পাপ হয় সেই পাপ ওদের এবং ওদের সন্তান সন্ততিদের ওপর জন্মজন্মান্তরের জন্যে বর্তাবে, ওরাই রক্তঋণ শোধ করবে।'

'কি!' বিস্ময়াহত স্বরে বলল বেন-হার, 'একজন ইহুদির প্রতি তারই নিজের লোকদের তুলনায় একজন রোমান বেশি সহানুভূতিশীল?'

'হ্যাঁ,' বলল একজন। 'বিচারের রায় হয়ে গেছে। গলগোথায় ক্রুশ তৈরির জন্যে গাছও নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

অবাক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল বেন-হার। তারপর বলল, 'ক্রুশ! এ হতে পারে না! প্রয়োজনে আমরা যুদ্ধ করব!' উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিল সে। একজন আরব অনুচর ছুটে আসতেই বলল, 'ঘোড়া আনো...জলদি!'

মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘোড়ায় চাপল তিনজন।

'আমরা প্রথমে কোথায় যাব?' জানতে চাইল একজন অফিসার।

'আমাদের লোক যোগাড় করতে।'

লজ্জায় রক্তিম বর্ণ ধারণ করল অফিসারের মুখ। হতাশ সুরে বলল সে, 'সম্ভব নয়। শুধু আমরা দু'জনই এখনও আপনার প্রতি বিশ্বস্ত আছি। বাকি সবাই পুরোহিত আর র‍্যাবাইদের কথা বিশ্বাস করে চলে গেছে।'

'কি করতে?' জানতে চাইল বেন-হার।

'তাঁকে খুন করতে। ওদের ধারণা হয়েছে মহান যীশু ধর্মদ্রোহী।'

একে একে ওর দু'জন বিশ্বস্ত অনুচরের দিকে তাকাল বেন-হার। ওর কানে ভাসছে যীশুর কণ্ঠস্বর। কাল রাতে বলা কথাটা বারবার শুনতে পাচ্ছে ও। 'ঈশ্বর যা ঠিক করে রেখেছেন তা-ই হবে!'

হঠাৎ বেন-হার উপলব্ধি করল এ মৃত্যু ঠেকাবার কোন উপায় নেই। যীশু স্বেচ্ছায় এই মৃত্যু বেছে নিয়েছেন। কোন রহস্যময় পরিকল্পনার অংশ এই পরিণতি বরণ। ভবিতব্য! তা না হলে হঠাৎ আজই সকালে কেন ওর বিশ্বস্ত সেনাবাহিনী ওকে ত্যাগ করে চলে যাবে! ভয় জড়িয়ে ধরল ওকে, সবকিছু কেমন যেন অনিশ্চিত বলে মনে হতে লাগল।

হাতে লাগাম তুলে নিল বেন-হার। সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'চলো, আমরা গলগোথায় যাব।'

ঘোড়া ছোটাল ওরা। যতই শহরের কাছাকাছি হলো ততই দেখতে পেল

উত্তেজিত মানুষদের জটলা। হেজেকিয়া ডোবার নিচে উপত্যকায় পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। অপেক্ষা করতে লাগল। সামনে এগোবার আর পথ নেই। অসংখ্য মানুষে জায়গাটা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। প্রতি মুহূর্তে চারদিক থেকে এসে জড় হচ্ছে আরও মানুষ। অথচ কেউ কথা বলছে না বললেই চলে। প্রায় নীরব চারপাশ। কয়েকটা ক্রুদ্ধ কণ্ঠের চিৎকার শুনতে পেল বেন-হার।

'ওরা আসছে,' বলল বেন-হারের একজন অফিসার।

প্রতিমুহূর্তেই চিৎকার চেঁচামেচি আরও কাছে সরে আসছে। ভীড়ের মাঝে সিমোনাইড্‌স্‌কে দেখতে পেল বেন-হার। পঙ্গু মানুষটাকে চেয়ারে বসিয়ে বয়ে আনছে ভৃত্যের দল। পাশে হাঁটছে ইসথার। খানিক পেছনে আরেক দল ভৃত্য বালথ্যাসারকে বয়ে আনছে।

তাদের ডাকল বেন-হার। ওর পাশে এসে থামল সবাই। বালথ্যাসারের মুখ মলিন, পাণ্ডুর; যেন মৃত মানুষের মুখ। 'ঈশ্বর,' অস্ফুট স্বরে বললেন তিনি, 'আজ বিশ্বের জন্যে ভয়ানক একটা দিন।'

আরও কাছে চলে এল তীক্ষ্ণ চিৎকার আর নিষ্ঠুর মন্তব্য। একদল ছেলে মিছিল করে ওদের পার হয়ে গেল। বিদ্রূপ করে চেঁচিয়ে বলছে তারা, 'ইহুদীদের রাজা! সাবধান, সরে জায়গা করে দাও, ইহুদীদের রাজা আসছে!'

'এরাই জেরুজালেমবাসী ইহুদী!' তিক্ত কণ্ঠে বলল বেন-হার।

ছেলেদের পরে এল একদল সৈন্য। নিস্পৃহ নির্বিকার চেহারায় মার্চ করছে তারা। রোদে ঝিলিক মারছে তাদের বর্ম আর অস্ত্র।

এরপর এলেন, মহান যীশু।

দেখে মৃত-প্রায় মনে হচ্ছে তাঁকে। প্রতিবার পা ফেলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছেন। যে কোন মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন। টানা হ্যাঁচড়ায় তাঁর পোশাক ফালাফালা হয়ে গেছে। ছেঁড়া ন্যাকড়ার মত ঝুলছে কাঁধ থেকে। প্রতিবার পা ফেলছেন, পাথরে রেখে যাচ্ছেন রক্তাক্ত পদচিহ্ন। তাঁর গলায় একটা ফলক ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। ওতে লেখা– ইহুদী জাতির রাজা। ওরা তাঁর মাথায় কাঁটার মুকুট চেপে বসিয়েছে। গভীর ক্ষত হয়ে গেছে মাথায়। রক্ত ঝরে একসময় শুকিয়ে গেছে। কালচে-খয়েরী হয়ে আছে মুখ আর কাঁধ। মুকুটে পেঁচিয়ে গেছে রক্তমাখা ঢেউ খেলানো চুলের গুচ্ছ। দু'হাত সামনে এনে বাঁধা। শহর থেকে ক্রুশ বয়ে আনতে গিয়ে একবার ওজন সামলাতে না পেরে পড়ে গিয়েছিলেন। এখন তাঁর বদলে একজন নাজারেথবাসী ক্রুশটা বইছে। চারজন সৈন্য যীশুর পাহারায় আছে, তবু অনেকে সুযোগ মত তাঁকে লাঠি দিয়ে বাড়ি দিচ্ছে, তাঁর গায়ে থুতু ছিটাচ্ছে। এত অত্যাচারেও যীশু শান্ত। বেন-হারের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একবারের জন্যে মুখ তুললেন তিনি।

রাসুলের দুঃখ আর সইতে না পেরে বেন-হার গুঙিয়ে উঠল, 'হা ঈশ্বর! হায় ঈশ্বর!'

যেন ওর কথা যীশু শুনতে পেয়েছেন; শুভাকাঙ্ক্ষীদের ছোট্ট দলটার দিকে তাকালেন তিনি। নীরবে যেন আশীর্বাদ করলেন। তাঁর কথা বলার অনুমতি নেই,

কিছু তিনি বললেনও না, তবে যারা তাঁর ওই করুণা মাখা দৃষ্টি দেখেছে, কেউই মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তাঁকে ভুলতে পারবে না।

আরও দু'জন লোক ক্রুশের ভারে কুঁজো হয়ে যীশুকে অনুসরণ করল।

'এরা কারা?' এক অনুচরকে জিজ্ঞেস করল বেন-হার।

'চোর,' বলল অনুচর, 'এদেরও মৃত্যুদণ্ড হয়েছে।'

এরপর এল সোনালী পোশাক পরা প্রধান পুরোহিত। তার পেছন পেছন হাঁটছে অধীনস্থ পুরোহিতদের বিরাট একটা দল।

ইসথার বলল, 'কয়েকজন মহিলাকে দেখতে পাচ্ছি, কাঁদছে। কারা ওরা?'

ইসথার দেখিয়ে দেয়ায় চারজন মহিলাকে দেখতে পেল বেন-হার। চারজনই কাঁদছে। একজন হেলান দিয়েছে এক লোকের বাহুতে। লোকটার চেহারা ওর পরিচিত।

'ওই লোকটা রাসুলের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য,' বলল বেন-হার। 'যে মহিলা লোকটার বাহুতে হেলান দিয়েছেন উনি মেরি, রাসুলের মা। বাকিরা গ্যালিলীয়, তাঁর ধর্মের অনুসারী।'

ইসথারের দু'চোখ থেকে অঝোর ধারায় অশ্রু নামল। যতক্ষণ দেখা গেল শোকার্ত মহিলাদের দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল সে।

মিছিলের শেষে যাচ্ছে উত্তেজিত জনতা। চেঁচাচ্ছে তারা। গালাগাল করছে, যীশুর রক্ত চেয়ে কুৎসিত চিৎকারে আকাশ ভারী করছে। ওদের আচরণে অসুস্থ বোধ করল বেন-হার। মনে পড়ল যীশুর মিষ্টি ব্যবহার, দয়া আর ভালবাসার কথা। রোগীদের তিনি কত মমতায় সারিয়ে তুলেছেন। মনে পড়ল কিভাবে নাজারেথ গ্রামে তৃষ্ণা দূর করে ওকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন।

প্রচণ্ড রাগে বেন-হারের অন্তর ভরে উঠল। এখনও যদি ওর প্রশিক্ষণ দেয়া সেনারা সাহায্য করে যীশুকে বাঁচানো সম্ভব। ভীড়ের মধ্যে বেশ ক'জন অনুচরকে দেখতে পেল সে। লোকজনের মধ্যে দিয়ে পথ করে তাদের দিকে এগোল বেন-হার। ডাক দিল। শুনতে পেয়ে কয়েকজন এসে ওকে ঘিরে দাঁড়াল।

'তোমরা সবাই সশস্ত্র,' তাদের বলল বেন-হার। 'আমাকে তোমরা কথা দিয়েছিলে স্বাধীনতার জন্যে, রাজার জন্যে লড়বে। এখনই সে লড়াই শুরু করার সময়। যাও, আমাদের সব ক'জন সেনাকে খুঁজে বের করো, বলো যাতে ওরা গলগোথায় আমার সঙ্গে দেখা করে। তাড়াতাড়ি যাও! এই মহান যীশুই আমাদের রাজা। তিনি মারা গেলে দেশ স্বাধীন করার শেষ আশাও দূর হয়ে যাবে!'

বেন-হারের কথা শুনেও নড়ল না কেউ। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'কি হলো, কি বলছি শুনতে পাচ্ছ না?' অধৈর্য হয়ে জানতে চাইল বেন-হার।

'আপনি ভুল করছেন,' জবাবে বলল একজন। 'এই নাজারেথবাসী রাজা নয়, গ্যালিলীর মানুষ তাকে সহায়তাও করবে না। আমরা স্বাধীনতার জন্যে অবশ্যই লড়ব, কিন্তু নাজারেথবাসীর জন্যে নয়।'

দুর্বোধ্য একটা অনুভূতি বেন-হারকে আচ্ছন্ন করল। কে যেন ওর ভেতর থেকে বাধা দিচ্ছে কিছু করতে। হতবুদ্ধি লাগল ওর। চুপ করে বোকার মত

দাঁড়িয়ে থাকল। বেন-হার এখনও কড়া স্বরে নির্দেশ দিলে ওর সেনারা শুনবে, যীশুকে উদ্ধার এখনও করা সম্ভব, পৃথিবীর ইতিহাস পালটে দেয়া এখনও অসম্ভব নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যে তেমন ইচ্ছে নয়।

একটা হাত বেন-হারের বাহু স্পর্শ করল।

'আসুন,' বলল সিমোনাইড্‌স্, 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

সিমোনাইড্‌স্ আর বালথ্যাসারের পেছনে স্বপ্নাবিষ্টের মত হাঁটতে লাগল বেন-হার। ইসথার তার পাশে এসে হাতটা ধরে রইল। সবাই ওরা বধ্যভূমিতে যাচ্ছে।

তেইশ

ওরা যখন গলগোথায় পৌঁছল, সবার আগে হাঁটছে বেন-হার। জিজ্ঞেস করলে ও বলতে পারবে না এত ভীড় হাঙ্গামা পেরিয়ে কিভাবে এখানে এল। পথে কিছুই শোনেনি ও, কিছুই দেখেনি, এমনকি সচেতন ভাবে জানতও না কোথায় চলেছে।

মড়ার খুলির মত শুকনো, রুক্ষ একটা গোল টিলার সামনে এসে দাঁড়াল বেন-হার। মুহূর্তে সচেতনতা ফিরে এল, চারপাশে কি ঘটছে বুঝতে পারল ও। এই জায়গার নামই গলগোথা– মড়ার খুলির স্থান। টিলার পাদদেশে অজস্র লোক চাপাচাপি করে জড় হয়েছে। যেন নড়াচড়া রত জীবন্ত একটা দেয়াল। ভেতরের অংশে একসারিতে দাঁড়িয়ে আরেকটা দেয়াল গড়েছে রোমান সেনাদল। একজন সেনচুরিয়নের নেতৃত্বে ভীড়ের চাপ সামলাচ্ছে তারা। টিলার গায়ে মানুষ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। এক বিন্দু সবুজের চিহ্ন নেই কোথাও। মাটি দেখা যায় না। শুধু মানুষের কঠোর চেহারা, তাদের বিকৃত উল্লাস আর মৃত্যুর উপস্থিতি বোঝা যায়। জেরুজালেমের মানুষ গলগোথায় এসে ভেঙে পড়েছে যীশুর মৃত্যু দেখতে, শহরে বোধহয় একজনও নেই। অথচ কিছুদিন আগে এরাই তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে গিয়েছিল, সঙ্গ লাভে ধন্য হয়েছিল!

সৈন্যদের ব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান পুরোহিত। টিলার গোলাকার চূড়ায় যীশু দাঁড়ানো। অত্যাচারিত, বিধ্বস্ত, কিন্তু নীরব। একজন সৈন্য মশকরা করে রাজদণ্ড হিসেবে তাঁর হাতে একটা নলখাগড়া ধরিয়ে দিয়েছে। চিৎকার করে তাঁকে গালাগাল করছে লোকে, টিটকারি দিচ্ছে, হাসিতে ফেটে পড়ছে নিজেদের নোঙরা রসিকতায়।

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন অনুভব করল বেন-হার। বাতাসে যেন বহুদিন আগে শোনা যীশুর একটি কথা ভাসছে, পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে ও। যীশু বলছেন:

'আমিই কবর থেকে আবার উঠব এবং আমিই জীবন।'

বারবার তাঁর কথাটা শুনতে পাচ্ছে বেন-হার। নতুন মানে খুঁজে পাচ্ছে। অদ্ভুত প্রশান্তিতে ভরে যাচ্ছে ওর অন্তর। সব রহস্য সব সন্দেহ দূর হয়ে সেজায়গা

দখল করে নিচ্ছে পরিপূর্ণ বিশ্বাস আর ভালবাসা।

হাতুড়ির শব্দে বেন-হারের জাগ্রত তন্দ্রা ভাঙল। টিলার চূড়ায় কয়েকজন মিস্ত্রি আর সৈন্য মিলে ক্রুশ তৈরি করছে।

'তোমার লোকদের তাড়াতাড়ি করতে বলো,' সৈনিকদের কর্মকর্তাকে বলল প্রধান পুরোহিত। 'সূর্যাস্তের আগেই অপরাধী তিনজনকে মরতে হবে। সেটাই আইন।'

দয়া পরবশ হয়ে একজন সৈন্য যীশুর কাছে গিয়ে তাঁকে পানি সাধল। পাত্রটা নিলেন না যীশু। আরেক জন গিয়ে তাঁর গলা থেকে ফলকটা খুলে নিল, পেরেক দিয়ে গেঁথে দিল ক্রুশের গায়ে।

'ক্রুশ তৈরি শেষ,' কর্মকর্তা জানাল প্রধান পুরোহিতকে।

হাত ঝটকা দিয়ে পুরোহিত বলল, 'প্রথমে ধর্মদ্রোহীটাকে ক্রুশে লটকে দাও, দেখা যাক ঈশ্বরের পুত্র কিভাবে নিজেকে বাঁচায়!'

ক্রুশবিদ্ধ করার জন্যে সৈন্যরা যীশুকে ধরতেই থেমে গেল সব হৈ হট্টগোল। থমথমে নীরবতা নামল চারপাশে। সবার মাঝে বয়ে গেল নিদারুণ ভয়ের একটা জোয়ার। সবচেয়ে নিষ্ঠুর লোকগুলোও আতঙ্কে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। হঠাৎ করেই যেন মৃত্যুশীতল হিমেল বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিল, শিউরে উঠল সবাই।

বাবার কাঁধ জড়িয়ে ধরল ইসথার। ফিসফিস করে বলল, 'কি ভীষণ শান্ত চারপাশ!'

'ক্রুশের দিকে তাকিয়ো না,' বলল সিমোনাইড্স্, 'দোষী বা নির্দোষ যে-ই এদৃশ্য দেখবে হয়তো সে-ই অভিশপ্ত হয়ে যাবে।'

প্রহরী যীশুর গা থেকে পোশাক খুলে নিল। পিঠে দগগগে ক্ষতচিহ্ন দেখে বোঝা যায় সকালে তাঁকে চাবুক মারা হয়েছে, তবু নির্দয়ের মত তাঁকে ক্রুশে পিঠ ঠেকিয়ে শুতে বাধ্য করা হলো। তীক্ষ্ণ বড় বড় দুটো পেরেক ওরা গেঁথে দিল তাঁর দু'হাতের তালুতে। এরপর সৈন্যরা তাঁর দুপায়ের পাতা মুচড়ে ধরে ক্রুশের গায়ে ঠেকাল। পায়ের পাতা দুটো একটার ওপর আরেকটা রেখে গজাল দিয়ে ঠুকে ঠুকে ক্রুশের সঙ্গে গাঁথল। ক্ষীণ শব্দ পর্যন্ত করলেন না যীশু, মুখের রেখা সামান্যতম পরিবর্তিত হলো না।

'এর মুখটা কোন্ দিকে থাকবে?' জানতে চাইল একজন সৈন্য।

'মন্দিরের দিকে,' জবাব দিল প্রধান পুরোহিত। 'মৃত্যুর সময় লোকটা দেখুক সে পবিত্র মন্দিরের কোন ক্ষতি করতে পারেনি।'

কয়েকজন শ্রমিক যীশুকে সহ ক্রুশটা তুলে নিয়ে নির্ধারিত জায়গায় গেল। একটা গর্তে পোঁতা হলো ক্রুশটা। হাত-পায়ে পেরেক গাঁথা অবস্থায় ঝুলছেন তিনি, যীশুর হাত-পা থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে, কিন্তু ব্যথার কোন চিহ্ন নেই তাঁর মুখে। কাঁদছেন তিনি, কিন্তু নিজের জন্যে নয়, দৃঢ়স্বরে একবার ঈশ্বরের কাছে আর্তি জানালেন, 'ঈশ্বর, তুমি ওদের ক্ষমা করো, ওরা জানে না ওরা কি করছে।'

ক্রুশে গাঁথা যীশুকে দেখে জনতা একবার হর্ষধ্বনি করে উঠল। হাসছে

অনেকে, কেউ কেউ ব্যঙ্গবিদ্রূপ ছুঁড়ে দিচ্ছে।

'ইহুদীদের রাজা! মহামান্য রাজা! ইহুদী জাতির রক্ষাকর্তা!'

মধ্য আকাশে উঠে এল গনগনে সূর্যটা। বহুদূরের পাহাড়সারি উজ্জ্বল আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঝিকমিক করে জ্বলছে যেন শহরের মন্দিরগুলোর চূড়া। তারপরই আকাশ জুড়ে হঠাৎ আঁধার ঘনাতে শুরু করল। প্রথমে মনে হলো হালকা মেঘ সূর্যটাকে ক্ষণিকের জন্যে ঢেকে দিয়েছে।

একে একে চোর দু'জনকে ক্রুশে বিদ্ধ করে লটকে দেয়া হলো। চলে গেল সেনাদল। সাধারণ নির্বোধ মানুষ ঢেউয়ের মত এগিয়ে এল ক্রুশগুলোর দিকে। আবার শুরু হলো তাদের হাসি ঠাট্টা টিটকারি। গাঢ় ছায়ায় ঢেকে গেল আকাশ। রাতের মত আঁধার নামল পৃথিবীর বুকে। ঘণ্টাখানেক পর, দুপুরে বিরক্ত হয়ে বিদায় নিল অনেকে। সিমোনাইড্‌স্, বালথ্যাসার, ইসথার আর বেন-হার গিয়ে দাঁড়াল ক্রুশের সামনে। এত কাছ থেকেও অন্ধকারে যীশুকে প্রায় দেখতেই পাচ্ছে না ওরা। তবে তাঁর দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছে।

খানিক দূর থেকে ভেসে আসছে চোর দু'জনের করুণ আহাজারি। কাঁদছে ওরা। ক্ষমা চাইছে। তাদের প্রলম্বিত আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে পরিবেশ।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। এরমধ্যে মাত্র একবারই কথা বলেছেন যীশু। কয়েকজন মহিলা আর একজন পুরুষ এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর ক্রুশের সামনে। তাঁদের মধ্যে মা আর প্রিয় শিষ্য জনকে দেখে যীশু বললেন, 'তোমরা দু'জন দু'জনকে মা এবং পুত্রের মত দেখে রেখো।'

ক্রুশবিদ্ধ করার পর ঘণ্টাতিনেক কেটে গেছে। কি এক অজানা আকর্ষণে এখনও কিছু লোক এখানেই রয়ে গেছে, শহরে ফিরে যায়নি। একসময় যীশুর শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত হয়ে এল। অনেকক্ষণ পরে পরে শোনা যেতে লাগল তাঁর দীর্ঘশ্বাস। মাত্র ঘণ্টাতিনেক পার হতেই মৃত্যু আসছে তাঁকে এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে! জনে জনে খবর ছড়িয়ে গেল তিনি মারা যাচ্ছেন। কেমন যেন থমথমে নীরবতা নামল চারপাশে। ঝির ঝিরে বাতাস বইছিল, থেমে গেল হঠাৎ। দোজখের মতন গুমোট ভ্যাপসা গরম পড়ল। আতঙ্ক বোধ করল উপস্থিত সব ক'জন দর্শক।

অসহায়ের মত আর্তচিৎকার করে উঠলেন যীশু, 'ঈশ্বর! ঈশ্বর আমার! কেন আমাকে তুমি ছেড়ে গেলে?'

সবাই হতবাক হয়ে গেল তাঁর বিলাপ ধ্বনিতে। কিছু একটা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল বেন-হার।

প্রহরী সৈন্যরা সঙ্গে করে মদ এবং পানি ভরা পাত্র এনেছে। পাত্রগুলো রেখেছে ক্রুশ থেকে সামান্য দূরে। ডগায় স্পঞ্জ লাগানো লম্বা লাঠি পাত্রে চুবিয়ে বন্দীর ঠোঁটে চেপে ধরবে তারা বিশেষ দয়া হলে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের দয়া হয় না, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে নিমগ্ন হয়ে বন্দীর মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে।

নাজারেথ গ্রামে সেদিন ও কতখানি তৃষিত ছিল মনে পড়ল বেন-হারের। চোখের সামনে ছবির মত যেন দেখতে পেল যীশু ওর মুখে পানির পাত্র তুলে

ধরছেন। দৌড়ে গিয়ে স্পঞ্জ বাঁধা লাঠিটা তুলে নিল বেন-হার। সুরায় চুবিয়ে যীশুর ক্রুশের দিকে এগোল। পেছনে কয়েকজন সৈন্য চিৎকার করে ধমক দিতে লাগল, ভ্রূক্ষেপ করল না সে। দৌড়ে গিয়ে যীশুর ঠোঁটে ভেজা স্পঞ্জ তুলে ধরল। কাছ থেকে বেন-হার দেখতে পেল যীশুর রক্তাক্ত ধূলিমলিন ক্ষতবিক্ষত মুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বর্গীয় আভা। হঠাৎ চোখ মেলে চাইলেন তিনি। অদৃশ্য কাকে দেখে যেন খুব খুশি হলেন। বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল স্বরে বললেন, 'আমার কর্তব্য সমাপ্ত হলো।'

তাঁর দু'চোখ থেকে উজ্জ্বল আভা মিলিয়ে গেল। ধীরে ধীরে বুকের ওপর নুয়ে এল কাঁটার মুকুট পরা মাথাটা। অতি নিচু স্বরে বলা তাঁর শেষ কথাগুলো যেন কাছে দাঁড়ানো কাউকে উদ্দেশ করেই তিনি বললেন। স্পষ্ট শুনতে পেল বেন-হার তাঁর অস্ফুট ফিস্স 'ঈশ্বর, তোমার কাছেই আত্মা সমর্পণ করলাম।'

কথা শেষ হতেই একবার মৃদু কেঁপে উঠলেন যীশু; অত্যাচারিত অপমানিত শরীরে দায়িত্ব পালন শেষে সব লাঞ্ছনা তুচ্ছ করে নীরবে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে।

সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল বেন-হার। শূন্য কণ্ঠে শুধু বলল, 'সব শেষ। তিনি আর নেই।'

আর কিছু বাকি নেই, সব শেষ হয়ে গেছে, তবু একে অপরের দিকে অস্বস্তি নিয়ে তাকাচ্ছে উৎসাহী আমোদপ্রিয় নিষ্ঠুর লোকজন। যীশুর রক্তের জন্যে ওরা সবাই বংশ পরম্পরায় দায়বদ্ধ! কেউ ফিরে যেতে এক পাও নড়তে পারল না, হঠাৎ প্রচণ্ড ভূমিকম্পে থরথর করে কাঁপতে লাগল মাটি। ভারসাম্য রাখতে যে যার পাশের জনকে জড়িয়ে ধরল। মুহূর্তে অন্ধকার দূর হয়ে দেখা দিল সূর্য, আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দিল উপত্যকা। যারা যীশুর দেহে আঘাত করেছে, তাঁর মৃত্যু কামনা করেছে, তাঁকে ক্রুশে চড়ানোর পক্ষে যারা রায় দিয়েছে এই অলৌকিক ঘটনা দেখে প্রত্যেকের বুক ভয়ে কেঁপে উঠল।

দৌড়াতে লাগল তারা। কেউ ঘোড়ায়, কেউ উটে আবার কেউ বা রথে চেপে পালাতে লাগল। কিন্তু অন্যায়কারীদের আরও ভড়কে দিতেই যেন তাদের ধাওয়া করল আরেক দফা ভূমিকম্প। উল্টে পড়ে গেল অনেকে। কেউ কেউ ছিটকে পড়ল অনেক দূরে। পায়ের তলায় প্রচণ্ড শব্দ হতে লাগল। ভূগর্ভের বিরাট পাথরগুলো যেন পরস্পর ঘষা খাচ্ছে, চুরমার হয়ে যাচ্ছে প্রবল আঘাতে।

ভয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে লোকজন। কে কার আগে যাবে প্রতিযোগিতা চলছে। কার কি পদমর্যাদা দেখার সময় কারও নেই। পায়ে পা বেধে ধুলোয় মুখ থুবড়ে পড়ল প্রধান পুরোহিত। অনেকে তাকে মাড়িয়ে দিয়ে গেল। একটা ব্যাপারে এই মানুষগুলো একই সমান– মহান যীশুর রক্তপাতের জন্যে এরা প্রত্যেকে সমান দায়ী। বংশ পরম্পরায় এই রক্তঋণ তাদের শোধ করে যেতে হবে।

সূর্যের আলো যখন যীশুর ক্রুশের ওপর পড়ল, মা মেরি, বিশ্বস্ত জন, গ্যালিলীয় বিশ্বস্ত তিন মহিলা, সৈনিক দল এবং তাদের অফিসার, বেন-হার এবং

তার সঙ্গী তিনজন ছাড়া গলগোথা টিলার ওপর তখন আর কেউ নেই। লোকজন কখন পালিয়েছে দেখেনি ওরা, নিজেদের সামলে নিতেই অতি ব্যস্ত থাকতে হয়েছে।

'এখানে বোসো,' সিমোনাইডসের পায়ের কাছে জায়গা করে দিয়ে ইসথারকে বলল বেন-হার, 'ঈশ্বর এবং যীশুর ওপর বিশ্বাস রেখো। আমাদের রাজাকে ওরা অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে।'

'আজ থেকে আমরা তাঁকে খ্রীষ্ট বলে সম্বোধন করব,' বলল সিমোনাইড্স্ শ্রদ্ধাভরে।

'ঠিক বলেছেন,' সায় দিল বেন-হার।

টিলায় আবার ভূকম্পন শুরু হলো। চোর দু'জনের করুণ আর্তনাদে ভরে উঠল আকাশ-বাতাস। নিজেকে সামলানোর ফাঁকে বালথ্যাসারকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখল বেন-হার। দৌড়ে গেল সে। ডাকাডাকি করল। কোন জবাব পেল না। জ্ঞানী বালথ্যাসার আর নেই, মারা গেছেন তিনি।

ভূমিকম্প থামলে পরে ভৃত্যরা বালথ্যাসারের দেহ নিয়ে শহরে ফিরে গেল। বেন-হারও ফিরতি পথ ধরল। শোক বিহ্বল মনে সে যখন প্রাসাদে পৌঁছল সেসময়েই ক্রুশ থেকে নামানো হলো যীশুর পবিত্র দেহ। বিশ্বের ইতিহাসে খোদাই হয়ে গেল বিশেষ এই দিনটি।

বালথ্যাসারের মৃত্যু সংবাদ দেয়ার জন্যে ইরাসকে খুঁজল বেন-হার। কোথাও নেই মেয়েটি। সারা প্রাসাদ তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো। ইরাস প্রাসাদে নেই। চলে গেছে। বেন-হারের সঙ্গে কখনও ইরাসের আর দেখা হয়নি, কিন্তু কয়েকবছর পর খোঁজখবর জানতে পেরেছিল বেন-হার।

বালথ্যাসারের মৃত্যুশোক কমার পরে মা আর তিয়েরজাহ্‌কে প্রাসাদে নিয়ে এল বেন-হার। তারপর থেকেই হার প্রাসাদে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে যীশুর নাম উচ্চারণ করা হত। তাঁর প্রচারিত ধর্ম সত্যধর্ম হিসেবে পালিত হত।

চব্বিশ

যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর কেটে গেছে সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর।

মিসেনামের চমৎকার এক ভিলায় নিজের ঘরে বসে আছে বেন-হারের স্ত্রী, ইসথার। এই ভিলাটি তার স্বামী উত্তরাধিকার সূত্রে কুইনটাস এরিয়াসের কাছ থেকে পেয়েছে। তখন দুপুর, ইটালির ওপর সূর্য তার উষ্ণতা দিয়ে গোলাপ আর আঙুরগুচ্ছের জন্যে গ্রীষ্ম বয়ে এনেছে। বাগানের গাছগুলো সূর্যের আলোয় স্নান করছে। বাড়ির সবকিছুতে রোমান ছাপ, শুধু ইসথারের পরনে ইহুদীদের পোশাক। তার স্বামীর পছন্দ। মেঝেয় পাতা সিংহের চামড়ায় বসে তিয়েরজাহ্ খেলা করছে বেন-হারের ছেলেমেয়ের সঙ্গে।

একজন ভৃত্য এসে দরজার ওপার থেকে ইসথারকে জানাল, 'একজন মহিলা এসেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'তাঁকে নিয়ে এসো,' বলল ইসথার, 'এঘরেই তাঁকে আপ্যায়ন করব।'

ভৃত্য মহিলাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। চমকে উঠল ইসথার, মহিলার চেহারা দেখে দ্বিধা ফুটল ওর মুখে। পিছিয়ে গেল এক পা। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। নিজেকে তারপর সামলে নিল ইসথার। বলল, 'আমি···আমি তোমাকে চিনি। তুমিই তো···'

'হ্যাঁ, আমিই ইরাস। বালথ্যাসারের মেয়ে।'

দু'জন দু'জনের দিকে চেয়ে থাকল। সময় দু'জনকেই বদলে দিয়েছে। ইসথার গত পাঁচ বছরে আরও সুন্দরী হয়েছে, চেহারায় ফুটে আছে দাম্পত্য সুখের কমনীয়তা। কিন্তু ইরাসের প্রতি বহমান সময় দয়া দেখায়নি। কুঁচকে গেছে ইরাসের মুখের চামড়া। বড় বড় দু'চোখ অনিদ্রার ফলে রক্ত লাল। চোখের নিচে ঘন কালি। মুখটা রক্তশূন্য, লাবণ্যহীন। পরনে বিবর্ণ মলিন পোশাক। পায়ের সস্তা চটিতে লেগে আছে রাস্তার কাদা।

'এরা কি তোমার ছেলেমেয়ে?' জানতে চাইল ইরাস।

'হ্যাঁ। ওদের সঙ্গে কথা বলবে না তুমি?'

'আমাকে ওরা ভয় পাবে,' ম্লান হাসল ইরাস। দু'এক পা এগিয়ে এল সে ইসথারের দিকে। 'তোমার স্বামীকে আমার হয়ে একটা খবর জানিয়ো,' বলল সে, 'ওকে জানিয়ো ওর শত্রুর মৃত্যু হয়েছে। অত্যাচার জ্বালা যন্ত্রণা সইতে না পেরে আমিই তাকে খুন করেছি।'

'ওর শত্রু কে!' বুঝতে পারল না ইসথার।

'মেসালা।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ইরাস আবার বলল, 'তোমার স্বামীকে বোলো তার ক্ষতি করতে চেষ্টা করে যে পাপ করেছিলাম গত পাঁচ বছরের অবিরাম কষ্টে আমার সেই পাপ হয়তো মোচন হয়েছে। তারও হয়তো করুণা হবে। আমি বুঝেছি রোমান হতে হলে জানোয়ার হতে হয়।···চলি তাহলে। বিদায়!'

যাবার জন্যে ঘুরল ইরাস। পা বাড়াতেই ইসথার ওর পাশে চলে এসে বলল, 'এখন বিশ্রাম নাও। আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করবে না? তোমার প্রতি ওর কোন রাগ নেই। আমরা তোমাকে বন্ধু হিসেবে পেতে চাই। এখন আমরা খ্রীষ্টান।'

'না, আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি,' চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সুরে বলল বিষণ্ন ইরাস। 'সে পথের শেষ প্রান্তে চলেও এসেছি। আমি আর তোমাদের বিরক্ত করব না।'

ইসথার কিছু বলা বা করার আগেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল ইরাস।

বেন-হার ফিরলে পরে ইসথার যখন ইরাসের আগমনের কথা জানাল, সব শুনেও কোন মন্তব্য করল না বেন-হার। ও আগেই আন্দাজ করেছিল, যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করার দিন বাবাকে ত্যাগ করে মেসালার জন্যে প্রাসাদ ছেড়ে চলে গিয়েছিল ইরাস। তবুও কর্তব্যের খাতিরে এখন বেন-হার ইরাসকে খোঁজার জন্যে

সব রকম চেষ্টা চালাল। খোঁজ পাওয়া গেল না। কেউ বলতে পারল না সে কোথায় গেছে। মিসেনামে শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাসই নেই, কালো একটা জগৎও আছে। সেই কালো নোঙরা জগৎটার যদি বাকশক্তি থাকত, হয়তো ওটা সেই বিগতযৌবনা মিশরীয় রমণীর খোঁজ বলতে পারত।

*

দীর্ঘদিন বেঁচে ছিল সিমোনাইড্স্। নিরো সম্রাট হওয়ার বছর দশেক পরে অ্যান্টিয়োকের ব্যবসা গুটিয়ে নেয় সে। কিন্তু বাড়িটা বিক্রি করেনি, নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে সেই বাড়িতেই বাকি জীবন কাটাবে ঠিক করে।

সপরিবারে বেন-হার একবার সেখানে বেড়াতে এল। উদ্দেশ্য নাতি-নাতনিদের সঙ্গে নানার পরিচয় করিয়ে দেয়া।

এক সুন্দর বিকেলে সিমোনাইড্স্ গুদামের ছাদে আরাম কেদারায় বসে বেন-হারের সঙ্গে আলোচনায় মগ্ন হয়ে গেল। ইসথারও তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে বসে ওদের কথা শুনছে। বেশ কিছুদিন আগে মারা গেছেন বেন-হারের মা। দুঃখ ভুলতে পেরেছে ওরা যীশুর নতুন আলোর পথে চলতে শিখে।

খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধেই আলাপ হচ্ছে ওদের মাঝে। গতকাল অ্যান্টিয়োকে একটা জাহাজ ভিড়েছে। ওই জাহাজের লোকদের কাছ থেকে জানা গেছে যে সম্রাট নিরো রোমে খ্রীষ্টানদের ওপর অকথ্য শারিরীক মানসিক অত্যাচার শুরু করেছে।

দুঃখিত স্বরে বলল সিমোনাইড্স্, 'অন্যরা যখন অত্যাচারিত হচ্ছে, আমরা তখন সুখে শান্তিতে সম্পদশালী হয়ে দিন কাটাচ্ছি। বেন-হার, অনেক বছর হলো ঈশ্বর তোমাকে সহায়তা করছেন। আমি জানি সেজন্যে তুমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন কি ভাবার সময় হয়নি কেন তিনি তোমাকে এত সম্পদ দান করেছেন?'

'আমি ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই সম্পদ তাঁরই পথে ব্যয় করব,' বলল বেন-হার। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না ঠিক কি করলে তিনি বেশি সন্তুষ্ট হবেন, কিভাবে ব্যয় করলে এই সম্পদ বেশি কাজে আসবে।'

'আমি জানি অ্যান্টিয়োকের গির্জাগুলোয় তুমি প্রচুর দান করো। এখন রোম থেকে অত্যাচারের খবর আসছে। নতুন পথে চিন্তা করার, কাজ করার এখনই সময়। রাজধানীতে কিছুতেই ধর্মের আলো নিভতে দেয়া যাবে না।'

'বলুন কি করলে সেই আলো আমি জ্বেলে রাখতে পারব?'

'বলছি শোনো। রোমানরা, এমনকি এই সম্রাট নিরো লোকটাও দুটো জিনিসকে পবিত্র বলে মানে। এক হচ্ছে মৃত মানুষের ছাই, আর দুই নম্বর হচ্ছে সব ধরনের কবরস্তান। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার জন্যে যদি মাটির ওপরে গির্জা তৈরি করতে না পারো, তাহলে মাটির নিচে বানাও। সেখানে মৃত খ্রীষ্টানদের কবর দেয়ার ব্যবস্থা করো, তাহলেই রোমানদের অত্যাচার থেকে বিশ্বাসীরা বাঁচতে পারবে।'

উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল বেন-হার। পায়চারি শুরু করল।

'চমৎকার বুদ্ধি!' খানিক পরে বলল সে। 'সময় নষ্ট না করে রোম থেকে যে

জাহাজটা এসেছে, সেটাতে করেই আমি রোমে চলে যাব।' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল বেন-হার, 'তুমি কি বলো, ইসথার?'

বেন-হারের পাশে এসে দাঁড়াল ইসথার। স্বামীর বাহুতে আলতো করে হাত রেখে বলল, 'এভাবে, এপথে যদি খ্রীষ্টের ধর্ম প্রচারের কাজ এগিয়ে নেয়া যায় তে আমি বাধা হয়ে দাঁড়াব না; বরং তোমার সঙ্গে যাব, তোমাকে সাহায্য করব।'

রোমে গেলে আজও দেখা যায় বেন-হারের তৈরি স্যান ক্যালিক্স্টোর সমাধি গির্জা। প্রচুর অর্থ ব্যয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল বিশাল এই গির্জাটি। এখান থেকেই রোম সাম্রাজ্যে বিকাশ ঘটে খ্রীষ্ট ধর্মের। ছড়িয়ে যায় সারা বিশ্বে।

* * *